বৈষ্ণব সাহিত্য

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সূচীপত্র

নিবেদন।

"বৈষ্ণব ধর্ম্ম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য" কাজেই বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনায় সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্বের কথা বলিতে হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্বের যে মর্ম্মবাণী আমাকে ইহার দিকে টানিয়া আনিয়া আমার প্রাণ মন অধিকার করিয়াছে সেই মর্ম্মবাণী আমি যেমন যাহা বুঝিয়াছি বুদ্ধিশক্তি অনুসারে তাহাই বিবৃত করিয়াছি। ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই বাণীকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ববস্তু বলিয়া স্বীকার করিবেন কি না জানি না—কেন না এই তত্ত্ব কোথায়ও আলোচিত হইতে দেখি নাই—কিন্তু এই মর্ম্মবাণীই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে, "বৈষ্ণব সাহিত্য" প্রণয়নে উৎসাহিত করিয়াছে। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভক্তি তত্ত্বকে গৌরবময় বিশিষ্টতা প্রদান করিয়া জগতের সমুদয় ভক্তি-ধর্ম্মের উপরে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছে। বিপুল বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতরে সাহিত্যের যে সৌন্দর্য্য রসধারা প্রবাহিত হইয়া রহিয়াছে তাহার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আর বৈষ্ণব সাহিত্যে ভক্তিধর্ম্মের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ববস্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহার ও সন্ধান দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আর সেই সঙ্গে মধ্যযুগের বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের নানা উপকরণ সংগ্রহের সম্ভাবনা নির্দ্দেশ করিয়াছে। কোথায় কি পরিমাণে আমার কোন চেষ্টা সফল হইয়াছে পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন আমি আমার বক্তব্যের সংক্ষেপ ইঙ্গিত করিলাম।

আমার বাল্যবন্ধু সুপরিচিত শিশুসাহিত্যরচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার এইগ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া ও আমাকে পরামর্শ দিয়া গ্রন্থপ্রণয়নে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহা প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে উল্লেখ করিতেছি। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চির বাধিত করিয়াছেন ইতি।

কুমিল্লা
১লা আষাঢ় ১৩৩২ সাল

শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী

ভূমিকা

বৈষ্ণবধর্ম্ম লইয়াই বৈষ্ণব-সাহিত্য। কাজেই ধর্ম্মকে বাদ দিয়া এ-সাহিত্যের আলোচনা চলে না। বৈষ্ণব-ধর্ম্মও অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। কিন্তু এই ধর্ম্ম কোন্ সময় হইতে কি ভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহার যথাযথ ক্রম জানিবার কোন বিশেষ উপায় নাই। রামায়ণ, মহাভারত যুগের পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম-পদ্ধতি অথবা বৈষ্ণব-দর্শন-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পারা যায় নাই। তবে ৭০০—৬০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দেও যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল তাহার প্রমাণ আছে। এই সময়ে ত্রি-বিক্রম বিষ্ণুর পূজা প্রচলিত ছিল। আর ইহার উপাসনায় লোকে বিষ্ণুপাদেরই পূজা করিত। বুদ্ধের পদচিহ্নের পূজার পূর্ব্বে যে গয়ায় বিষ্ণুপদের পূজা ছিল তাহা যাস্কোদ্ধৃত ঊর্ণবাভের "সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ" বচন হইতে কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল প্রমাণিত করিয়াছেন। বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রের পূর্ব্বেও ত্রি-বিক্রম বামন বিষ্ণু বাসুদেব বলিয়া পূজিত হইতেন (২-৫।৯।১০), দামোদর ও গোবিন্দের উপাসনাও সাধারণের মধ্যে বেশ প্রসার লাভ করিয়াছিল (Buhler, S. B E. XIV)।

প্রাচীন শিলালিপিতেও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাচীনত্বের নিদর্শন আছে। লুডার্স্-প্রমুখ পণ্ডিতগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, নানাঘাট ও ঘোশুণ্ডির শিলালিপি খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতক পর্য্যন্ত ভাগবতধর্ম্মের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। ঘোশুণ্ডির শিলালিপিতে পাওয়া যায় যে, ভগবান্ সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার জন্য "শিলাপ্রাকার" নির্ম্মিত হইয়াছিল। তক্ষ-শিলাবাসী ভাগবত Heliodora গরুড়মূর্ত্তি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া

দিয়াছিলেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ১ম শতকের নানাঘাট লিপি হইতে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার বিষয় জানা যায়। Ind. Ant. 1918. p.84.

খৃঃপূঃ ১৫০ অব্দে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উপাস্য বাসুদেবের কথা আছে। খৃঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতকের একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বিশেষ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বাসুদেব ও বলদেব পূজিত হইতেন। ভক্তিবাদ লইয়াই বৈষ্ণবধর্ম্ম। ভক্তিবাদ যে খুব প্রাচীন, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। বৈদিক সূক্তগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাবে পরিপূর্ণ। যাস্কের নিরুক্তের উপর দেবরাজ যজ্বের নির্ব্বচনটীকায় দেবতাদের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে "দাতারোঽভিমতানাং ভক্তেভ্যঃ" "অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই দেব।

আরণ্যক ও উপনিষদের উপাসনাকাণ্ডের উপর ভক্তিমার্গ সংস্থাপিত। কাজেই রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বলদেব-প্রমুখ বেদান্তদর্শনের ভক্তিবাদিগণ উপনিষৎকেই তাঁহাদের মহাবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কঠোপনিষৎ ও চতুর্ব্বেদশিক্ষায় ভক্তিবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে। নীলকণ্ঠ মহাভারতভাষ্যে ভক্তির বৈদিক উৎপত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ভক্তিশব্দ যে খুব প্রাচীন তা নয়। বেদ বা প্রাচীনতম উপনিষদে ভক্তিশব্দের উল্লেখ নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভক্তিশব্দের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

এই শ্লোকে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের কথা বিশেষ দৃঢ়তার সহিতই বলা হইয়াছে। অধুনা আমরা যাঁহাকে ভগবদ্বিগ্রহ বলিয়া থাকি, শ্বেতাশ্বতরের 'দেব' বলিতে প্রায় তাহাই বুঝায়। এই উপনিষৎখানি

অন্যান্য প্রাচীন উপনিষদের পরবর্ত্তী কালের—কিন্তু ভগবদ্‌গীতার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। আমার মনে হয়, এই শ্লোকের ভক্তি শব্দ হইতেই পারিভাষিক ভক্তি শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। আর এরূপ হওয়াও বিচিত্র নয়। নূতন ধর্ম্মমত বুঝাইবার জন্য নূতন শব্দের প্রয়োজন হইয়া পড়িলে অনেক সময় তৎকাল-প্রচলিত শব্দ হইতেই পরিভাষা-প্রণয়নের রীতি দেখা যায়। তখন সেই পরিভাষার অর্থ পুরাতন অর্থকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিয়া না দিলেও ইহার নূতনত্বের একটা বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া দেয়। এমন কি, পাশ্চাত্য গ্রীক ধর্ম্ম বা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম অথবা English Evangelical Schoolএও এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষে ভক্তিশব্দ উৎপন্ন হইয়া পরে শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতায় পারিভাষিক শব্দরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অধ্যায়ে বিশেষতঃ নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে মুমূর্ষু ভীষ্মের উক্তিতে, সংজ্ঞাত্মক ভক্তিশব্দের উল্লেখ আছে। গীতায় যে কেবল একমাত্র ভক্তিরই উপদেশ আছে তা নয়, তবে সংস্কৃত সাহিত্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, গীতার পূর্ব্বে স্পষ্টতঃ ভক্তি-তত্ত্ব কোথাও উপদেশ করা হয় নাই। ছান্দোগ্য, কঠ প্রভৃতি উপনিষদে ভক্তিবাদের আভাস আছে বটে, কিন্তু স্পষ্ট ভক্তি শব্দ নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও দর্শন-সম্বন্ধে চিন্তাধারা যেরূপ বিকসিত হইয়াছিল এবং তাহা যেরূপ প্রচলিত হইয়াছিল, ভগবদ্গীতাতেই তাহার সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। ভক্তি গীতার একমাত্র আলোচ্য বিষয় না হইলেও ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃতপক্ষে গীতাই ভক্তি-শাস্ত্রের বেদ, আর গীতার ভক্তিই ভক্তির প্রথম তরঙ্গ। ইহার পর সহস্র বৎসরের মধ্যে ভক্তির অভিব্যক্তির

আর কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। গীতা-রচনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে, কৃষ্ণ অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গোপালকৃষ্ণের পূজা অবলম্বন করিয়াই ভক্তির দ্বিতীয় তরঙ্গের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এখন হইতে ১৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে কোন সময়ে দ্বিতীয় তরঙ্গের বিকাশ হয়। কিন্তু ১৫০০ বৎসর পরে সাহিত্যে সেই অভিব্যক্তির লক্ষণ সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে ভক্তিবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল। মধ্য যুগের বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতের দক্ষিণে উৎপন্ন হইয়া রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় নূতন আকারে নিরক্ষর ও নির্ম্মম-হৃদয় ব্যক্তিদিগের মধ্যেও প্রবেশলাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধদের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, এই সময়ে সমস্তই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। বৈষ্ণব সকলকেই আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন দান করিলেন। বৈষ্ণব এই সময় বৃন্দাবনের "শ্রী" ভাল করিয়া উজ্জ্বল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন তাঁহাদের নিকট তীর্থের সার এবং আশ্রমের শিরোমণি বলিয়া পরিগণিত হইল। বাঙ্গালার বাহিরে ইতঃপূর্ব্বেই বৈষ্ণবধর্ম্ম নূতন শ্রেণীর স্থাপত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, এক্ষণে বাঙ্গালার সীমার মধ্যে এক বিরাট্ কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা করিল। বাঙ্গালা ভাষার উপাদান দিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য রচিত হইল। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব এই শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার মাটিতেই হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মের যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র ভারতকে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

রাধাকৃষ্ণ ও গোপীকথাকে কেন্দ্র করিয়া গৌর নিতাই প্রেম ও ভক্তির চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও ভক্তিতরঙ্গ ছুটিয়াছিল। প্রাচীন বৈষ্ণব-মতানুসারে কোথাও

সীতারামের আরাধনা, কোথাও বা অন্য নামে পূজা সেই সময় হইতে চলিতে লাগিল। উপাসনা সীতারামে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র ও গুর্জর দেশে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা হইয়া থাকে। বদরীনারায়ণেও লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আছে। প্রাচীনতর সত্যনারায়ণ—হরিদ্বার ও কেদারনাথ হইতে যে পথ গিয়াছে, তথায় শিবের সহিত পূজাধিকার লইয়া বিবাদ করেন। শেষে শ্রীনগর হইতে বদরী পর্য্যন্ত নূতন তরঙ্গেরই প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনেরও একটা ব্যবস্থা হয়। ফলে কেদার-নাথ ও বদরীনাথের জন্য মহান্ত বা রাউল দক্ষিণ ভারত ও মাদ্রাজ হইতে আনিবার ব্যবস্থা হয়। সেই ব্যবস্থা আজও সংরক্ষিত আছে। ইহাতে হিমাচল অঞ্চলে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, গ্রন্থকার তাহা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব সকলেই সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের যাহা করিয়াছেন তাহা সাহিত্যের লালন-কার্য্য। বৈষ্ণব-মহাজনেরাই সেই সাহিত্যের হাতেখড়ি দিলেন। বৈষ্ণবযুগে বাঙ্গালা সাহিত্য লালনের অবস্থা পার হইয়া সুকুমার কৈশোরে পদার্পণ করে। বৈষ্ণবদিগের অনুগ্রহ না হইলে বঙ্গসাহিত্য বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থায় আসিতে পারিত না। সাহিত্য-রস সম্ভোগ করিবার যে পথ জয়দেব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি তাহারই অনুসরণ করিয়া সাহিত্য-কুঞ্জ চিরবসন্ত-আমোদে ভরপূর করিয়া রাখিয়াছেন।

বৌদ্ধযুগে পালবংশীয় রাজাদের সময় হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের

প্রচার সুরু হইয়াছিল কি না, নাথসিদ্ধদের ধর্ম্মপ্রচার কিংবা ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-প্রচার সেই সকল সাহিত্যের লক্ষ্যস্থল ছিল কিনা, আমি এখানে এই রকম দুরূহ প্রসঙ্গের কথা তুলিব না। প্রসঙ্গতঃ যোগীপাল, মহীপালের গানের পালায়, ডাকের কথা এবং খনার বচনে রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, ধর্ম্মনীতি, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সমাজনীতি শিখিবার কি কি উপাদান পাওয়া যায় এইরূপ কথা লইয়া পাঠকের মহার্ঘ সময়ের সৎকার করিবার কোন দুরভিসন্ধি আমার নাই। বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারার আলোচনায় আমি তবে কি বলিতে চাই—আপনারা হয়ত দাবী করিবেন সেই সম্বন্ধে আমার সর্ব্বাগ্রেই একটা মুখবন্ধ লেখা দরকার। কিন্তু সে দিক্ দিয়াও না গিয়া আমি একেবারেই গোড়াতেই মুখ খুলিয়া দিয়াছি।

বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টির সঙ্গে বৈষ্ণব-সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বৈষ্ণব-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পর বঙ্গ-সাহিত্য কতটুকু পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহা গ্রন্থকারের আলোচনা হইতে বেশ বোঝা যায়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রেমের নানা অবস্থার বর্ণনা আছে। পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, মিলন প্রভৃতির কথা আছে। আমাদের কাব্য-নাটকাদিতে নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বরাগ বলিলে আমাদের দৃষ্টি প্রধানতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাসম্বলিত প্রাচীন পদাবলীর দিকেই আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ পদাবলীসাহিত্যে ইহার যেরূপ পরিপুষ্ট আকার দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ অন্য কোথাও সহজে মেলে না। বৈষ্ণব-সাহিত্যের পাঠককে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ পাঠ করিবার সময় প্রথমেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা মানবনায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ নয়। বিরাট্ বিজ্ঞানময় পুরুষ—এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহা হইতে জাত হইয়া যাঁহাতে মণিমালার ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ

নায়করূপে এবং তাঁহার যে শক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডমালা বিধৃত হইয়া রহিয়াছে তিনিই রাধিকা বা নায়িকারূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্য রস-সাহিত্য। রস-সাহিত্য বলিলে বুঝি---যে সাহিত্য রসময়, রসে ভরপুর। যাহা রসহীন তাহা সাহিত্য পদবাচ্যই নয়। রসই সাহিত্যের প্রাণ। রসানুভূতি আবার ভাবে অনুস্যূত। ভাব রসের আশ্রয়। এই পরস্পর রস ও ভাবে সাহিত্য ফুটিয়া উঠে—সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। অলঙ্কারশাস্ত্রে রসের যথেষ্ট আলোচনা আছে। যাহা হইতে সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি হয় তাহাকেই রস বলা যায়। এ-জগতে যাহা কিছু সুন্দর তাহারই মূলে রস আছে। রস সৌন্দর্য্যোপলব্ধির মূলীভূত কারণ। আত্মাই সৌন্দর্য্যোপলব্ধির মূলীভূত কারণ রস। উপনিষদের ভাষায় বলিতে পারা যায়—রসো বৈ সঃ।

রসোপভোগের জন্যই আত্মার বহুত্ব। একত্বই বহুত্ব সম্বলিত জগতের মূলীভূত কারণ। আত্মার মধ্যে উপভোগের ইচ্ছা থাকাতেই জগতের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে। আত্মা জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার উপভোগেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য।

আমরা দেখিতে পাই, জীবমাত্রই রসোপভোগের জন্য ব্যাকুল, এবং সকলেই সর্ব্বক্ষণ রসের সন্ধানে বিব্রত। সমস্ত জীবনটাই যেন রসানুসন্ধান ছাড়া আর কিছুই নয়। রসানুসন্ধান ব্যতীত কোন প্রাণীই বাঁচিতে পারে না। কিন্তু এই রস কোথায় এবং কেন সকল জীব ইহার জন্য পাগল? যখন রসের জন্য সকলেই পাগল তখন রসের মর্ম্ম যে জীবমাত্রেই জানে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জীব যদি রসের মর্ম্ম না জানিত তাহা হইলে সে কখনই রসের জন্য এত লোলুপ হইত না। কিন্তু কেন সকলে ইহার জন্য পাগল—ইহার সমীচীন উত্তর এই যে, অপূর্ণতা এবং অভাবই আমাদিগকে রসানুসন্ধানের

জন্য ব্যস্ত করে। আত্মার প্রকৃত পক্ষে কোন অভাব নাই—আত্মা অভাবরহিত এবং পূর্ণ। অপূর্ণতা হইতেই উপভোগের কামনা হয়। উপভোগ-কামনার তাৎপর্য্য এই যে, যাহার অভাব আছে এবং যাহা অপূর্ণ, তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—অভাব দূর করিয়া পূর্ণত্ব-প্রাপ্তির দিকে। জগতের মধ্যে যাহাই অপূর্ণ তাহাই পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হয়; এইরূপে যাহা সসীম তাহার প্রবৃত্তি অসীমত্বের দিকে। সুতরাং পূর্ণ সৌন্দর্য্য অনন্ত ও অসীমে। আত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণ এবং তাহার কিছুরই অভাব নাই, সুতরাং আত্মার রসাস্বাদন (এক দিকে) হইয়াই রহিয়াছে।

যে কখনও যাহার আস্বাদ পায় নাই, তাহার জন্য সে লালায়িত হইতে পারে না। মানুষ মাত্রেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের জন্য লালায়িত; তাই প্রশ্ন হইতে পারে, কবে এবং কোথায় আমরা পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আস্বাদ পাইলাম। পূর্ণ সৌন্দর্য্যের স্বাদ আমাদের আছে। আমাদের অন্তরের অভ্যন্তরে পূর্ণসৌন্দর্য্যের স্বাদ আছে। কিন্তু আমরা বৃত্তিদ্বারা যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করি তাহা অপূর্ণ, কারণ আমাদের সীমাবদ্ধ বৃত্তি পূর্ণ সৌন্দর্য্যের ধারণা করিতে অক্ষম। তাই বৃত্তিদ্বারা আমাদের সৌন্দর্য্যোপভোগ চরিতার্থ হয় না। আমাদের অভাব থাকিয়াই যায়—অভাব মিটে না। আত্মা স্বরূপতঃ পূর্ণ। যাহা পূর্ণ তাহাই সুন্দর। যাহা অপূর্ণ তাহাই অসুন্দর। আত্মাই সুন্দর। আমরা সকলেই জানি, অঙ্গহানিই সৌন্দর্য্যহীনতার কারণ। অঙ্গহানিত্ব ও অপূর্ণতা একই বস্তু।

জগতে যে সৌন্দর্য্য অনন্ত ও অপরিমিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, প্রকৃত কলাবিদ্ তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাহার আস্বাদ পাইয়া তাঁহার কলাশিল্পে তাহা বৃত্তিগ্রাহ্য পরিমিত আকারে পরিব্যক্ত করিতে

প্রয়াস পান। কাব্য, উপন্যাস ও চিত্রকলার উদ্ভবের কারণ এই যে, কবি, ঔপন্যাসিক ও চিত্রকর তাঁহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে যে সৌন্দর্য্যের আস্বাদ পাইয়াছেন, জগতে তাঁহারা বা অপরে তাহার সাক্ষাৎ পান না; তাই তাঁহারা বৃত্তিগ্রাহ্য পরিমিত আকারে তাহা তাঁহাদের কাব্য, উপন্যাস ও চিত্রে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন।

আমরা বাহিরে যে রূপটী দেখি তাহাই যে সুন্দব তাহা নয়। বাহিরের রূপটী আমাদের ভিতরের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। যাহা সুন্দর তাহা আমাদের অন্তরের অভ্যন্তরেই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি বাহিরের দিকে আকৃষ্ট বলিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ নাই। নানা প্রকার সংস্কারের আবরণ আমাদের চিত্তকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং আমাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য মেঘাবৃত সূর্য্যবৎ অপরিস্ফুট স্মৃতিরূপে বিরাজ করিতেছে। বাহিরের বস্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাহায্যে কিয়ৎপরিমাণে সেই আবরণকে সরাইয়া আমাদের অপরিস্ফুট স্মৃতিকে পরিস্ফুট করিয়া দেয়। এইরূপে আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগ্রৎ হয়।

আমরা ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাহায্যে যে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি তাহা খণ্ড সৌন্দর্য্য; কিন্তু সৌন্দর্য্য প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড। জীব-ভাবাপন্ন আত্মায় যুগপৎ অখণ্ড ও খণ্ড সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি হয়; খণ্ড সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি-কালে জীবের অখণ্ড সৌন্দর্য্যেরও উপলব্ধি হয়; কারণ তাহার অন্তর্নিহিত অখণ্ড সৌন্দর্য্যই ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাহায্যে খণ্ডাকারে অভিব্যক্ত হয়। জীবের চিত্তবৃত্তি বহির্মুখী বলিয়া সে এ ব্যাপার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না।

সৌন্দর্য্য যখন প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড, তখন সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপভোগ-কর্ত্তাও অখণ্ড। খণ্ডাকার সৌন্দর্য্যকে প্রকৃত সৌন্দর্য্য বলা যাইতে

পারে না। খণ্ড সৌন্দর্য্য যদি প্রকৃত সৌন্দর্য্য হইত তাহা হইলে জীব খণ্ড সৌন্দর্য্যে পরিতৃপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু খণ্ড সৌন্দর্য্যে জীবের সৌন্দর্য্য-পিপাসা মিটে না, তাহা তাহার পিপাসা আরও বাড়াইয়া দেয়; কিন্তু সীমাবদ্ধ জীব এই অতৃপ্ত পিপাসা বক্ষে করিয়া অনন্ত জীবন ঘুরিয়া বেড়াইলেও পূর্ণ সৌন্দর্য্যে তাহার পিপাসা মিটিবার আশা নাই। জীবের এই অনন্ত সৌন্দর্য্য-পিপাসাই সূচনা করে যে, জীবের পূর্ণ ও অখণ্ড সৌন্দর্য্যের আস্বাদন করা আছে। অথচ পূর্ণ ও অখণ্ড সৌন্দর্য্যের আস্বাদনকর্ত্তা অপূর্ণ ও খণ্ড হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে, জীবের যে অবস্থায় অখণ্ড ও পূর্ণ সৌন্দর্য্য আস্বাদিত হইয়াছে জীব সে অবস্থায় অখণ্ড ও পূর্ণ। একমাত্র অখণ্ড ও পূর্ণসত্তা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম; সুতরাং অখণ্ড ও পূর্ণ অবস্থায় জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়।

শ্রুতিতে আছে, পূর্ব্বে একমাত্র পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনি আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য বহু হইতে কামনা করিলেন এবং সেই কামনার ফলে বহু হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ণ ও অখণ্ড আত্মার আনন্দানুভূতি হইতে পারে না। আমার আনন্দানুভব করিতে হইলে আমার সদৃশ আরও অনেক আত্মার প্রয়োজন হয়। ব্রহ্মেরও বহু হইবার ক্ষমতা আছে। নহিলে তিনি বহু হইলেন কেমন করিয়া? যিনি এক হইয়াও বহু হইতে পারেন, তাঁহার সম্বন্ধে দ্বৈত বা অদ্বৈত বাদ প্রযোজ্য হইতে পারে না। তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অতীত। তিনি বস্তুতঃ একও নহেন বহুও নহেন। তিনি যুগপৎ এক ও বহু। একমাত্র ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা আত্মা ব্যতীত আর কিছুকে এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। আমি একদিকে যেমন অসীম, তেমনই আর একদিকে আমি সসীম। অসীমত্ব ও সসীমত্বের ভাব যুগপৎ আমার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

যে অবস্থায় আমি অসীম সে অবস্থায় আমি দেশ ও কালের অতীত; সসীমাবস্থায় আমি দেশ ও কালের সীমায় আবদ্ধ। কিন্তু দেশ ও কালের যে কোথায় আরম্ভ এবং কোথায় শেষ তাহাও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দেশ এবং কালেরও সীমা পাওয়া যায় না। যিনি ব্রহ্ম তিনি দেশ এবং কালের সীমায় আবদ্ধ থাকিতে পারেন না, অথচ দেশও অনন্ত, কালও অনন্ত। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যাহাই একদিকে এক, তাহাই আর একদিকে বহু। আমি যদি নিতান্তই অসীম হইতাম তাহা হইলে আমার অসীমত্বের ধারণা হইতে পারিত না। আমি এক-দিকে যেমন অসীম অপরদিকে তেমনই সসীম। এই অসীমত্ব ও সসীমত্ব যুগপৎ আত্মার আছে বলিয়াই আত্মা আনন্দ-রস পান করিতে সমর্থ।

যাহা পরিপূর্ণ এবং অখণ্ড তাহাই রস। জীবভৃঙ্গ তাহাই পান করিবার জন্য ব্যগ্র। যিনি পরিপূর্ণ এবং অখণ্ড ব্রহ্মানন্দরস, তিনিই আবার রসপান-পিপাসু অপূর্ণ খণ্ডাকৃতি জীবভৃঙ্গ। এই রসানুসন্ধান রসাস্বাদন ব্যাপারই বৈষ্ণব-সাহিত্যের রহস্য। ভক্তি-তত্ত্বে এই রহস্যের উদ্ভেদ হইয়াছে। আর এই ভক্তিতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইবার জন্য, ভক্তিশাস্ত্রে লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য বর্ত্তমান গ্রন্থকার যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আদর্শ যে মহান্-- উদার, ইহা যে ভক্তি ধর্ম্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ তাহা বুঝাইবার জন্য বর্ত্তমান 'বৈষ্ণব-সাহিত্যে'র লেখক তাঁহার চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের ভক্তিতত্ত্বে সংসারের আর্ত্ত ক্লান্ত নরনারীর জন্য আশা ও আনন্দের যে অভয়বাণী অন্তর্নিহিত হইয়া রহিয়াছে, সেই মর্ম্মবাণী লেখক সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। সেই প্রেমময়ের নিত্য প্রেমলীলা ক্ষুদ্র তুচ্ছ কাহাকে বাদ দিয়াও যে পূর্ণ হয় না; তাই তিনি সকলের জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন। এই

আশ্বাসবাণী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্মতত্ত্বকে অন্যান্য ভক্তিধৰ্ম্ম হইতে এক পরম গৌরবময় বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের রসাস্বাদনে এই মর্ম্মবাণীর অনুসরণ যে একান্ত প্রয়োজন গ্রন্থকার তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ ও পদগুলি উদ্ধার, উল্লেখ ও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া গ্রন্থকার বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের নীরস ফিরিস্তি দিতে প্রয়াস পান নাই। অথবা বৈষ্ণবধৰ্ম্ম ও দর্শনের তত্ত্বগুলির উৎকট বিশ্লেষণে বিভীষিকার উৎপাদন করিবার কোনরূপ চেষ্টাও করেন নাই। বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রাণের সন্ধান দিতে উৎসুক হইয়া সরল সহজ ভাষায় বিপুল বৈষ্ণব-সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন করাইবার জন্য তিনি যে সুষ্ঠু পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশে এক প্রকার নূতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিলাতে হড্‌সনপ্রমুখ মনীষিগণ সাহিত্যকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া বুঝাইবার জন্য যে সাধু উদ্যম করিয়াছেন বর্ত্তমান গ্রন্থকারের প্রচেষ্টাও সেই ধারার অনুসরণ করিয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের এরূপ একখানি মৰ্ম্মগ্রাহী ইতিহাসের অভাব দেশে বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছিল। গ্রন্থকার সেই অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, একথা বলিতেই হইবে। যাহাতে বৈষ্ণব সাহিত্যকে অবজ্ঞার চক্ষে না দেখিয়া লোক ইহার দিকে প্রীতিপ্রণোদিত হইয়া আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হন "বৈষ্ণব-সাহিত্য" প্রণেতা বরাবর এই উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার এই সাধু চেষ্টা সার্থক হউক।

কলিকাতা
১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

বৈষ্ণব সাহিত্য

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আদি নির্ণয়

কোন ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কাল নির্ণয় করা যেমন দারুণ দুরূহ ব্যাপার, সাহিত্যের উৎপত্তি নির্ণয়ও প্রায় সেইরূপই দুঃসাধ্য। যে সব দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস বা প্রাচীন কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে অথবা প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রাচীন তথ্য ও কাহিনী-সকল সম্পূর্ণ আলোচিত হইয়া ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, সেখানেও সাহিত্যের উৎপত্তি-কাল নির্ণয় সহজ সাধ্য নহে। ইংরেজী সাহিত্য ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এত আলোচনার ফলেও ইংরেজী সাহিত্যের উৎপত্তির নির্দ্দিষ্ট কাল নির্ণয় সুনিশ্চিত হয় নাই, তবে একটা যুগ নির্ণয় স্থির হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির কাল নির্ণয়ের সময় এখনও আসে নাই, কারণ বাঙ্গালার ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনা হইবার সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে কিন্তু অদ্যাপি এ বিষয়ে ধারাবাহিক বিধিবদ্ধ ঐতিহাসিক প্রণালী-সম্মত আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। পাশ্চাত্য ভাষাবিদ্

পণ্ডিতগণ সময়ে সময়ে এসিয়াটিক্ সোসাইটীর অধিবেশনে পরস্পর চিত্ত বিনোদনের জন্য যে প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন এবং পণ্ডিত গ্রিয়ারসন্ প্রভৃতি যে সময়ে সময়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন ও যাহা কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্য কোন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সমালোচনা বা তৎসংগ্রহ এখন পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। এতদিন আমরা অত্যন্ত নিষ্কামভাবে এই সকল আলোচনা শ্রবণ করিতেছিলাম এবং পরম কৌতূহলের সহিত বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এই সকল সিদ্ধান্ত গবেষণার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, এখন সাহিত্য-সেবীদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজেই আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, দীনেশ বাবু ইঁহাদিগের অগ্রণী। সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে এই দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং প্রাচীন সাহিত্যের নানা বিভাগের লুপ্তপ্রায় অংশগুলি সংগৃহীত, উদ্ধৃত, আলোচিত ও প্রকাশিত হইয়া ঐতিহাসিক আলোচনা ও তথ্য-নির্ণয়ের সুযোগ করিয়া দিতেছে। বঙ্গদেশের যে কোন বিষয়ের প্রাচীন ইতিহাস রচনা করিতে হইলে এই সকল অনাদৃত লুপ্তপ্রায় প্রাচীন সাহিতের ভগ্নাংশ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আলোচনার মূলে সর্ব্বদাই একটা ত্রুটি থাকিয়া যায়; কারণ খৃষ্টের জন্ম-কাল তাঁহাদের প্রাচীনতার পরিমাপক। মানব-সভ্যতা যে নানা দেশে খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্ব্বেই নানা ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, একথা অপরিহার্য্য সত্য হইলেও সাক্ষাৎ-ভাবে স্বীকার করিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন; বুদ্ধের জন্ম অবিসম্বাদিত ভাবে খৃষ্টের পূর্ব্বে হওয়াতে এবং বৌদ্ধ যুগের সভ্যতার সুস্পষ্ট নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে নিতান্ত অনিচ্ছায় খৃষ্টপূর্ব্ব সভ্যতা

ও জ্ঞান-বিস্তারকে মানিয়া লইতে হইতেছে। তবে, সে গুলিকে, সম্পূর্ণ ভারতীয় বলিতে ব্যথা লাগে বলিয়া কখন গ্রীক, কখন রোমান, কখন সেবিয়ান, কখন মিশর-সভ্যতার ছাঁচে-ঢালা অথবা সেই সকল সভ্যতার অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত বলিয়া কিছু সান্ত্বনা অনুভব করেন। এই বৌদ্ধ সভ্যতা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার জ্ঞান-বিকাশের শেষ অধ্যায় মাত্র, দার্শনিক চিন্তা ও সাধন-তত্ত্বের সূত্র ধরিয়া আলোচনা করিলে ইহাই স্বাভাবিক ভাবে প্রতিপন্ন হয়, অথচ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় বিষয়কে উপকথার আখ্যান বস্তু বলিয়া মনে করেন। এবং এই কারণেই বৌদ্ধ যুগের ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষের যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তাঁহারা সেগুলিকে আকস্মিক মনে করিয়া বিশেষ বিস্মিত হইয়া থাকেন এবং কল্পনার আশ্রয়ে এইগুলির অনন্য সাধারণত্ব আশ্চর্য্য অনুকরণের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা যে বিস্ময় প্রকাশ করেন, তাহাতেই আমরা কৃতার্থ মনে করি এবং তাঁহাদের বিকৃত প্রশংসাবাদ অকুণ্ঠিত ধন্যবাদ মনে করিয়া শিরোধার্য্য করি। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের বা বৌদ্ধ যুগের কতটুকুই বা আমরা জানিতে পারিতেছি। আর যে ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ বৌদ্ধ সভ্যতায়, তাহার নিদর্শনমূলক কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ ও প্রস্তর ফলক এবং লুপ্ত বিহার ও ভগ্ন মন্দির ভিন্ন অন্য সমুদায়ই অতীতের অন্ধকার-গর্ভে চির বিলীন হইয়া গিয়াছে। ভারতের জ্ঞান, গৌরব ও প্রাচীন সভ্যতার বিষয়ই আমরা আপন চেষ্টায় অবগত হইতে শিখি নাই, বঙ্গ দেশের ত কথাই নাই। বিদ্যালয়ের ইতিহাস পাঠ করিয়া বঙ্গদেশ-সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারণা আমাদের অধিকাংশের মনে অজ্ঞাতসারে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতুকাবহ ও হাস্যজনক। বঙ্গদেশ

বলিলেই আমরা মনে করি পদ্মা বা মেঘনা নদীর উভয় তীরে যেমন আবাদযোগ্য এবং কালক্রমে বাসোপযোগী চর উৎপত্তি হইয়াছে, এই বাঙ্গালা দেশটাও তেমনি অল্প কয়েকশত বৎসরের সৃষ্টি। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস বল্লালসেনের কৌলিন্য ও দ্বাদশ অশ্বারোহীর আগমনে রমণী-অঞ্চল-তল-আশ্রয়কারী লক্ষণসেনের পলায়ন। দ্বিতীয় প্রাচীন কথা অন্ধকূপ হত্যা, পলাশীর যুদ্ধ ও নন্দকুমারের ফাঁসি, তার পরেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ইংরেজ রাজত্ব। অনেক শিক্ষিত যুবকের স্বদেশের ইতিহাসে জ্ঞান ইহার অতিরিক্ত বিন্দুমাত্র নাই। এই বঙ্গদেশের কথা যে আরণ্যকে, হরিবংশে, মহাভারতে, মনুসংহিতায় আছে তাহা কি মনে পড়ে না। আমরা সকলে জানি ? যে মগধ গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত, সেই মগধের রাজা জরাসন্ধের প্রতাপে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় পলায়ন করিতে হইয়াছিল এবং বাঙ্গালার পাণ্ডুয়ার রাজার প্রতাপে দ্বারকাধিপতি কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই মগধেই জগৎ-জয়ী বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও অক্ষুণ্ণ কীর্ত্তি বৌদ্ধ সভ্যতার জন্মভূমি ও লীলাক্ষেত্র। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও উৎকল—এই পঞ্চ গৌড়ের অধিপতি প্রতাপে প্রভাবে ভারতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁহারা বিশেষ-ভাবে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। খৃষ্ট পূর্ব্বে বৌদ্ধযুগে বঙ্গ দেশের যে শ্রীবৃদ্ধি, সভ্যতা ও শক্তিশালিতার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়, তাহা স্মরণ করিলে কোন্ বাঙ্গালীর প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল ও জাতীয় গর্ব্বে পূর্ণ না হইয়া উঠে ? এই বাঙ্গালার বাণিজ্য-তরী ভারত-সাগরে পারস্যোপ-সাগরে ও প্রশান্তমহাসাগরের নানা স্থানে যাতায়াত করিত, আর এই বাঙ্গালার রণতরী সিংহল ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিল। আর সেই পলায়নপর লক্ষণসেনের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে এই প্রবাদ-কলঙ্ক সহজেই রহস্যপ্রিয় বিদ্বেষী কবি-কল্পনার

অমূলক সৃষ্টি বলিয়া প্রমাণিত হইবে। সেনরাজগণের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়া ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। লক্ষ্মণসেনের সভায় জয়দেব, উমাপতিধর, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও কবিরাজ ধোয়ী—এই পঞ্চ রত্ন ছিলেন। ইঁহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, তন্মধ্যে জয়দেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। উমাপতির রচিত এই লক্ষ্মণসেনের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি নিখিল কলার পরিণতি ও রণতরী ও অসংখ্য বাহিনীর অধিপতিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কবে আমরা আত্মচেষ্টায় নিজের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণসকল সংগ্রহ করিয়া ধন্য হইব। আমরা আমাদের দেশকেও চিনি না, জানি না, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকেও চিনি না জানি না।

এই পলাশীয় যুদ্ধের বাঙ্গালা দেশ প্রাচীন সভ্যতা, শিল্প কলা ও ধর্ম্ম-সাধনার কেন্দ্র স্থল ছিল। এই বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষেরা সিংহল বিজয় করিয়া তথায় রাজত্ব ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সিংহলে যে সম্বৎ প্রচলিত আছে, তাহা বাঙ্গালী বিজয় সিংহের রাজত্ব-কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইনি খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৪৩ সনে সিংহলে রাজত্ব স্থাপন করেন। চম্পা নগরের অধিবাসীরা কোচিন চায়নাতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সেখানে তাঁহাদের রাজত্ব বিস্তার করেন। অদ্যাপি সেখানে ইহার উজ্জ্বল নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। আর বাঙ্গালার শিল্প কলার নিদর্শন এবং নিপুণ শিল্পী ও ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারকের পদচিহ্ন অদ্যাপি শ্যাম, সিংহল, যাবা, ক্যাম্বোডিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বাঙ্গালা দেশ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল ছিল। এখান হইতেই বৌদ্ধ প্রচারকেরা এসিয়ার দূর-দূরান্তে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে যাত্রা করিয়া-ছিলেন। অনেক বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও মহাভিক্ষু এই বাঙ্গালায়

জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাপানের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি অদ্যাপি একাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। প্রত্নতত্ত্বসকল আরও যত আলোচিত হইবে, ততই বাঙ্গালার কীর্ত্তি, বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালার অসীম শক্তিশালিতা ও কলা-নিপুণতা সাধারণের নিকট প্রতিভাসিত হইবে।

প্রত্যেক ভাষার তিনটী অবস্থা আছে। প্রথম যখন কোন ভাষা কেবল কথা-বার্ত্তার ভাষা থাকে, তাহার আর কিছু থাকে না। যেমন আদিম অধিবাসীদিগের ভাষা, পার্ব্বত্য প্রদেশের বিভিন্ন ভাষা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমাদের দেশের বেদিয়াদের ভাষাও বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় অবস্থা ভাষায় কথাবার্ত্তা চলে আবার নিজস্ব বা অনুকৃত লিপিমালা আছে। সামান্য দুই-একখানি অনুবাদ গ্রন্থ বা দুই-একটী গান পাঁচালী থাকিতে পারে কিন্তু সাহিত্য নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সাঁওতাল পরগণার ও বেহারের কোন কোন অংশের বিকৃত হিন্দীর কথা বলা যাইতে পারে এবং ত্রিপুরার প্রচলিত টিপরা ভাষার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তৃতীয় অবস্থা ভাষার নিজস্ব লিপিমালা আছে, নিজস্ব সাহিত্য আছে, যাহার ভিতর দিয়া মানব-প্রাণের সকল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইতেছে, সকল চিন্তা ও সকল ভাব প্রস্ফুটিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, প্রথম দুই অবস্থার ভিতর দিয়া সকল ভাষাকেই আসিতে হইয়াছে। বাঙ্গালার অক্ষরমালা কবে রচিত হইল এবং কাহার আদর্শে গঠিত হইল এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নহে। কেন না ভারতীয় লিপিমালার জন্ম-পত্রিকা রচনা এখনও হয় নাই। ভারতীয় লিপিমালার একটী নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে এবং বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে, একথা কোন কোন প্রতীচ্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত স্বাভাবিক ভাবোচ্ছ্বাসে অকপটে বলিয়া ফেলিয়াছেন। তবু পণ্ডিত মোক্ষমূলারের মত অনেকে

এই লিপিমালাকে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। বঙ্গভাষা, বঙ্গলিপির উৎপত্তির কাল নির্ণয় এখনও সম্পূর্ণ অসম্ভব, তবে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাকে যেরূপ অল্পবয়স্ক মনে করেন, সে সিদ্ধান্তের ভ্রমাত্মকতা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। খ্রীষ্ট-জন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে বালক শাক্যসিংহ অধ্যাপকের নিকট বঙ্গ-লিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন প্রমাণ পাওয়া যায়, সুতরাং বঙ্গভাষা তাহারও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা এখন যে বাঙ্গালার অক্ষরগুলি ব্যবহার করি, তাহা কোন্ সময়ে গঠিত হইয়াছিল তাহার নিরূপণ সহজসাধ্য নহে। এইগুলি কোন লিপিমালার ক্রম-বিকাশ তাহাও নির্ণয় করা সম্প্রতি সম্ভব নহে। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া নানা পরিবর্ত্তন প্রভাবে বঙ্গাক্ষর পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। ভারতীয় আদিম লিপিমালার ক্রমবিকাশ ফলে যেমন অশোক-লিপি উদ্ভূত হইয়াছে, তেমনি সেই আদি লিপির দেশ-ভেদে পরিণতি এই বঙ্গলিপি কি না কে বলিবে? যত আমরা নিজে আলোচনা করিতে শিখিব এবং স্বাধীন ভাবে তথ্য সংগ্রহ ও চিন্তা করিতে পারিব ততই সুন্দর, সত্য, ও স্বাভাবিক মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিব। প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যসকলের সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষার আদি রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকিবে। অথবা নদীর উৎপত্তি-স্থান নির্ণয়ের মত চিরকালই সুদূরাগত ও দুরবগাহ্য হইয়া থাকিবে। বঙ্গবাসী আর্য্যদিগের ভাষা কবে উৎপত্তি হইল, কি প্রাণালীতে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল, ইহার স্বরূপ নির্ণয় নিতান্ত দুঃসাধ্য ও বর্ত্তমানে অসম্ভব। তবে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় এই বাঙ্গালা ভাষা বহু দিন হইতে যুগযুগান্তর ধরিয়া নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ক্রমে এই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। কথিত ভাষা হইতে

কবে কোন সুবর্ণ সুযোগে ইহা লিখিত ভাষায় পরিণত হইল, কবে ইহার লিপিমালা রচিত হইল, তাহা নির্দ্দেশ নিতান্ত দুঃসাধ্য। বঙ্গভাষার আদিরূপ কি, তাহা বৈদিক ভাষা বা সংস্কৃত বা পালি বা প্রাকৃতের কতটুকু রূপান্তর বা পরিণতি অথবা ইহা আদিকালের কথিত ভাষার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ও লিখিত ভাষার পরিপূর্ণ পরিণতি এই সকল আদি বৃত্তান্তের রহস্য অতীত ইতিহাসের অন্ধকার-গহ্বরে চিরলুক্কায়িত থাকিবে বা কখনও উদ্ঘাটিত হইবে তাহা নির্দ্দেশ করা আমাদের সাধ্য নাই, তবে আমাদের বক্তব্য—এই বঙ্গভাষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে জন্ম লাভও করে নাই এবং ইহার লিপিমালা নাগরী অক্ষরের ছাঁচে ঢালাও নহে।

অদ্যাপি প্রাচীন তথ্যসকল যতটুকু আলোচিত হইয়াছে, বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের যতটুকু আবিষ্কৃত ও সমালোচিত হইয়াছে তাহা হইতে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বাঙ্গালা ভাষা লিখিত ভাষার গৌরব বৌদ্ধ যুগেই লাভ করিয়াছিল। এই বৌদ্ধ যুগের সীমা-রেখা বা আদিকাল নির্ণয় এখনও হয় নাই। আবার ব্রাহ্মণ্যের পুনরুত্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া যখন বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিল, তখন সেই সঙ্গে গৌড়ীয় ভাষায় রচিত ও লিখিত গ্রন্থগুলিও নির্ব্বাসিত হইল। সুতরাং ধারাবাহিক অনুসন্ধানের ফলে চট্টগ্রাম, মণিপুর, ময়ূরভঞ্জ, শ্রীহট্ট, কুচবিহার ও নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতে বৌদ্ধ যুগের গ্রন্থাদি সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার স্বরূপ-নির্ণয় সম্ভব হইবে এবং সেই সকল প্রাচীন গাঁথা, দোঁহা প্রভৃতির সাহায্যে অনেকে পুরাতন তত্ত্বের সহিত ভাষাতত্ত্বের রহস্য-ভেদও সম্ভব ও সহজ হইবে। এ বিষয়ে আমাদিগকে ধারাবাহিক চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে কেবল মাত্র কৌতূহলী বিদেশী

পণ্ডিতের জ্ঞান-লিপ্সার সাধন-ফলের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। এখন আমাদের দেশে প্রত্নতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু বিদ্বান লোকের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই সকল পুরাতত্ত্ব সংগৃহীত হইয়া বঙ্গদেশের ও ভাষার ধারাবাহিক সত্য ইতিহাস রচিত হইবে। বঙ্গভাষার উৎপত্তি নির্ণয় যেমন দুঃসাধ্য তেমনি লিখিত বঙ্গ ভাষার উৎপত্তি নির্ণয়ও সম্প্রতি সহজসাধ্য নহে। ইহার আদি নির্ণয়ের ভার ভবিষ্যৎ প্রত্নতত্ত্ববিদ্-পণ্ডিতগণের হস্তে সমর্পন করিয়া পরিণত লিখিত ভাষার যুগ-নির্ণয়ে চেষ্টা করিব। লিখিত ভাষার ও আদিরূপ অন্বেষণ সম্প্রতি স্বর্ণ মৃগ অন্বেষণের ন্যায়, সাহিত্যরূপে যাহা পাইয়াছি অথবা যাহার ভগ্নাংশ হস্তগত হইয়াছে, সেখান হইতে ইহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রাচীন বৌদ্ধ-সাহিত্য

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের কাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে যত আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একটা যুগ-নির্ণয় সম্ভব হইয়া উঠিতেছে। ভবিষ্যতে এই সীমা-রেখা সরিয়া যাইতে পারে কিন্তু সম্প্রতি সপ্তম শতাব্দী আদিকাল বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। এই বাঙ্গালা দেশে এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অতি প্রবল প্রতাপান্বিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদেশী পর্য্যটক হিয়েনসাং এদেশে বহু সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিয়াছিলেন। পাল রাজাদিগের সময়েও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল। বৌদ্ধ- ধর্ম্মের অভ্যুদয়েই ইহা

বাঙ্গালায় প্রচলিত ও প্রভাবশালী হইয়াছিল কিনা তাহা এখনও মীমাংসিত হয় নাই, তবে অন্যত্র প্রভাব বিস্তার করিবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষ সৌরাষ্ট্র মগধেষ চ। তীর্থযাত্রাং বিনাগচ্ছন্. পুনঃসংস্কারমর্হতি॥ এই বচনে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ প্রভাবাধিক্য দেখিয়াই অন্য দেশের হিন্দুরা বাঙ্গালা দেশকে অতি অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। এবং যাহার কিছু পরিচয় এখনও উত্তর-পশ্চিমের হিন্দুদিগের মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে এক সময়ে শ্রেষ্ঠতম বৌদ্ধ অধ্যাপক, বৌদ্ধ সাধক, বৌদ্ধ দীপঙ্কর, জৈন তীর্থঙ্কর প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করিয়া জগতে বাঙ্গালার অসাধারণ গৌরব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য, ধর্ম্ম-সাধনা ও উচ্চজীবন বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে এবং মানব চিন্তা, জ্ঞান, ও সভ্যতাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। এই সময়ে যে অনেক গাঁথা, কবিতা, দোঁহা, পদ রচিত হইবে ইহা অতি স্বাভাবিক। বৌদ্ধধর্ম্ম একদিকে যেমন সকল প্রকার বন্ধন-পরমুখাপেক্ষিতা হইতে মুক্ত করিয়া মনুষ্যত্বকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিল তেমনি সকল বাধা লঙ্ঘন করিয়া জনসাধারণকে এক উন্মুক্ত মহাকাশতলে আহ্বান করিল। মানুষ যখন আপন দুর্ব্বলতায় পীড়িত হইয়া নানা বৈষম্যে লাঞ্ছিত হইয়া আশ্রয় না পাইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল এবং বহু বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনায়ত্ত দৈব কৃপা লাভ সুদূর-পরাহত ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিল এবং মন্ত্র-সাধনা-বলে ও গুরু-কৃপায় বাহিরে দেবতার অনুসন্ধান করিতেছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম তখন মনুষ্যত্বকে সকল বিভীষিকা ও সকল দুঃসাধ্য সাধনার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া মানুষকে আপনার ভিতরে দেবতার সন্ধান, আপনার আয়ত্ত সাধনার পথ

নির্দ্দেশ করিয়া দিল। এই উন্মুক্ততা এই অপূর্ব্ব দিব্যালোকের আভাস তৎকালীন সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সাহিত্য এখন কোথায়? বর্ত্তমান সময়ে যত প্রাচীন সাহিত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া না গেলেও বৌদ্ধ প্রভাবের সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। শূণ্য পুরাণ, মাণিকচাঁদের গান ও গোবিন্দচন্দ্র রাজার গানে বৌদ্ধ প্রভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের ন্যায় বৌদ্ধ সাহিত্য ও বাঙ্গালায় নিশ্চয়ই অতি প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বৌদ্ধ সাহিত্য কোথায় গেল? শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কিছু দিন হইল নেপাল হইতে কয়েকখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ আনিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন এবং পরিষদে এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, এইরূপ বহু গ্রন্থ নেপাল, তিব্বত, চট্টগ্রাম, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এখনও বর্ত্তমান আছে। অনেক বৌদ্ধ যুগের বাঙ্গালা গীতি, কবিতা, দোঁহা প্রভৃতি রহিয়াছে, যাহার উদ্ধার সাধন বহু সময় ও শ্রম-সাপেক্ষ বটে, কিন্তু উদ্ধার হইলে কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের নহে, বাঙ্গালা দেশেরও প্রাচীন ইতিহাস রচিত হইবার সুযোগ ঘটিবে।

তিনি বলেন, চৈতন্যদেবের অন্ততঃ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ও পূর্ব্ব ভারতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণ সংকীর্ত্তনের নানা ভাবের গান ও পদ রচনা করিয়া নানা রাগ-রাগিনীতে ঐ সমস্ত গান গাহিয়া ভারত-বাসীর মন বৌদ্ধ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরা গীতিকা ভিন্ন দোঁহাও রচনা করিতেন। বাঙ্গালার এই সকল বৌদ্ধ সংকীর্ত্তনের পদ, গাঁথা দোঁহা এখন কোথায় গেল? বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন নিপীড়িত লাঞ্ছিত হইয়া বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিল, তখন বৌদ্ধ

সাহিত্যও এই দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। যে সকল স্থানে এখনও বৌদ্ধ ধর্ম্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে, সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিলে বৌদ্ধ সাহিত্যের সন্ধান মিলিবে বলিয়া আশা করা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল পদের সন্ধান পাইয়াছেন এবং নেপাল হইতে প্রাপ্ত যে গ্রন্থ দুইখানি প্রকাশিত করিয়াছেন, ইহার বাঙ্গালা অতি দুর্ব্বোধ্য। এই গীতিকা, পদাবলী প্রভৃতির নামও বিশেষ ভীতিপ্রদ। এক নিঃশ্বাসে বলা যায় না। নমুনা-স্বরূপ অদ্বয়বজ্র-নামক একজন বৌদ্ধ সংকীর্ত্তনের পদ-কর্ত্তার একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থের নাম "দোঁহানিধি কোষ পরিপূর্ণ গীতি নাম নিজ তত্ত্ব প্রকাশ টীকা" উল্লেখ করিতেছি। এই নামের বাঙ্গালা গ্রন্থের রসাস্বাদন সকলের ভাগ্যে জুটিবে না, বিশেষতঃ নাম শুনিয়াই অনেকের দন্ত ও প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে। যে নাম উল্লেখ করিলাম ইহা অনন্যসাধারণ নহে। সরোরুহবজ্র নামক একজন দোঁহা-কোষ-রচয়িতার গ্রন্থের নাম "ভাবনা দৃষ্টি চর্য্যাফল দোঁহাকোষ গীতিকা"। আর বেশী উল্লেখ করিয়া বিভীষিকা সঞ্চার করিতে ইচ্ছা করি না। এই সকল পদ-কর্ত্তাদিগের নামও যেমন প্রবল প্রতাপশালী গ্রন্থের নামও তেমনি জীমূত মন্দ্র নিনাদী ও দিগন্ত প্রসারী। সখের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এখানে উপস্থিত হইলেই আর প্রত্নতত্ত্বের জল্পনায় আমোদ অনুভব করিবেন না। এই সকল অপূর্ব্ব শব্দগুলির সন্ধান বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, টেকস্‌ট্‌বুক কমিটীর নির্ব্বাচিত গ্রন্থকার ও ইউনিভারসিটীর পরীক্ষক মহাশয়েরা এখনও বোধ হয় পান নাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা এইগুলি নিক্ষেপ করিয়া শিশুদিগের দন্ত ও মস্তক চূর্ণ করিতেন। ইহা অপেক্ষা শিশুপাল-বধের অমোঘ অস্ত্র আর দ্বিতীয় নাই।

এই সকল পদ, কীর্ত্তন, দোঁহা বাঙ্গালা বলিয়া গ্রহণ করিব কি না? কেহ কেহ এই প্রশ্নও করিতেছেন। এগুলি দুর্ব্বোধ্য ও প্রাচীন বলিয়া পরিত্যাগ করিবার কোন কারণ নাই। সকল দেশের প্রাচীন রচনা দুর্ব্বোধ্য ও শ্রুতিকটু তাই বলিয়া কোন দেশই তাহা পরিত্যাগ করে না। (Old English Classics) পুরাতন ইংরাজী সাহিত্যের ভাষা সহজপাঠ্যও নহে, সহজবোধ্যও নহে, তাই বলিয়া তাহা অস্বীকৃত, অগ্রাহ্য নহে। এই বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে কতকগুলি পালি ও প্রাকৃত ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্মমূলক শব্দ তখন বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল এবং সেগুলি তখনকার বাঙ্গালীর সহজ-বোধ্য ছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যেমন মুসলমান আমলের মুসলমানী বাঙ্গালা গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। আর তখনকার প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দও এখন অনেক অপ্রচলিত হইয়াছে এবং অনেক শব্দের রূপান্তর ও অর্থান্তর হইয়াছে। এই সকল পদে সংস্কৃত, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অথবা বিকৃত সংস্কৃত, প্রাচীন বাঙ্গালা ও চলিত বাঙ্গালা শব্দের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আছে। কোন কোন পদে শতকরা সংস্কৃত শব্দ ১৩ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৯ প্রাচীন বাঙ্গলা ৫৫ ও চলিত বাঙ্গালা ১৩টী শব্দ আছে। যে সকল পদে বিকৃত সংস্কৃত ও প্রাচীন বাঙ্গালার হার বেশী, সেই পদই দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দের মধ্যে অনেকগুলি শব্দ তখন বৌদ্ধধর্ম্ম সাধন ও সমাজের ভাব প্রকাশক (Technical terms) বিশিষ্ট শব্দ। সেই সকল ভাবের সহিত তখনকার জনসাধারণের পরিচয় ছিল, কাজেই সেই সব শব্দ তখনকার সাধারণের ভাষা ছিল। বৌদ্ধাচার্য্যেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকও ছিলেন না এবং বরযাত্র-ঠকানো কবিতা

রচনার ভারও গ্রহণ করেন নাই; সাধারণের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতে যে সকল পদ, দোহা ও গান রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি নিশ্চয়ই তখনকার সাধারণ বোধগম্য ভাষায় রচিত হইয়াছিল। মুসলমান আমলের প্রাচীন গ্রন্থাদি আবিষ্কার করিয়া প্রকাশিত করিয়া আমাদের সাহিত্যকে যেমন সম্পদশালী করিতে হইবে, তেমনি কঠোর পরিশ্রম ও অক্লান্ত অধ্যবসায় লইয়া এই বৌদ্ধ সাহিত্য আবিষ্কার আলোচনা ও প্রকাশ করিতে হইবে।

এই সকল গান ও পদের আলোচনা ও রসাস্বাদন করিবার শক্তি আমাদের নাই, এখনও সে সুযোগ ঘটে নাই। ভবিষ্যতে এইগুলি ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায় যদি টীকা-টিপ্পনি ও যথাযোগ্য মুখবন্ধ লইয়া প্রকাশিত হয় তখন ইহার আলোচনা সম্ভব হইবে। একটী গান এখানে উদ্ধৃত করিয়া সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছি বলা বাহুল্য ইহার রসাস্বাদন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। সবর পাদ বা শবরীশ্বর নামক একজন বৌদ্ধ পদ-কর্ত্তার গান নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিতেছি।

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছু পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত্ত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলা গুহাডা তোহৌরি।
নিঅ ঘরিণী নামে সহাজ সুন্দারী॥
নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী!
একেলী সবরী এবণ হিন্ডই কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী॥

ইহাতে শতকরা ১৭টী বাঙ্গালা ৫৬টী পুরাতন বাঙ্গালা ১২টী সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অথবা বিকৃত সংস্কৃত এবং ১৫টি সংস্কৃত শব্দ আছে। এই সকল গীতিকা দোঁহা প্রভৃতিতে যে ভাষা দেখা যায় তাহা হইতে

ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, তখনকার প্রচলিত বাঙ্গালা প্রাকৃতের অতি সন্নিহিত ছিল এবং বেহার, উৎকল এবং আসামের অনেক অংশ বাঙ্গালা বলিয়া গণ্য ছিল বলিয়া বেহারী উৎকলী ধরণ ভাষায় সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা প্রচলিত শব্দ অথবা লৌকিক প্রাকৃত শব্দ বেশী পাওয়া যায়। কতকগুলি শব্দ বৌদ্ধভাবব্যঞ্জক। বৌদ্ধ ধৰ্ম্মতত্ত্বের সহিত যাঁহারা সুপরিচিত, তাঁহাদের নিকট ইহা দুর্ব্বোধ্য নহে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন শব্দগুলি বুঝিতেও বেশী ক্লেশস্বীকার করিতে হয় না। অধিকাংশ স্থলে বানানের পরিবর্ত্তন। আবার অনেক শব্দ প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়াছে বানান-বিভ্রাটে, কেননা এই সকল গাথা, গীতি, পদগুলি—সবই হাতে-লেখা পুঁথিতে, আবার সেকালের লোকেরা বানানটা বড় গ্রাহ্য করিত না। অনেক শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুযায়ী অনেক শব্দে মগধের প্রচলিত নিয়ম-অনুযায়ী বিভক্তি দেখা যায়। কোন কোন পদে উড়িষ্যার প্রচলিত ক্রিয়াপদের শেষে 'ল' স্থানে 'ড়' ব্যবহার দেখা যায়। এই বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনা করিতে অনেক শ্রম, কষ্ট-স্বীকার ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। ইহার উপযুক্ত সমালোচনার সময় এখনও আসে নাই। আশা করা যায় অচিরে এই দিকে সাহিত্য-সেবীদিগের দৃষ্টি পড়িবে এবং এই বিজন কৰ্ম্মক্ষেত্রে উপযুক্ত কৰ্ম্মীর অভাব হইবে না।

বৌদ্ধযুগের সাহিত্য

পূর্ব্বে বৌদ্ধ সাহিত্যের কথা বলিয়া এখন বৌদ্ধযুগের সাহিত্য নাম দিয়া যে সাহিত্যের কথা বলিতে যাইতেছি, সেকথা বলিবার পূর্ব্বে

এই উভয় সংজ্ঞার পার্থক্য ও বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিতেছি। বৌদ্ধ সাহিত্য বলিতে এই বুঝায় যে, যখন বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতেছিল, তখন বৌদ্ধাচার্য্যগণ ও সিদ্ধ সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধধর্ম্ম-তত্ত্ব বা মহিমা-সূচক যে সকল গাঁথা, গীতিকা, দোঁহা ও পদ তখনকার বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন যাহার অতি যৎকিঞ্চিৎ ভগ্নাংশ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টায় সাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়াছে. সেই সাহিত্যকে আমরা বৌদ্ধ সাহিত্য আখ্যা দিয়াছি। ইহার কাল-নির্ণয় এখন সম্ভব নহে, তবে অজ্ঞাতকাল হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার যুগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অষ্টম শতাব্দী হইতে মুসলমান-বিজয়ের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১১০০ একাদশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছিল যাহাতে বৌদ্ধ প্রভাবের সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে, যে সকল গানে কবিতায় বৌদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে সেইগুলিকে বৌদ্ধ যুগের সাহিত্য বলিতেছি। এই বৌদ্ধ যুগের বা বৌদ্ধ প্রভাবের সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নানা মত অলক্ষিতভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি নীতিসূত্র রচিত দেখা যায়। এই সকল নীতিসূত্রে দেবতা বা পরলোকের দোহাই নাই। আর এই সাহিত্য সংস্কৃত শব্দের আধিপত্য অতি কম এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও নাই। বৌদ্ধ সাহিত্য আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এই বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যকেই আমরা এতদিন বাঙ্গালার আদি সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিলাম। এই বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যও কিছু সমুদায় আবিষ্কার করিতে পারি নাই। এখন কতস্থানে অনাদৃত ভাবে কত লুপ্তপ্রায় রত্নমালা লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার মধ্যে শূন্য পুরাণ, মানিকচাঁদের রাজার গান, গোবিন্দচন্দ্র রাজার গান, চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় ও বোধি চর্য্যাবতার

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাক ও খনার বচন এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। পালরাজাদিগের গৌরব ও মহিমা জ্ঞাপন করিয়া যে সকল গান রচিত হইয়াছিল তাহাও এই যুগের; দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত। এই মহীপাল পালরাজবংশের কোন পরাক্রমশালী রাজা। যাঁহার কীর্ত্তি ও বীরত্ব-কাহিনী অবলম্বন করিয়া নানা গান রচিত ও সাধারণে প্রচলিত ছিল। এই গানগুনি কি প্রকারের তাহা কখন সংগৃহীত হইলে বোঝা যাইবে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত কানুভট্ট বিরচিত চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় ভাষার হিসাবে বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, তবে সময়ের হিসাবে এই যুগের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কারণ কানুভট্ট একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এই কানুভট্ট বাঙ্গালী এবং তাঁহার গানগুলি প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত। এই গানে সহজ যানের মত অভিব্যক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ ধর্ম্মমঙ্গলের কোন কোন সংস্করণকে এই যুগের সাহিত্য-পর্য্যায়ে স্থাপিত করিতে চাহেন। সকল ধর্ম্মমঙ্গল যে এই যুগের সাহিত্য-পর্য্যায়ভুক্ত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় কেহ কেহ মনে করিতেছেন হাড়ি ডোম, পোদ, বাগদি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে যে ধর্ম্মপূজা অদ্যাপি প্রচলিত আছে তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত রূপান্তর। এই ধর্ম্মপূজাতে বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ধর্ম্মপূজা যাহারা করে, তাহারা আপনাদিগকে হিন্দু হইতে ভিন্ন মনে করে না এবং এখন অনেক স্থানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতেই ধর্ম্মপূজা করিয়া থাকেন। ময়ূর ভট্টের রচিত ধর্ম্মমঙ্গল সম্প্রতি আদি ধর্ম্মমঙ্গল বলিয়া গণ্য হইতেছে। এই ময়ূর ভট্ট কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কখন ধর্ম্ম-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ

তিনি মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কোন কোন কবিতায় জানা যায় ময়ূর ভট্ট ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম ধর্ম্মমঙ্গল বৌদ্ধভাবাপন্ন ও বৌদ্ধমত-জ্ঞাপক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, সেই জন্য এই ধর্ম্মমঙ্গলকে এই পর্য্যায়-ভুক্ত করা যাইতে পারে।

অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে শূন্য পুরাণ প্রাচীনতম বলিয়া পরিচিত। এই শূণ্য পুরাণ রামাই পণ্ডিতের রচিত। রামাই পণ্ডিত ময়ূর ভট্টের ও কাণুভট্টের সমসাময়িক কবি। তবে এই সকল গ্রন্থেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ক্ষয় ও ক্রমবিকৃতি সূচিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে যে পরবর্ত্তী যুগের পণ্ডিতগণ মাঝে মাঝে যথেচ্ছা কারুকার্য্য করিয়াছেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ভাষাতেই পাওয়া যায়। রামাই পণ্ডিত মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার রচনা স্থানে স্থানে অতি দুর্ব্বোধ্য। এইগুলিকে একাদশ শতাব্দীর বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এই বৌদ্ধ প্রভাবের সাহিত্যে ডাক ও খনার বচনকে এই সময়কার প্রথম রচনা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কেন না অন্য সকল গ্রন্থেই পরবর্ত্তী হিন্দু প্রভাবের ছায়া পড়িয়াছে অথবা বৌদ্ধ-প্রভাবের আংশিক লোপ সূচিত হইয়াছে, কিন্তু এগুলিতে তাহা হয় নাই। তবে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ ইহার বিরুদ্ধে যে দুইটী যুক্তি উপস্থিত করেন, তাহার উল্লেখ ও আলোচনা করিতেছি। প্রথম কথা ইহার ভাষা ও রচনা। কেহ কেহ মনে করেন, ইহার সরল সুন্দর ভাষা কখন ভাষার প্রথম যুগে বা প্রাচীন কালে রচিত হয় নাই। তাহার পূর্ব্বে আর কিছু ছিল। দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাষা ও ভাব দৃষ্টে এই সকল বচন বহু বৎসর ধরিয়া বহু ব্যক্তির দ্বারা রচিত বলিয়া বোধ হয়। প্রথম যুক্তি-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বৌদ্ধ সাহিত্যকে

পূর্ব্ববর্ত্তী ধরিলে এই বচনগুলিকে আদি রচনা বলিয়া গণ্য করিতে হয় না, দ্বিতীয় ভাষার সরলতা প্রাচীনতার বিরোধী নহে। সংস্কৃত রামায়ণ তাহার সুন্দর সাক্ষী। দ্বিতীয় যুক্তি আংশিকভাবে মানিয়া লইলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহার উৎপত্তি ও প্রচলন বৌদ্ধযুগেই হইয়াছিল। এইগুলি ব্যক্তি-বিশেষের কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। খনা উজ্জয়িনী-রাজ সভা পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার গৃহস্থালীর বচন রচনা করিতে আসিলেন কেন, তাহার সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না, তবে বাঙ্গালার অনেক রসাল কবিতার ভনিতায় "কহেন কবি কালিদাস"প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। হয়ত কালিদাসের সঙ্গে খনা কিছুদিন বাঙ্গালায় আসিয়া গৃহস্থালীর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ডাক গোয়ালা বলিয়া উল্লিখিত। এই গোয়ালাটী কোথায় জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন্ কুল পবিত্র করিয়াছিলেন, কেহ বলিতে পারে না। তবে ডাকার্ণব নামে একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে অনেক চলিত ভাষার গান আছে। হয়ত এই বচনগুলি সেই ডাকার্ণবেরই গ্রন্থকারের রচিত। সম্প্রতি এই ডাক ও খনার বচন-রচয়িতা-সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানিবার উপায় নাই। তাঁহাদের জীবন কাল, জন্ম-স্থান প্রভৃতি সমুদায়ই ঘোর অন্ধকারে আবৃত। এই সকল বচন দশম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সকল বচনে কবিত্ব বা ভাষার সৌন্দর্য্য নাই। এই সকল বচনে সাধারণের হিতজনক কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া সংসার, সমাজ ও গৃহস্থালীর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ঠাকুর-দেবতার দোহাই একেবারেই নাই। স্বর্গ, নরক, পরলোক ও পরকালের কথাও বিশেষভাবে নাই। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাবের সময় এইগুলি রচিত বলিয়া

অনুমান করিলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইবে। প্রাচীন সাহিত্যের বর্ত্তমান সংগৃহীত যাবতীয় রচনার মধ্যেই এই ডাক ও খনার বচনেই সরল বাঙ্গালা পাওয়া যায়। তবে ডাকের কোন কোন বচনের অর্থ পরিগ্রহ সহজসাধ্য নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নের বচন উল্লেখ করা গেল :—

বুন্দা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড।
আগল হৈলে নিবারিব তুণ্ড॥
আগহি বসতি আনহি গোয়ালি।
হেন বসতের কি বাউলি॥
ভাষা বোল পাতে লিখি।
বাটাহুব বোল পাড়ি সাখি॥
মধ্যস্থ যবে সমাধে ন্যায়।
বলে ডাক বড় দুখ পায়॥

ইহার পরে মাণিকচাঁদের নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই গানে পরবর্ত্তী অনেক লেখকের প্রক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গানে বৌদ্ধ প্রভাবের সঙ্গে তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট দেখা যায়। বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ম্লান হইয়া আসিতেছিল, তখন এদেশে বৌদ্ধগণ তান্ত্রিক সাধন-ভজন অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেব-দেবীর কথা ইহাতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাও পরে সংযোজিত হইয়াছে। এই গানে বাঙ্গালী-হৃদয়ের কোমলতা ও মধুরতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই গান দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে কিম্বা একাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া আপাততঃ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। গোবিন্দচন্দ্র রাজার গানও এই সময়েই রচিত। তবে মাণিকচাঁদের গান পূর্ব্ববর্ত্তী ও অপেক্ষাকৃত কম বিকৃত।

মাণিকচাঁদের গানেও পরবর্ত্তী যুগে দেব-দেবীর কথা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং কোন কোন অংশ পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্ত রচনা তাহা সহজে বোঝা যায়। রামনাম-মাহাত্ম্য যেখানে সংযোজিত হইয়াছে তাহার এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী রচনার ভাষার তুলনা করিলেই বোঝা যায়, যে, সেই অংশ কোন বৈষ্ণব লেখকের কারুকার্য্য। এই উভয় গানেই এক রকম বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে এবং উভয় গানের নায়ক রাজা গোপীচাঁদের ও রাজা গোবিন্দচন্দ্রের আর কিছু থাকুক বা না থাকুক বাঙ্গালীত্ব ষোল আনা বজায় আছে। উভয়েই যখন স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, সংসারের সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহাদের রাণীর বিলাপ-গীতির মধ্যে বাঙ্গালী-হৃদয়ের অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসা ও হৃদয়-ভরা আবেগ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যচর্চ্চার ফলে পরবর্ত্তী কালে এই দুইটী গান পরবর্ত্তী যুগের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও ভাষা ও ভাবে ইহা এই বৌদ্ধ যুগের বলিয়া চির দিন নির্দ্ধারিত ও বিচারিত হইবে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের শূন্য-বাদ ও নিরীশ্বর-বাদ এই গানের ভিতরে সুস্পষ্টরূপে প্রচারিত হইয়াছে। এই সকল গীতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব একেবারে নাই, কোথায়ও সংস্কৃত সাহিত্যের কোন ভাব বা উপমা দেখা যায় না। ইহাদের ধর্ম্ম-কথা ও উপদেশগুলি আদ্যোপান্ত বৌদ্ধভাব পূর্ণ। ইহাতে বৌদ্ধাচার্য্যগণ ও সিদ্ধ পুরুষগণ সম্মানিত হইয়াছেন। জাতি-নির্ব্বিশেষে জ্ঞানী-বৃন্দের বন্দনা করা হইয়াছে।

হাড়িপা ডোম-জাতীয় বৌদ্ধাচার্য্যকে রাজা গোবিন্দচন্দ্র গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। রাণী ময়না-মতীর কথা দুই গানেই পাওয়া যায়। গোবিন্দচন্দ্র রাজার গানে মাণিকচন্দ্র রাজার পুত্র বলিয়া গোবিন্দচন্দ্র উল্লিখিত হইয়াছেন। মাণিকচাঁদের গান অপেক্ষা গোবিন্দচন্দ্র রাজার

গান অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও আধুনিক। কেহ কেহ মনে করেন, গোবিন্দচন্দ্র রাজার গান পরবর্ত্তী যুগে আমূল সংস্কৃত ও নবভাবে রচিত হইয়াছে। দুর্ল্লভমল্লিক-নামক জনৈক কবি এই গান রচনা করেন। এখন যাহা পাইতেছি তাহার কতখানি দুর্ল্লভের রচনা আর কতখানি পরবর্ত্তী মহাত্মাদিগের তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে ভাষা পরিবর্ত্তিত হইলেও বৌদ্ধভাবটী সম্পূর্ণ অটুট আছে। মাণিকচন্দ্র রাজার গানের ভাষা দেখিয়া মনে হয় তখনকার বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্ব-পশ্চিমের ছাপ অত সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তখনকার গানের ভাষা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে একই ছিল। এ-বিষয়ে পরে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। এই গানের "মাও (মা), দিমু (দিব), পাও (পা), পোহামু (পোহাব), বাও (বা অর্থাৎ বাতাস), গাও (গা অর্থাৎ গাত্র), মাসি (মাসে), হাউস (সখ), পাতার (প্রান্তর), লমু (লইব)" প্রভৃতি শব্দ এখন পূর্ব্ব বঙ্গের নিজস্ব হইয়াছে।

মাণিকচাঁদের গানে

"না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর
কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দীর ঘর ॥
বান্দিলাম বাঙ্গালা ঘর নাই পাড় কালী।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরাণী ॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্গে ফেল্লাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন ॥

* * *

জীয়ব জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।
রাঁধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে ॥

পিপাসার কালে দিমু পানী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী॥
সীতল পাটী বিছাইয়া দিমু বালিসে হেলান পাও।
হাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও॥
হাতখানি দুঃখ পাইলে পাও খানি যাতিমু।
এ রঙ্গর কৌতুকর বেলা সুতি ভুঞ্জিমু এ সুতি ভুঞ্জাইমু॥
গ্রীষ্মকালে বদন ত দিমু দণ্ড পাখার বাও।
মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও॥

মাণিকচাঁদের গানের এই অংশের সহিত গোবিন্দচন্দ্র রাজার গানের নিম্নোদ্ধৃত অংশের বেশ সৌসাদৃশ্য আছে।

"তুমি যোগী হ'বে আমি হইব যোগিণী।
রান্ধিয়া বিদেশে যোগাইব অন্ন-পানি॥
বসিয়া থাকিহ তুমি বনের ভিতরে।
আনিব মাগিয়া ভিক্ষা আমি ঘরে ঘরে॥
নগরে নগরে ভ্রমি বসিবে যখন।
তৃষ্ণা হ'লে জল আনি কে দিবে তখন॥
বনে বনে কাঁটা ভাঙ্গি জ্বালিব আগুনি।
সুখেতে বঞ্চিব নিশি যোগীয়া যোগিনী॥
সর্ব্ব দুঃখ পাসরয়ে নারী যার পাশে।
আমারে করিয়া সঙ্গে চল দেশে॥

উদুনার বিলাপের বর্ণনার সহিত পরবর্ত্তী সাহিত্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণে সীতার রামের সহিত বন-যাত্রার বিবরণের সুন্দর সাদৃশ্য আছে।

স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জিয়ে মরণে সংহতি॥

প্রাণ নাথ কেন একা হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব সঙ্গে লও দাসী ॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবা নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবা যদি দাসী থাকে পাশে ॥
যদি বল সীতা বনে পাবে নানা দুখ।
শত দুঃখ ঘুচে যদি দেখি তব মুখ ॥
তোমার কারণে রোগ-শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি ॥

মাণিকচাঁদের গানে গোপীচাঁদ বন-গমনোদ্যতা স্ত্রীকে বাঘের ভয় দেখাইতেছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণে রাম সীতাকে রাক্ষসের ভয় দেখাইতেছেন। রাণী উদুনা ও সীতার উত্তর প্রায় একই রকম।

"কে কয় এগুলা কথা কে আর পইতায়।
পুরুষের সঙ্গে গেলে কি স্ত্রীকে বাঘে ধরে খায় ॥
খায় না কেন বনের বাঘ তাকে নাই ডর।
নিত কলঙ্কে মরণ হউক স্যামির পদতল ॥
তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাবু কোথা ॥

*　　*　　*　　*

এখন হইল রূপর নারী—তোরে যোগ্য মান।
মোকে ছাড়িয়া সন্নাস হবু মুই তেজিম পরাণ ॥

কৃত্তিবাসের সীতা—

"নিজ নারী রাখিতে যে ভয় করে মনে।
দেখ তারে বীর বলে কোন ধীর জনে ॥

তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে॥
তব সঙ্গে থাকি যদি লাগে ধূলি গায়।
অগুর চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়॥
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
অন্য স্বর্গ গৃহ নহে তার সমতুল॥
* * * *
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রী-বধ হইলে নহে পাপ বিমোচন॥

এই উদ্ধৃত বর্ণনায় একটীতে অন্যের ছায়া পড়িয়াছে। শূন্য পুরাণের কৃষকরূপী শিবের প্রতিরূপ পরবর্ত্তী শিবায়নে উজ্জ্বলরূপে দেখা যায়। এই সকল প্রাচীন সাহিত্যের গার্হস্থ্য চিত্র, দাম্পত্য প্রেম প্রভৃতি পরবর্ত্তী সাহিত্যে বিকশিত হইয়া অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছে। এই যুগের রচনায় যে-সকল অপ্রচলিত শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অনেকগুলি এখনও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে, সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে বলিয়া তাহা অপ্রচলিতের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। যথা: কৈতর (পায়রা) গাভুর (যুবক), ডাঙ্গ (কাটি), ডহর (নিম্ন ভূমি), পাড়ন (পাটাতন), বিহানে (প্রাতঃকালে), বেসাতি (বিক্রয়ের জিনিষ পত্র), বাউন (বেগুন), আছিল (ছিল), উকা (অগ্নি), কোনটী (কোথায়), মাও (মা), প্রভৃতি শব্দগুলি। আর কতকগুলি সেকালের ধান্য-বিশেষের নাম ছিল, এখন সে-সব ধান হয়ত নাই এবং থাকিলেও অন্য নামে পরিচিত হইয়াছে। যথা উড়াসালী, কনকচুর, কামদ, কানাকার্ত্তিক, খীরকম্বা, খেজুরছড়ি, গোতম পলাল, গোপালভোগ, ঝিঙ্গশাল, পর্ব্বতজিরা বারমতি, ভাদোলী, মহীপাল, সনাখড়কি, সালছাটি, সীতাসালী, হাতি-

পাঞ্জর, মৌকলস, লাউসানী লালকামিনী প্রভৃতি। এই সময়ে বানানের প্রতি কাহারও বিশেষ মনোযোগ ছিল না। এই বানান-বিভ্রাটেও অনেক শব্দ প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজী প্রাচীন সাহিত্যের (Anglo Saxon literature) যেমন টীকা ও ভূমিকাসহ বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা সম্ভব হইয়াছে, তেম্‌নি আমাদের এই যুগের সাহিত্যের উপযুক্ত টীকা-টিপ্পনী ভূমিকাসহ বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইলে যথাযোগ্য আলোচনা সম্ভব হইবে।

এই যুগের ইংরাজী সাহিত্যের যে সকল গ্রন্থাদি আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে আমাদের সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জিত হইবার কারণ নাই। Fox's Alfred's, Boethius ও Kemble's Bowulf ও Thorpe's Caedmon প্রভৃতি গ্রন্থে স্যাক্‌সন্‌ সাহিত্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে অলৌকিক বীভৎস ও অতি প্রাকৃত ও ভীষণের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা যায়, যাহা দেখিয়া Taine বলিয়াছেন, বর্ব্বর (Barbarian) ভিন্ন এই বর্ব্বরোচিত ঘৃণা, বিজাতীয় প্রতি-হিংসা, উচ্ছৃঙ্খল উপভোগ, এবং ভীষণ কলহ বিবাদের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে না। প্রাচীন ধর্ম্মের কাহিনী বর্ণনায় এবং নবীন খৃষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে স্যাক্‌সন্‌ লেখকগণ কেবল ভীষণ অতি প্রাকৃত ও অলৌকিকের সাহায্যে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছেন। এই যুগের সাহিত্যে (Human Element) মানবসুলভ ভাবমূলক কবিতা বা গান নাই বলিলেও চলে। Chronicles এবং Pagarn ও Christian songs গুলিতে ভীষণ অদ্ভুত ও অস্বাভাবিকের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। মানব-হৃদয়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে পারে এমন সামগ্রী নাই বলিলেও চলে। এই যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সভ্যতা

ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে গৌরবান্বিত হইবার ও আনন্দিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে যে ভাব ব্যঞ্জনা ও উচ্চ আদর্শ সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা অনেক দেশের প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। আবার তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে যে ধর্ম্মতত্ত্ব ও উচ্চ চিন্তার আভাস সূচিত হইয়াছে তাহাতে অদ্ভুত ও অস্বাভাবিকের সমাবেশ থাকিলেও এই সকল উচ্চ তত্ত্বসকল অলৌকিকের কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া অপূর্ব্বদীপ্তি বিস্তার করিতেছে। সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে যে গৃহস্থালী, অতিথি সেবা, পরিজন পরিচর্চ্চা প্রেমপূর্ণ-সেবাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা তখনকার সভ্যতার ও সামাজিক অবস্থার গৌরবসূচক পরিচয় প্রদান করে এবং এই সকল এখন কেন চিরকালই শ্লাঘার সহিত উল্লেখ করা চলিবে। তবে এই সময়ে জনসাধারণের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বগুলি দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিতেছিল এবং বিকৃতি ও রূপান্তর সাধারণের হৃদয় অধিকার করিতেছিল। সেই-জন্যই জনসাধারণের মন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ববস্তুতে রস গ্রহণ করিতে না পারিয়া বাহিরের ধর্ম্মপূজার মন্দিরে ও তন্ত্রমন্ত্রে ও জ্যোতিষের বচনে সান্ত্বনা ও আশ্বাস অনুসন্ধান করিতেছিল। তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাব তখনকার সাহিত্যে সুস্পষ্ট দেখা যায়। মাণিকচাঁদের গানে ও গোবিন্দচন্দ্র রাজার গানে দেবদেবীর বর্ণনা পরবর্ত্তী যোজনা, কিন্তু তন্ত্রমন্ত্রের কথা সেই সময়কার নিদর্শন। বৌদ্ধ প্রভাবের শেষ ভাগে যে জাতীয় অধঃপাতের সূচনা হইতেছিল তাহার ফল পরবর্ত্তী যুগে আমরা নানা বিভাগে ভোগ করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। এই সময়ের মন্ত্রপ্রভাবে ভক্তি এখন পর্য্যন্ত জাতীয় জীবনের অস্থি মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। ডাক ও খনার বচনে যে জ্যোতিষতত্ত্বের

কথা পাওয়া যায়—তাহা হইতে বেশ বোঝা যায়, তখন জাতীয় জীবন অসাড় হইয়া পড়িতেছিল, কর্ম্মকুশলতা, তৎপরতা, উদ্যমশীলতার পরিবর্ত্তে নানা বাহিরের লক্ষণের আনুকূল্য অনুসন্ধান করিতেছিল। এই সময়ে হাঁচি, টিকটিকি, কাক, চিল, শকুন বারবেলা, ত্র্যহস্পর্শ, শূন্য কলসী প্রভৃতি যে অধিকার লাভ করিল তাহার প্রাধান্য অদ্যাপি অক্ষুন্ন রহিয়াছে। এমন কি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজও হাঁচি, টিকটিকি, বার-বেলা, অদিন, অক্ষণকে তাড়াইতে পারে নাই। বরং বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্যে ইহারা দেশের শিক্ষিত সমাজে স্থায়ী গৌরবময় আসন লাভ করিয়াছে।

হিন্দু পুনরুত্থানযুগের সাহিত্য

দক্ষিণ ভারতে অষ্টম শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের ও ভারতীয় প্রতিভার গৌরবস্তম্ভ শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুত্থানে যখন দেশময় নূতন ভাবের ও নূতন চিন্তার আন্দোলন সূত্রপাত হইল, তখন এবং তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে ও পরে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রতিভাশালী ধর্ম্মসংস্কারকগণ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মমতের বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের ধর্ম্মমত আন্দোলিত করিয়া তুলিলেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশে সেই ধর্ম্মান্দোলন প্রবেশ করিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল এবং বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধপ্রভাব সাধারণের হৃদয়মন অধিকার করিয়াছিল। বাঙ্গালার রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া যখন দেশে হিন্দুধর্ম্মের ও

ব্রাহ্মণ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন তখন এবং তাহার বহুদিন পরেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত রূপান্তরই জনসাধারণের ধর্ম্ম ছিল। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সেন রাজবংশের পূর্ব্বে সম্ভব হইয়াছিল কি না বিশেষ সন্দেহ। পালরাজবংশীয়েরা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং পালবংশের রাজত্বকালেও বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে এই সময়েই হিন্দুধর্ম্ম পুনরুত্থানের প্রবল তরঙ্গ বাঙ্গালা দেশেও আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল এবং সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল। সেন রাজবংশই প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা দেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়েও বৌদ্ধধর্ম্ম রাজার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হওয়া ভিন্ন অন্য প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল বলিয়া সাহিত্যে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন ত্রয়োদশ শতাব্দীর সাহিত্যেও পাওয়া যায়। আর অহিংসা সেবা ও বিনয়ের ভাব বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে চিরস্থায়ীরূপে বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যে ও জাতীয় চরিত্রে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদ ও নাস্তিকতা যেমন জনসাধারণকে তৃপ্ত করিতে পারিতে ছিল না তেমনি শঙ্করের বেদান্তধর্ম্ম অদ্বৈতবাদ নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা ও স্বরূপে অবস্থানও সাধারণের হৃদয়মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে পারে নাই। সেই জন্যই বাঙ্গালা দেশে সাধারণের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। ব্রহ্ম সাধনা কি এবং সেই সাধনার উদ্দেশ্যই বা কি? শঙ্করের মতে আত্মবিষয়ক শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের অভ্যাসই ব্রহ্মসাধনা। সেই সাধনার উদ্দেশ্য আত্মার দর্শন বা সাক্ষাৎকার লাভ। উপাসনা অদ্বৈত ব্রহ্মাত্ম সাক্ষাৎকার লাভ। অদ্বৈত ব্রহ্মাত্ম সাক্ষাৎকার সাধারণের অধিগম্য নহে। আত্মানাত্ম বিবেকও জনসাধারণের আয়ত্ত নহে। শঙ্করের ধর্ম্ম জনসাধারণের বিবেকও

ধর্ম্ম কখনই হইতে পারে নাই। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই বেদান্ত ধর্ম্মকে বিবেকানন্দ যখন নূতন পরিচ্ছদে উপস্থিত করিলেন তখনও ইহার আনুষঙ্গিক সেবা ও সংযম ও প্রেম যত সহজে তাঁহার শিষ্যেরা গ্রহণ করিতে পারিলেন, ইহার তত্ত্বাঙ্গের সহিত তত ঘনিষ্ঠ যোগ অনেকেরই হইল না। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিবেকানন্দের মতের সৌন্দর্য্যে পণ্ডিতেরা ও শিক্ষিত লোকেরা সহজেই আকৃষ্ট হইলেন কিন্তু এই ধর্ম্মমতকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকেই পারিলেন না। সেবা ও বিশ্বপ্রেমের ভাব সহজেই পাশ্চাত্য নরনারীর হৃদয়মন অধিকার করিল কিন্তু মূলতত্ত্ব অন্তরে লাভ করা অনেকের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। এই বেদান্ত ধর্ম্ম অদ্বৈতবাদ কখনও কোন দেশের জনসাধারণের ধর্ম্ম হইতে পাবে কি না সন্দেহ। অদ্বৈতবাদ বাঙ্গালা দেশের জনসাধাণের মনোযোগ কখনও আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। নিত্য ক্রিয়াশীল সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ বিশিষ্ট লীলারসময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপেই জনসাধারণ ব্রহ্মকে পাইতে চায়। এই ভাবই বাঙ্গালার সাহিত্যে ও ধর্ম্ম চিন্তা ও ধর্ম্ম সাধনায় চিরদিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের পরম সৌভাগ্য যে, এই ভারতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম সাধনা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। মনুষ্যত্বকে সকল বন্ধন, সকল দীনতা হইতে মুক্ত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম আপন মহিমাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। মনুষ্যত্বের এমন গৌরবময় সিংহাসন আর কোনও ধর্ম্মমত দিতে পারে নাই। বেদান্ত ধর্ম্ম অদ্বৈতবাদ বিশ্বমানবকে আরও গৌরবোজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত করিয়া দিল। এই দুই ধর্ম্মমতই শিক্ষিত সাধারণের উপযোগী। জনসাধারণের সকল আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিয়া, সকল সাধনা সার্থক করিয়া, সকল বেদনা অশান্তি দূর করিয়া পরিপূর্ণ প্রেম ও আনন্দের থালী লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম উপস্থিত হইল।

এমন মধুর আশার বাণী জগতের আর কোন দেশে কোন ধর্ম্ম শুনাইতে পারে নাই। বাঙ্গালার বিশেষ সৌভাগ্য জগতের দুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালা দেশে অভ্যুদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্য সম্পদ গৌরবের অধিকারী না হইলেও বাঙ্গালা দেশ এই পরম গৌরব হইতে কখন বিচ্যুত হয় নাই। জগতের ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর জন্য শস্যশ্যামলা ফলফুলপূর্ণা বঙ্গভূমি যেমন অঞ্চল বিছাইয়া রাখিয়াছে তেমনি জগতের নর-নারীর আত্মার ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের জন্যও মধুর ধর্ম্ম সাধনার সঙ্কেত ও সকল অশান্তি অতৃপ্তি নিবারণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ দশায় বৌদ্ধধর্ম্ম যে আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা বিলুপ্ত হওয়াতে বাঙ্গালা দেশের কোন ক্ষতির কারণ হয় নাই। হীন যান, সহজ যান প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের নানা সম্প্রদায়ের যে সকল কদর্য্য মত ও সাধন প্রণালী বাঙ্গালা দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা হইতে বোঝা যায় জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ববস্তুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। এই সময়ে তন্ত্রমন্ত্র জ্যোতিষের বচন প্রভৃতিতে সাধারণের অচলা ভক্তি ছিল। শঙ্করের ধর্ম্মান্দোলন সমস্ত ভারতবর্ষের বিশেষভাবে সমস্ত বৌদ্ধ ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং সমস্ত দেশের অধ্যাত্ম চিন্তা ও সাধনাকে অনুরঞ্জিত করিল। কুমারিলের বৌদ্ধ বিজয় ও নিরীশ্বরবাদ এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা শঙ্করের কর্ম্মক্ষেত্রকে প্রস্তুত করিয়াছিল। বৌদ্ধদিগের কদাচার ক্ষমতাহীনতা ও সত্য সাধনার অভাবও বৌদ্ধ প্রভাবকে খর্ব্ব করিয়া আনিতেছিল। বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিল এবং কিভাবে সাধন করিয়াছিল তাহার যথার্থ ইতিহাস অদ্যাপি

সঙ্কলিত হয় নাই; তবে ইহা বেশ অনুমান করা যায় যে, যে যুগের কথা বলিতেছি সেই যুগে বৌদ্ধধর্ম্ম নানাভাবে বিকৃত হইয়া নানা আকৃতিতে বিরাজ করিতেছিল। শঙ্করের ধর্ম্মান্দোলন বাঙ্গালা দেশের চিন্তা ও প্রতিভাকে আন্দোলিত করিলেও বাঙ্গালার জনসাধারণের প্রাণকে তেমন করিয়া স্পর্শ করে নাই। এদেশের এই পুনরুত্থানের ব্যাপারের মধ্যে তেমন অকৃত্রিম অনুরাগ প্রগাঢ় ভাবোচ্ছ্বাস বা বিশেষ প্রেরণা বাঙ্গালা দেশে সঞ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, এইরূপ কোন বিশেষ নবভাবের অপূর্ব্ব উন্মাদনা ও প্রাণস্পর্শী প্রেরণা অনুভূত হইলে দেশের সর্ব্বত্র যেমন ভাববিপ্লবের ও নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়া যায় তেমনি সাহিত্যে তাহার স্থায়ী পদাঙ্ক চিরোজ্জ্বল হইয়া থাকে। এই যুগের সাহিত্য আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা সাহিত্য-নামের অযোগ্য এবং অতি যৎকিঞ্চিৎই পাওয়া গিয়াছে। মানুষ যখনই কোন নূতন ভাবোচ্ছ্বাসে পুরাতনকে পশ্চাতে ফেলিয়া নূতন আলোকের দিকে অগ্রসর হয় তখনই প্রভাতকালের বনবিহঙ্গের ন্যায় নানা ছন্দে, গীতে সেই ভাব-প্রেরণার সমাচার ঘোষণা করিতে থাকে। আমার মনে হয় বৌদ্ধযুগের শেষভাগে বাঙ্গালা দেশে যে সকল মত ও সম্প্রদায় প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বৌদ্ধ নামাঙ্কিত হইলেও তাহা বৌদ্ধধর্ম্ম মতের ছাঁচে ঢালা নহে এবং প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেও অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। আবার শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সাধারণের প্রাণস্পর্শ করে নাই। শঙ্করেব মতের শ্রেষ্ঠতা ও সৌন্দর্য্য অনুভব ও আয়ত্ত করিবার শক্তি তখন কেন এখনও অনেকের নাই। জনসাধারণের নিকট তখনও যেমন এখনও তেমনি দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে। সাধারণ মানুষ তত্ত্বের এই উচ্চ শিখরে (Giddy Height) দণ্ডায়মান

হইয়া ঘরকন্না করিতে পারে না বলিয়া, সচ্চিদানন্দকে নিখিল রসামৃত মূর্ত্তিরূপে লীলারসময় রূপে পাইতে চায়। বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের স্থানে কেমন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের বাঙ্গালা দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল তাহার বিস্তৃত ও ধারাবাহিক ইতিহাস অদ্যাপি রচিত হয় নাই। বাঙ্গালার রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনয়ন করিয়া এদেশে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ করিয়া দেন। কিন্তু এই আদিশূরের কাল-নির্ণয় ও বংশ-পরিচয় এখনও সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তবে তিনি অষ্টম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা নির্ণীত হইতেছে। সেই হইতে বরাবর হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাঙ্গালা দেশে হইয়াছিল কি না তাহা এখনও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে সেন রাজবংশকে বাঙ্গালার হিন্দুরাজবংশ বলা যাইতে পারে এবং ইঁহাদের সময়েই বিশেষভাবে হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছিল। বল্লাল সেনের সময় সমাজে যে সকল আচার, প্রথা, নিয়ম প্রচলিত হয় তাহা হইতে বোঝা যায়, তখন সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবাব জন্য ও আচার-গৌরব-প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছিল। প্রকৃত পক্ষে একাদশ শতাব্দীকে বাঙ্গালার হিন্দু-পুনরুত্থানের যুগ বলা যাইতে পারে। একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই যুগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই যুগের সাহিত্যের আলোচনা করিব।

এই একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে এ দেশে কেন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সাহিত্য সৃষ্টি অতি অকিঞ্চিৎকর। এই সময়টা কেন এমন হইল তাহা বলা যায় না। আবার পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাহিত্য অপূর্ব্ব সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে যাহা রচিত হইয়াছিল তাহাও হস্তগত হয় নাই এবং হইবার আশা নাই। কেন না মুসলমান-

গণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিবার সময় অন্য দেশের মুসলমান বিজয়ীগণের ন্যায় এই দেশের মন্দির গ্রন্থাদিও কিছু কিছু ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে সেই সময়কার সাহিত্য যাহার অধিকাংশই ধর্ম্মানুষ্ঠান-মূলক এবং পুরাণ বা পদ্ধতি নামে পরিচিত ছিল তাহাও যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয়ের সময় বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণের অত্যাচারে, ব্রাহ্মণের শাপের ভয়ে বিব্রত হইয়া মুসলমান বিজয় ও মুসলমানের অত্যাচারকে বিধির বিধান ও ব্রাহ্মণের অত্যাচারের প্রতিশোধ ভাবিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই অত্যাচার হইতে সদ্ধর্ম্মীরা (বৌদ্ধগণ) পরিত্রাণ পান নাই। মুসলমান বিজেতাগণ অনেক বৌদ্ধ-বিহার, গ্রন্থশালা ও মঠ ভস্মীভূত করিয়াছেন এবং বৌদ্ধদিগকে নির্ম্মূল করিয়াছেন। সেই অত্যাচারে বৌদ্ধগণ গ্রন্থাদি লইয়া নেপাল, তিব্বত ও বাঙ্গলাদেশের পার্ব্বত্য-প্রদেশে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। সেই সঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যও বাংলা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। শূণ্য পুরাণের যে অংশে এই নিরঞ্জনের রুষ্মা পাওয়া যায় সম্ভবতঃ সেই অংশ একাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এই অংশের রচনা পাঠ করিয়া আর একটী বিষয় সহজেই প্রতিভাত হয় যে যখন এই রচনা শূণ্য পুরাণে যোজিত হয়,তখন সদ্ধর্ম্মীরা অলেখ নিরঞ্জনকে স্বর্গের দেবতাদিগের অধিপতিরূপে দেখিতেছিলেন এবং নিজের ধর্ম্মেও তখন তেমন প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও বিশ্বাস ছিল না। ব্রাহ্মণের শাপের ভয়ে ও ব্রাহ্মণের মুখের আগুনের ভয়ে নিতান্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হিন্দু-দেবদেবীগুলির উপরও বেশ নির্ভর দেখা যায়। ইহা হইতে কতক অনুমান করা যায় ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত অবনত অবস্থায় আপন প্রাধান্য স্থাপনের জন্য সম্পূর্ণ সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

যাহা হউক এই অংশের কিঞ্চিৎ সাধারণের অবগতির জন্য উদ্ধার করিতেছি।

বেদ করে উচ্চারন, বেরায় অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সবাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান॥
এইরূপে দ্বিজগণ, করে সৃষ্টি সংহারন
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকণ্ঠে ডাকিয়া ধর্ম্ম, মনেতে পাইয়া মর্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার॥
ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথাএতে কালটুপি
হাতে সোভে ত্রিরুচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া একনাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেত দম্বেদার।
যতেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন,
আনন্দেতে পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ, বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর,
আদম্ফ হৈল শূলপাণি।
গনেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হৈল্যা যত মুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।

চন্দ্রসূর্য্য আদি দেবে, পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥
আপনি চণ্ডিকা দেবী তিহুঁ হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল্যা বিবি নূর ।
জতেক দেবতাগণ, হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল ।
ধরিয়া ধম্মের পায় রামাই পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥

দীনেশ বাবু বলেন এই রামাই পণ্ডিত একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। উপরের উদ্ধৃত অংশ পরবর্ত্তী প্রক্ষেপও হইতে পারে। তবে রামাই পণ্ডিতের অন্য রচনার সহিত ইহার বেশ সাদৃশ্য আছে। এই রমাই বা রামাই পণ্ডিতের আর একখানি গ্রন্থ আছে, তাহার নাম পদ্ধতি। ইহা ধর্ম্ম-পূজার পদ্ধতি লইয়া রচিত। তিনি ধর্ম্ম-পূজার একজন নামজাদা পাণ্ডা ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগের গোস্বামী প্রভুদিগের ন্যায় ধর্ম্ম-পূজক সম্প্রদায়ের সমাজে বেশ মান-সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ছিল। বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রামে রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এখনও ধর্ম্ম-ঠাকরের পৌরহিত্য করিতেছেন। অন্যান্য স্থানেও ইঁহার বংশধরগণ বিদ্যমান আছেন এবং তাঁহারা ধর্ম্ম ঠাকুরের সেবকরূপে বিশেষ সম্মানিত হইয়া থাকেন। বৌদ্ধ-যুগের সাহিত্য-পর্য্যায়েও এই শূন্যপুরাণের উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে বৌদ্ধ যুগের ভাব যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনি পুনরুত্থান-যুগেরও যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল সাহিত্য ভাবের হিসাবে

এক পর্য্যায়ে, ভাষার হিসাবে অন্য পর্য্যায়ে পড়ে, কাজেই উভয় পর্য্যায়ের সাহিত্যের কথা বলিতেই ইহাদের কথা বলিতে হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত ময়ুর ভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল ও এই শ্রেণী ভুক্ত। এই সময়ে ধর্ম্মমঙ্গল রচিত না হউক, হিন্দু ভাবের ছাঁচে ঢালা হইয়াছিল (recast in Hindu ideas) শূন্যপুরাণেরও কোন কোন অংশ এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। যেমন, যেখানে কৃষকবেশী শিবের বর্ণনা আছে এবং শিবের উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে সেই সকল রচনা নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং এইযুগে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কাণা হরিদত্ত-প্রণীত মনসার ভাসান দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা। কাণাহরিদত্ত ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী ছিলেন। এই মনসার ভাসান পাওয়া যায় না। বিজয়গুপ্তের মনসার গানে বা পদ্মাপুরাণে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হরিদত্তের একটী কবিতা দক্ষিণা বাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। দীনেশ বাবু তাঁহার পুস্তকে সেই কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই কবিতায় বিজয়গুপ্তের অভিযোগের সত্যতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন :—

হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥

হরিদত্তের কবিতায় "কথার সঙ্গতি" অথবা "যোড়া গাঁথা"র অভাব দেখা যায় না। মানিক দত্ত ও দ্বিজ জনার্দ্দনের মঙ্গল চণ্ডীর গান এই যুগের কবিতা। এই যুগের অন্যান্য খণ্ডকবিতা গান পাঁচালী

এখনও সংগৃহীত হয় নাই। ধ্বংসাবশেষ যাহা আছে তাহা হয়ত কোন অজ্ঞাত পল্লীতে কীটদষ্ট পুঁথিতে মুমূর্ষু অবস্থায় রহিয়াছে; কিছুদিন পরে তাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না। এই সময়ে নানা দেব দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া নানা গীত ও পাঁচালি রচিত হইয়াছিল,সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সকল পাঁচালিই পরবর্ত্তী যুগে সুমার্জ্জিত হইয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শিব, শীতলা, পদ্মা, মনসা, মঙ্গল চণ্ডীর গান ও পাঁচালি এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য। ইহারাই ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছে এবং হিন্দুধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছে। ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না যে, বৌদ্ধ-প্রভাবের তিরোভাবে যখন দেবতা-পূজার ও শাস্ত্র মাহাত্ম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছিল সেই সময়ে বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মহিমা-বর্ণনার জন্য এই সকল পাঁচালী ও গান রচিত হইয়া ছিল। শিব, শীতলা, চণ্ডী, মনসা, লক্ষ্মী, দক্ষিণরায়, সূর্য্য, গঙ্গা প্রভৃতির মধ্যে কাহার পূজা প্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। তবে শিবের গীতই সর্ব্বপ্রথম বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে কেন না শিবের উল্লেখ বৌদ্ধযুগের সাহিত্যেও দেখা যায় এবং “ধান ভান্‌তে শিবের গীত” এই প্রবাদ বাক্য হইতেও এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। এই “শিবের গীত” কোথায় গেল, অতীত বিস্মৃতির কোন অন্ধকার গুহায় লুক্কায়িত আছে অথবা চিরবিলুপ্ত হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? তবে ইহা সাধারণের প্রিয় ছিল এবং সর্ব্বদা গীত হইত ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়। পরবর্ত্তী যুগের শিবায়ন এই শিবের গীতের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। বৌদ্ধযুগের পরে শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুত্থানে যখন দেশময় বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ, অদ্বৈতবাদ-আকারে প্রকাশিত হইল, তখন তাহারই ফলে দেশব্যাপী এক নূতন চেষ্টা ও এক নূতন জাতীয় উত্থানের

সূচনা হইল। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা বা স্বরূপে অবস্থান যখন সাধারণ মানুষকে তৃপ্ত করিতে পারিতেছিল না, অথচ বৈষ্ণব-যুগের ভক্তির বন্যাও যখন প্রবাহিত হয় নাই—তখন মঙ্গল-চণ্ডী, মনসা, শিব, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবীগণের ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ, বিপদে সহায়তা বর্ণনা করিয়া এই যুগের পাঁচালী ভগবদ্‌শক্তির সচেষ্ট দয়ার ভাবে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিয়া জাতীয় জীবনকে নববল সম্পন্ন করিতেছিল এবং পরবর্ত্তী যুগের জন্য প্রস্তুত করিতেছিল। সম্ভবতঃ কুলজী গ্রন্থগুলির কোন কোন গ্রন্থ এই যুগে রচিত হইয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত যেসকল কুলজী গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচিত গ্রন্থ দেখা যায় না। দীনেশবাবুর পুস্তকে কুলজী গ্রন্থের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত কোন গ্রন্থের উল্লেখ নাই। রাজমালাও পঞ্চদশ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ত্রিপুরার রাজমালার মত অন্যান্য প্রদেশের রাজবংশেরও যদি ধারা-বাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গালার ইতিহাস-সঙ্কলন এত দুঃসাধ্য হইত না। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময়ে যে স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচার প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। আচার নিয়মের বাঁধাবাঁধি এই সময়েই প্রচলিত হয় এবং বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজেই ইহার প্রাদুর্ভাব বেশী। বৌদ্ধযুগের শেষে যে কদাচার ও ব্যভিচার সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার গতিরোধ করিবার জন্য বল্লালসেন আচারের প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। বল্লাল সেনের সময়ে সমাজকে শৃঙ্খলা-বন্ধনের রীতিমত চেষ্টা হয় সুতরাং সেই সময়ে অথবা অব্যবহিত পরে কোন কোন কুলজীগ্রন্থ রচিত হওয়া স্বাভাবিক। জাতি-তত্ত্ব বা কুল-গৌরবের বর্ণনা করিয়া কোন

কোন পুস্তক এই যুগে রচিত হইয়াছিল সিদ্ধান্ত করিলে অসঙ্গত হইবে না। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি এই যুগের অনেক গান পাঁচালী পরবর্ত্তী যুগের কবিযশঃপ্রার্থীগণ আত্মসাৎ করিয়া নূতন ভনিতা দিয়া চালাইয়াছেন, কেহ কেহ কিছু কিছু সংস্কৃত মার্জ্জিত করিয়া আত্মস্থ করিয়াছেন, আর অনেকগুলি হয়ত মুসলমান-বিজয়ের ব্যপদেশে বৌদ্ধ-গ্রন্থাদির সহিত ধ্বংস-কবলে নিপতিত হইয়াছে, আর কিছু হয় ত বঙ্গের সুদূর পল্লীতে জীর্ণ কীটদংষ্ট পুথিতে আবদ্ধ হইয়া উদ্ধারের প্রতীক্ষা করিতেছে। তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, হিন্দু-পুনরুত্থানের ভাব বাঙ্গালাদেশের জনসাধারণের প্রাণকে তেমন করিয়া স্পর্শ করিতে পারে নাই, যাহাতে স্বাভাবিক ভাবোচ্ছাসে সাহিত্যের ধারা উৎসারিত হইয়া উঠিতে পারে। বাঙ্গালাদেশের পুনরুত্থান যাগযজ্ঞাদির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য-স্থাপনে আরম্ভ হয়। কুমারিলের নিরীশ্বর-বাদ-মূলক যাগযজ্ঞাদির কর্ম্ম জিজ্ঞাসার বিরুদ্ধে যখন শঙ্করাচার্য্য শ্রুতি প্রতিপাদ্য অদ্বৈত জ্ঞানমূলক ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সময় ঘোষণা করিলেন তখন জনসাধারণ এই উচ্চ তত্ত্ব আয়ত্ত ও ধারণা করিতে পারিল না। কাজেই পুনরুত্থানের ভিতর দিয়া কোন নব প্রেরণা বা ভাবোন্মাদনা জাতীয় জীবনকে তেমন করিয়া স্পর্শ করিল না। সেই জন্যই বাঙ্গালাদেশে হিন্দু-পুনরুত্থান যুগে বৌদ্ধ মতের ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের কঙ্কালগুলি লইয়া দেবদেবী ও পূজাপদ্ধতি সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল এবং প্রাচীন মতের অনেকগুলিকে হিন্দু আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পে নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। বৌদ্ধ মতের অনেকগুলি চিরদিনের মত হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। কর্ম্মফল, মায়া, অনিত্যতা, অহিংসা মোক্ষ প্রভৃতি হিন্দু নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। মানুষের প্রাণে যাহা

চায় পুনরুত্থান তাহা সম্পূর্ণ দিতে পারে নাই। ক্ষুধিত তৃষিত পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত মানুষ যে আনন্দ অমৃত সান্ত্বনা আশ্রয় ও আশ্বাস চায়, কুমারিল বা তৎকালীন ধর্ম্ম সংস্কারকগণও তাহা দিতে পারেন নাই আবার শঙ্কর যাহা দিতে চাহিয়াছেন জনসাধারণ তাহা ধরিতে পারে নাই। জাতীয় জীবন যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল তখন এই দেব দেবীর পূজা প্রচার স্বাভাবিক হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে পুনরুত্থান এই বিবিধ দেব-দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠাতেই নিযুক্ত হইয়াছিল। এই সকল দেবদেবীর ছড়া পাঁচালী পূজা পদ্ধতি অদ্যাপি বাঙ্গালী গৃহের নিজস্ব সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে নানা কবির করস্পর্শে মার্জ্জিত হইয়া তাহাই বর্ত্তমান পাঁচালী প্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়াছে। এই সকল বর্ণনায় দেব-দেবীর যৎকিঞ্চিৎ পূজা প্রাপ্তির জন্য যে লোলুপতা দেখা যায় তাহা পাঠ করিয়া বেচারীদিগের জন্য মায়ার উদ্রেক হয়। কোন কোনও স্থলে এই পূজা প্রাপ্তির চেষ্টার মধ্যে দেবতাদিগের অতি হাস্যজনক দুর্ব্বলতা ও কল কৌশল প্রয়োগ দেখা যায়। এই সকল দেবদেবী সেই কারণেই বনের বাঘ, মাঠের সাপ, চৈত্রের শীতলা, প্রভৃতির মত উপদ্রবকারী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এখনও বাঙ্গালাদেশে শনিঠাকুর অজ্ঞাত অনির্দ্দিষ্ট অথচ অনিবার্য্য উপদ্রবের দেবতারূপেই পূজিত হইয়া থাকেন। দক্ষিণরায় অপেক্ষা মনসার প্রতিপত্তি অধিক। মনসা এখনও বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পূজিত হইয়া থাকেন। আবার বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বেশী বলিয়া মনসা-পূজার তিথি বর্ষাকালে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই মনসা মঙ্গলচণ্ডী শনি প্রভৃতির পূজা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে চির প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সকল বাঙ্গালীর ঘরেই ইহাদের সমান আদর।

এই সময়ে পঞ্চ গৌড়ের এক অংশের সহিত অন্য অংশের বিশেষ

যোগ ছিল, কাজেই এক অংশের ভাষার প্রণালী অন্য অংশে অবাধে প্রচলিত ছিল। এক অংশের চলিত ভাষা অন্য অংশেও প্রচলিত ছিল। অনেক শব্দ যাহা এখন পূর্ব্ববঙ্গের নিজস্ব হইয়াছে তাহা তখনকার সাহিত্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখা যায়। প্রাকৃত শব্দের প্রাধান্য দেখা যায়। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়—যেমন অসতী, উদাসিনী প্রভৃতি শব্দ স্ত্রী পুরুষ সকলের প্রতিই প্রযুক্ত হইত। এইরূপ আরও কিছু প্রয়োগ বৈচিত্র্য ও শব্দ বৈচিত্র্য দেখা যায় যাহা পূর্ব্ব অধ্যায়েও কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। এই পাচালীগুলি গীত হইত; রাগ রাগিণী যোগে গীত হইলে কেমন হয় বা হইত বলা যায় না, তবে অনেক গুলির ছন্দ অতি অদ্ভুত ও অনেক গুলির কোন ছন্দমিল নাই। প্রাচীন স্যাক্সন কবিতা আলোচনা করিয়া সাহিত্য বিশারদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন সেই সকল কবিতার First Syllable প্রথম বাক্যাংশে মিল ছিল; হয়ত এইগুলি ভাল করিয়া আলোচনা করিলে ইহাদিগের ছন্দ, যতি প্রভৃতি নির্ণয় করা সম্ভব হইবে। অনেক নাম প্রাকৃতমূলক ছিল যাহা এখন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের নাম সংস্কৃতের সংশ্রব রহিত ও নিতান্ত অকোমল ছিল। শব্দাড়ম্বর কোন রচনায় দেখা যায় না। পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যে সংস্কৃত চর্চ্চার ফলে সংস্কৃত শব্দের প্রচলন ও সংস্কৃতমূলক শব্দের প্রবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছিল। অনেক অপ্রচলিত শব্দ যাহা এখন কোন কোনও প্রদেশে অপ্রচলিত বলিয়া দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে বাঙ্গালার কোন কোন অংশে প্রচলিত আছে যথা আচাভুয়া (বোকা) উত্তর পূর্ব্ববঙ্গে, চোপা (মুখ) পশ্চিম বঙ্গে, পাকনা (পক্ক) পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন অংশে, সহিলা (সখিত্ব) পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন অংশে, ভোক (ক্ষুধা) পূর্ব্ববঙ্গে, অবস্থা (কষ্ট) উত্তর বঙ্গে, বুঢ়া বুড়া (দ্রব্যের

বিশেষণরূপে) পূর্ব্ববঙ্গে, সামাইল (প্রবেশ করিল) পূর্ব্ববঙ্গে, পিন্ধন (পরিধান) পূর্ব্ববঙ্গে, স্তসার (স্বচ্ছলতা) উত্তরবঙ্গে, লগে (সঙ্গে) পূর্ব্ববঙ্গে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। এই সকল বিষয় যত বিশদ্ আলোচনা হইবে তত আমরা প্রাচীন সাহিত্য ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেশের ইতিহাস ভাল করিয়া জানিতে পারিব। নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিতে না পারিলে আমরা প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে ও সাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে কখনই সক্ষম হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণব যুগের সাহিত্য

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব

মনসার ভাসান মঙ্গলচণ্ডীর গান শনির পাচালী প্রভৃতি যাহার সূচনা করিতেছিল কেবলমাত্র চণ্ডীকাব্য ও শিবসংকীর্ত্তনে তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা হইল না। এই গান, পাচালী রচনা ও ইহার পরবর্দ্ধন ও পরিমার্জ্জনেই যদি বঙ্গ সাহিত্য আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে ইহার পরবর্ত্তী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কখনই সম্ভব হইত না। অধঃপাতিত বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম যে সান্ত্বনা আশ্বাস আনন্দ দিতে পারে নাই হিন্দু-পুনরুত্থানও তাহা দিতে পারিল না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়া সকল জটিল প্রশ্নের সমাধান করিয়া নরনারীর আকুল প্রাণে আনন্দ অমৃতের সুধাধারা ঢালিয়া দিল, সান্ত্বনা ও আশ্বাসের সমাচার আনিয়া দিল। মানুষ স্বর্গের দেবতাকে, দূরের দেবতাকে, বহুতপযজ্ঞের দেবতাকে আপনার দ্বারে প্রেমভিখারীরূপে প্রিয়সখারূপে, ব্যথার ব্যথী-রূপে দেখিতে পাইয়া কৃতার্থ ও তৃপ্ত হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশ্বপ্রেমের প্রবলবন্যায় যেমন দেশের সকল সংস্কার সকল প্রথাকে বিধৌত করিয়া সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া মনুষ্যত্বকে মহিমামণ্ডিত করিয়া ফুটাইয়া তুলিল, বৈষ্ণবকবিগণও তেমনি প্রেমের মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়া অপূর্ব্ব প্রেম সাধনার সমাচার ঘোষণা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিলেন। বৈষ্ণব যুগে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইল

এবং ইহার দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। বৈষ্ণব সাহিত্য জাতীয় জীবনের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া যে সুমধুর গীতি রচনা করিল তাহা যেমন জাতীয় জীবনে বঙ্গীয় সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অপূর্ব্ব উন্মাদনা ও নব প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়া দিল, তেমনি প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যেও অপূর্ব্ব সুধাধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়া সাহিত্যকে প্রাণবান্ ও বলশালী করিয়া দিল। এই জাতীয় গৌরব বৈষ্ণব সাহিত্যে কি অপূর্ব্ব প্রেমের লীলা, স্বার্থের বিলোপ, স্বাধিকার লোপ, বাঞ্ছিতের জন্য প্রিয়ের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ কি পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের চিরমনোরম চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। সকলপ্রকার স্বার্থপরতা অহঙ্কারবর্জ্জিত প্রত্যাশাশূন্য পরিপূর্ণ আত্ম সমর্পণের চিত্র উজ্জ্বল আলোকে 'সোণার বরণে' ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুশিক্ষিত সুকণ্ঠ গায়কের কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে যেমন স্বরলহরীর ভিতর দিয়া অপূর্ব্ব আত্মবিস্মৃতির রাজ্যে লইয়া যায়, আমাদের এই গীতি কবিতাগুলি তেমনি সাধারণ প্রেমের নব রাগের ভিতর দিয়া ভগবদ্ প্রেমের স্বর্গ দ্বারে লইয়া উপস্থিত করে। এক ব্রাউনিং ভিন্ন অন্য কোন ইংরাজ কবির নায়ক নায়িকার প্রেমের কবিতায় এইরূপ আধ্যাত্মিকতা ফুটিয়া উঠে নাই। ইহার ব্যাখ্যা করা চলে না, ইহার স্বাদ গ্রহণ ভিন্ন অন্য বিচার চলে না। বিদেশী পণ্ডিত গ্রিয়ারসন বিমস কাউয়েল প্রভৃতি ইহার যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদন করিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিতে কি এই প্রৌঢ় বয়সে যতই এই বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিতেছি ততই ইহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ও মধুময় প্রেমোন্মাদের আকর্ষণে মুগ্ধ হইতেছি। জগতের কোন সাহিত্যে প্রেমের গীতি কবিতা এত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। শেলী ব্রাউনিং প্রভৃতির কবিতার সহিত তুলনা করিতে গেলে ভাষার সরসতায়, উপলব্ধির গভীরতায় প্রেমের অপূর্ব্ব-

লীলা বর্ণনে কোথায় কে কাহাকে পরাজয় করিয়াছে বলা কঠিন হইয়া পড়ে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কোন কোন কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার Literature of Bengal নামক গ্রন্থে চণ্ডীদাসের কবিতার যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, সে সমালোচনা তখন কেহ কেহ অতিশয়োক্তি মনে করিলেও এখন প্রকৃত সমালোচনা বলিয়া সকলেই মনে করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন ভাবের প্রগাঢ়তায় আবেগের পরিপূর্ণতায় প্রেমোন্মাদের প্রেরণায় আত্মসমর্পণের চরিতার্থতায় চণ্ডীদাস আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় কবি। ইংরাজী ভাষায় রচিত বা অনুবাদিত কোন কাব্যে ইহার অনুরূপ রচনা পাওয়া যায় না। একদিন আমার কোন সাহিত্যসেবী বন্ধু আমার সঙ্গে একমত হইয়া আগ্রহে বলিতেছিলেন পদাবলীর অনেক অংশ অনুবাদিত হইয়া ইউরোপে উপস্থিত হইলে নোবল প্রাইজ পাইতে পারে।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহার মর্ম্মকথা কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। কোন সাহিত্যের মর্ম্মকথার সহিত সুপরিচয় না থাকিলে সাহিত্যের প্রকৃত রস গ্রহণ করা যায় না। অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোক জর্জ্জ ইলিয়টের নভেলগুলির সৌন্দর্য্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। অনেকে এই গুলিকে বয়স্ক লোকের রবিবাসরিক নীতি বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় স্থান দিয়া থাকেন। আমার পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ইংরাজী সাহিত্য অধ্যাপনাকারী দুই একজন শিক্ষিত লোক জর্জ্জ ইলিয়েট ও মেরি করেলি অপেক্ষা ভিক্টোরিয়া ক্রসের গ্রন্থে অধিক সৌন্দর্য্য ও রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। আবার কোন এক কালেজের উচ্চ উপাধিধারী অধ্যাপকমণ্ডলী টলষ্টয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুইখানি গ্রন্থ (Resurrection

Anna Karenina) অতি অবজ্ঞার সহিত নাড়াচাড়া করিয়া শ্লীলতা বর্জ্জিত ও রসহীন বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। এই টলষ্টয়ের গ্রন্থাবলী অনেকের নিকট নিতান্ত সৌন্দর্য্য বিহীন ও অকারণ প্রশংসিত বলিয়া মনে হয়। তাহার একমাত্র কারণ, টলষ্টয়ের মানব জীবন সমাজ সংসার প্রভৃতি সম্বন্ধে যে ভাব ধারণা বা আদর্শ ছিল অর্থাৎ তাঁহার (Philosophy of Life and Religion) জীবন বিজ্ঞানের ও ধর্ম্ম তত্ত্বের ভাব পরিগ্রহ করিতে না পারিলে তাঁহার কোন গ্রন্থেরই প্রকৃত মর্ম্ম পাওয়া যায় না। প্রত্যেক লেখক, প্রত্যেক গ্রন্থকার, প্রত্যেক কবি মানবজীবন, সংসার, সমাজ-সম্বন্ধীয় একটা আদর্শ একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা অথবা একটা মহা ভাব আপন আপন রচনার ভিতর দিয়া পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন। সেই আদর্শ সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই সেই সেই লেখকের মর্ম্মবাণী। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় অনেক ইংরাজ অধ্যাপক রস পান না। তাঁহারা কিপলিংএর কবিতা যত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ তত আয়ত্ত করিতে পারেন না। লেখক বা কবির মর্ম্ম কথার সহিত পরিচিত হইয়া সাহিত্যে কাব্যে প্রবেশ করিতে হয়। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনার পূর্ব্বে ইহার অন্তর্নিহিত গূঢ় মর্ম্মবাণীর যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

পৃথিবীতে প্রতি মানবসমাজে এই প্রশ্নগুলি চিরদিনই মানব মনকে আন্দোলিত করিয়াছে এবং করিতেছে। এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য পাশ্চাত্যসমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি কত অসাধারণ চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সেখানকার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সে প্রশ্নগুলি এই—প্রতি মানবে মানবে জন্মগত এত পার্থক্য কেন? বুদ্ধি শক্তি বিষয়ে এত প্রভেদ কেন? আবার কেহ

বা জন্মাবধি সুখে সৌভাগ্যে লালিত পালিত হইবার সুযোগ পাইতেছে কেহ বা দারুণ দুঃখেও তনুরক্ষা করা প্রাণান্তদায় মনে করিতেছে। শুধু কি বাহিরের সুখ স্বচ্ছন্দতা সৌভাগ্য? কেহ জন্মাবধি প্রেমে পবিত্রতায় বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে, সর্ব্ববিধ অনুকূল অবস্থা তাহার জ্ঞান ধর্ম্ম ও আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষাকে সহায়তা করিতেছে, কেহ বা জন্মাবধি শুধু দুঃখ দৈন্য নহে, মিথ্যা অপবিত্রতা নিষ্ঠুরতার মধ্যে লালিত পালিত হইতেছে, মিথ্যা অন্যায় তাহার পক্ষে সহজ স্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে, জ্ঞানলাভ অসম্ভব হইতেছে; মহোচ্চ আত্মবোধের সম্ভাবনার উপর ক্ষুদ্র সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভের আশা লালসার পাষাণ চাপা পড়িতেছে। শুধু কি বাহিরের সুখ স্বচ্ছন্দতা সৌভাগ্যের অভাব! অন্তরের দৈন্য শক্তি সামর্থ্যের নিদারুণ বৈষম্য কেন? কেন এমন হয়? কেন এ বৈষম্য? কেন সৃষ্টিতে মানব সমাজে এ প্রাণান্তকর বিচিত্রতা? ইহার মীমাংসা করিবার জন্য জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সকল দর্শনবিজ্ঞান কত চেষ্টাই না করিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্মের ভিতর দিয়া এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে নাই বলিয়া জিজ্ঞাসু আর্ত্ত মানব মনের সকল সংশয় সকল দ্বিধাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। নানা ভাবে নানা আকারে এই সকল সমস্যা পাশ্চাত্য সমাজ বক্ষে নিদারুণ আঘাত করিয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দুর ধর্ম্মমত জন্মান্তর বাদ ও কর্ম্মফল বাদের দ্বারায় ইহার যে সাধারণ মীমাংসা আনিয়া দিয়াছে তাহাতে হিন্দু সাধারণ অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত ও শান্ত হইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া এই জন্মান্তরীন কর্ম্মফলবাদের পশ্চাতে যে ঐ আদিম প্রশ্ন, ঐ আদিম সংশয় লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা যে হিন্দু সাধারণের জিজ্ঞাসু মনকে কখন কখন পীড়ন করে নাই তাহা বলা যায় না। জন্মান্তর বাদ কেবল প্রশ্নটীকে দূরে লইয়া যায় কিন্তু

মীমাংসা আনিয়া দেয় না। সকল দেশের সকল ধর্ম্মই এই প্রশ্নগুলি কোন না কোন প্রকারে মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা তিন ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমে জ্ঞান মার্গ। একমাত্র পরম সত্য সকলের প্রাণ ও আশ্রয় হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে জানিয়াই মানুষ সকল ভয়-ভাবনার অতীত হয়। "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি", "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ", কিন্তু এ পথ ত সাধারণ পথ নহে, কাজেই এ অমৃতের সন্ধান সকলের পক্ষে সহজ সুলভ নহে। যে সাধনা দ্বারা এই দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, যাহাতে মানুষ বুঝিতে পারে—

"একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

সে সাধনায় অতি কম লোকেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। জ্ঞানের পথকে শাস্ত্রেও শাণিত ক্ষুর ধারের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কর্ম্মের পথ। বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান, যজ্ঞ, ব্রত-নিয়ম, দান, সেবা ইহারই অন্তর্ভুক্ত। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অনায়াসসাধ্য বলিয়া ভারতের হিন্দু-সাধারণ এই পথ স্বাভাবিক ভাবে ধরিয়াছে। শুধু হিন্দু-সাধারণ কেন খ্রীষ্টীয় জগতেও জনসাধারণ এই কর্ম্ম-কাণ্ডের সহিত যেমন সহজে সহানুভূতি করিতে পারে, তত্ত্বাঙ্গের ভিতরে তেমন আস্বাদনের বস্তু পায় না। কর্ম্মক্লান্ত মানুষ আদিম বৈষম্যের প্রশ্নের মীমাংসার ভার ভবিষ্যতের উপর দিয়াছে। জন্মান্তরবাদ যেমন সুদূর অতীতের অন্ধকারে এই জটিল প্রশ্নকে সরাইয়া দিয়াছে, কিন্তু মীমাংসা আনিয়া দিতে পারে নাই তেমনি কর্ম্মমার্গের তত্ত্ব, এই সনাতন প্রশ্নকে ভবিষ্যতের সমাধানের জন্য, ভাবী সামঞ্জস্যের জন্য, লোকান্তর অপেক্ষায় রাখিয়া দিয়াছে। সুতরাং বলিতে গেলে মানুষের প্রাণে যে তৃপ্তি চায়,

যে সরল মীমাংসা চায়, তাহা আনিয়া দিতে পারে নাই। জ্ঞানের পথ দিয়া শঙ্কর-দর্শন, শঙ্করের ধর্ম্ম-মত, গীতার ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ও বর্ত্তমান যুগে বিবেকানন্দের বেদান্ত ধর্ম্ম যে মীমাংসা আনিয়া দিয়াছে, তাহা জনসাধারণ গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই সকল ধর্ম্ম-মতের যে বহিরাঙ্গ তাহাই সাধারণের হৃদয়, মন অধিকার করিয়াছে; তত্ত্বাঙ্গের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হয় নাই। জ্ঞান ত মীমাংসা দিতে পারেই—তাহা মানিয়া লইতে সকলেই বাধ্য, কেন না সকল মীমাংসা, সকল দর্শন, সকল বিজ্ঞান, সকল অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান জ্ঞানের ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান যাহা দিতে পারে না, কেহই তাহা দিতে পারে না। কিন্তু সেই জ্ঞান-লাভ কর্ম্মানুষ্ঠানের মতন তোমার আমার সকলের পক্ষে সহজ নহে, তোমার-আমার সকলের জন্মগত অবস্থাগত প্রকৃতিগত পারিপার্শ্বিক অবস্থাগত এই জ্ঞান-লাভের পথে কত অন্তরায় রহিয়াছে, কত দুরতিক্রমণীয় বিঘ্ন রহিয়াছে। শৌচ-স্নান-নিয়মাদির মতন সেগুলি অতিক্রম করা যদি বাহিরের ব্যাপার হইত তাহা হইলে সকলের পক্ষে সহজ হইলেও হইতে পারিত। এই কারণেই জনসাধারণ জ্ঞানের পথ ধরিয়া সংশয়ের অপর পারে উপস্থিত হইতে পারে নাই—অমৃতের, আনন্দের সন্ধান লাভ করিতে পারে নাই। তৃতীয় পথ ভক্তির পথ। প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ভিতরে এই ভক্তির সুধাধারা সকল আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করিয়া, সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়া কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার সুন্দর ইতিহাস দিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নাই। তবু একটু ইঙ্গিত করিয়া আপনাদিগের নিকট সেই সাধনার মূলতত্ত্বটী উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

ভক্তির ধর্ম্ম, দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত, অভাব-আকাঙ্ক্ষায় উত্তপ্ত, রোগ-শোক-জর্জ্জরিত, নানা ব্যথায় ক্লিষ্ট, বিচিত্র বৈষম্যে অশান্ত, মানব

প্রাণের নিকট সান্ত্বনা ও আশার সমাচার লইয়া আসিল। বাহিরে যে মীমাংসা অন্বেষণ করিতেছিল এবং যে মীমাংসা মায়া-মৃগের মত দূরেই সরিয়া যাইতেছিল, সেই মীমাংসা ভক্তির ধর্ম্ম জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিল।

"এষাস্য পরমাগতি রেষাস্য পরমা সম্পৎ
এষোঽস্য পরমো লোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ॥"
"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধা নন্দী ভবতী।"

এই যে পরম সম্পদ পরমানন্দ ইহা জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না, ধনের অপেক্ষা রাখে না; কুলমানের অপেক্ষা রাখে না, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা রাখে না, সামাজিক হিসাবে যে ছোট, পতিত, সেও বঞ্চিত হয় না। এই আনন্দ দীন-হীনের জন্য, পতিত কাঙ্গালের জন্য, ব্যথিত শোকার্ত্তের জন্য, পীড়িত পদদলিতের জন্য, মূঢ়হীনের জন্য, সর্ব্ব সাধারণের জন্য সমানভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। ভক্তির ধর্ম্ম যখন এই শাশ্বত সত্যের সমাচার ঘোষণা করিল, তখন জন সাধারণের সমক্ষে উজ্জল আলোকে অপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ উদঘাটিত হইয়া গেল। বহুদিনের প্রাণের তৃষ্ণা মিটিয়া গেল। অশান্ত আকুলতা দূর হইয়া প্রাণ জুড়াইয়া গেল। মানুষ তখন স্বতঃই বলিয়া উঠিল, হায় হায় কিসের অনুসন্ধানে ছুটিতে ছিলাম। স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের ব্যতিক্রম, ধন সম্পদের বিপর্য্যয়, বুদ্ধিশক্তির বৈষম্য দেখিয়া কি অনর্থক প্রশ্নের পশ্চাতে ছুটিতে ছিলাম। সকল শূন্য পূর্ণ করে, সকল অবস্থাকে সার্থক করে, সকল অভাবকে পাদপীঠ করে যে পরম দেবতা আনন্দ অমৃতের থলি লইয়া আমার দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আহা এতদিন তাহা দেখি নাই। সকল দেখার সেরা দেখা যেটা, সেটাই চোখে পড়ে নাই বলিয়া মানুষ অবাক্ হইয়া যায়। পাশ্চাত্য জগতের ঋষি টলষ্টয়ের শেষ

জীবনে এই দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তিনি তাই সারাজীবনের ব্যর্থ আকুলতা, মানবজীবন ও সমাজ-তত্ত্বের জটিল রহস্য সমাধানে প্রাণপণ আগ্রহকে ধিক্কার দিয়া; এই আশার সমাচার ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ভক্তির ধর্ম্ম এমনি ক'রে মানব-প্রাণে সান্ত্বনা ও শান্তি আনিয়া দিয়াছে।

এই ভক্তির ধারা বহু প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক, সনাতনের ভিতর দিয়া এই ধারা অবতরণ করিয়া বৈষ্ণবযুগে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে, ভক্তি-সূত্রে ইহার যে বিমল আভাস পাওয়া যায়, তাহাই সহস্র ধারায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গভূমিকে ধন্য করিয়াছে। কি অপূর্ব্ব অমৃতের সন্ধান আনিয়া দিল যে আর কিছুই প্রার্থনীয় রহিল না। কোন অতৃপ্তি, কোন অশান্তিই রহিল না। দাসী-পুত্র নারদ বীণার তানে অপূর্ব্ব হরিগুণ গান করিয়াই তৃপ্ত হইল, স্বর্গঅর্থকামমোক্ষ কিছুই প্রার্থনা করিল না।

"সা তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা। অমৃত স্বরূপা চ। যল্লব্ধা পুমান সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি। যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচ্যতি ন দ্বেষ্টি॥ ন রম্যতে নোৎসাহী ভবতি। যজ্ জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবত্যাত্মারামো ভবতি।" এমনি করে ভক্তেরা চিরদিন কি আনন্দ অমৃতরসেই মগ্ন হইয়া থাকেন যে, তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় থাকে না, সব তুচ্ছ হইয়া যায়। রাজ-সিংহাসনও আর প্রার্থনীয় থাকে না, তাই ধ্রুব বলিলেন :—

স্বারাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যাম্মানো মে ভিক্ষিতোবত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারা নিবাধনঃ॥

যিনি স্বারাজ্য দিতে পারেন, মূঢ়তা-প্রযুক্ত আমি তাঁহার নিকট মান ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছি।

বিশ্বসংসারের কিছু দূরে থাকুক, স্বর্গেও কিছু প্রার্থনীয় রহিল না। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই ভাব অতি সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানাভাবে এই তত্ত্বকে বিকশিত করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য সংসার-তাপদগ্ধ নর-নারীর প্রাণে, শান্তির মলয় বাতাস প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। দ্বিতীয় তত্ত্ব, ভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারই স্বপ্রকাশেচ্ছা মানব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভক্তের আকুল আকাঙ্ক্ষা ও দিব্য রাগে পরিণত হইতেছে। তিনি নর-নারীর ভিতরে আপনাকে চির প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন, নরনারায়ণরূপে নিত্য বিরাজিত হইয়া রহিয়াছেন। মানুষের সেবা তিনি চাহিতেছেন, আবার স্বয়ং সেবা করিতেছেন; প্রেমের আদান-প্রদান নিত্য চলিতেছে, তাই ভক্ত কবি গাহিলেন :—

"তোমায় আমায় মিলন হ'বে বলে' আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হ'বে বলে' ফুল্ল শ্যামল ধরা॥
* * * *
তোমায় আমায় মিলন হ'বে বলে' যুগে যুগে বিশ্ব-ভুবন-তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে চির স্বয়ম্বরা॥"

আবার গাহিলেন,

"তুমি যে আমারে চাও আমি সে জানি
কেন যে মোরে কাঁদাও আমি সে জানি॥
এ আলোকে এ আঁধারে, কেন তুমি আপনারে
ছায়াখানি দিয়া ছাও আমি সে জানি॥
সারাদিন নানা কাজে, কেন তুমি নানা সাজে
কত সুরে ডাক দাও আমি সে জানি॥"

রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক ও মাধ্বাচার্য্য এই চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য ঈশ্বর ও জীবের এই সেব্য-সেবক ভাব প্রচার করেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মান্য-গ্রন্থ এবং ভক্তি-ধর্ম্মেরও অতি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে যাহা পরিস্ফুট হয় নাই অথবা যাহার কেবলমাত্র সূচনা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহারই পরিপূর্ণ বিকাশ। কিন্তু ভাগবতের মূলতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করেন নাই। ভক্তি-ধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় যে সেব্য-সেবক ভাব, আশ্রিত আশ্রয়দাতার ভাব, তাহাই অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাগবতের শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি পঞ্চরস এই ভাবাঙ্গেরই চরমোৎকর্ষ। ভাগবতেব শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব মধুরতা শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালা দেশে প্রকাশিত করিলেন। ইহার এই প্রচ্ছন্ন মধুর সৌন্দর্য্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরমোজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। জগতের চিন্তাও আকাঙ্ক্ষার বিশাল রাজ্যে, ধর্ম্ম ভাবের মহা প্রাঙ্গণে ও বিশ্বসাহিত্যে এক অভিনব প্রাণাভিরাম সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া অদ্ভুত বিপ্লব ও অপূর্ব্ব মীমাংসা আনিয়া দিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিলেন, জীব ব্রহ্মকে নিত্যানন্দ পরম সম্পদ বলিয়া নিত্য চাহিতেছে; কেবল তাহা নহে, ব্রহ্মও জীবকে চাহিতেছেন। এই মধুর লীলাভাসেই বৈষ্ণব কবিদিগের সকল গীতি কাব্য পরিপূর্ণ।

"চল চল যাব রাই দরশনে

শুনগো মরম সখি।

সে গোরী নাগরী কেমনে বিসরি,

শয়নে স্বপনে দেখি॥

মধুপুর যদি, থাকয়ে একেলা
সদাই ভাবি যে রাই।
নিশির স্বপনে, দেখিয়ে সঘনে
সদাই সে গুণ গাই॥
বসিতে রাধিকা, গাইতে রাধিকা
গুণেতে রাধিকা দেখি।
ভোজনে রাধিকা, গমনে রাধিকা
সদাই রাধিকা সাথী॥

* * * *

কহিবে রাধারে তাহার অন্তরে
সদাই আছি যে বাঁধা।
করে করি কর জপি নিরন্তর
এ দুই অক্ষর রাধা॥

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই গো কি আর বলিব।
যে পণ করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে কি সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥

হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহুঁ লহুঁ হাসে পহুঁ পিরীতির সার ॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পর সঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
ঘরের যতেক সবে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি ॥”

তৃতীয় তত্ত্ব তিনি যে মানবের বিশিষ্ট আত্মবোধের ভিতর দিয়াই আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন তাহা নহে, স্ত্রীরূপে, বন্ধুরূপে, পুত্ররূপে, কন্যারূপে, পিতারূপে তিনিই আমাদের প্রেম গ্রহণ করিতেছেন এবং আমাদিগকে প্রেম দিতেছেন। ভক্তেরা তাই গাহিয়া থাকেন—

“তোমার মধুর প্রীতি বহে শত ধারে।
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতি গৃহ পরিবারে ॥
প্রণয় কুসুম গন্ধে তব প্রেম মকরন্দে
মত্ত নর-নারী বৃন্দে আনন্দে বিহরে।
মাতার স্নেহ-চুম্বনে পিতার আলিঙ্গনে
নব দম্পতীর নব জীবন আধারে।
তুমি প্রেমময় হরি মধুর মূরতি ধরি
করিছ সঞ্চার প্রেম বিবিধ আকারে ॥”

আবার ভক্ত কবি গাইলেন—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।

দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ,
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ।
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।
চেতনা আমার কল্যাণ রস সরসে
শত দল সম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।"

আরণ্যক ঋষিগণ যেমন বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের চিন্তাই উপাসনা বলিয়া ঘোষণা করিলেন,তেম্নি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নর-লীলায় তাঁহার বিশেষ প্রেমের লীলা চলিতেছে এবং সমস্ত জনসমাজ প্রেমময়ের লীলাক্ষেত্র উপলব্ধি করিয়া সংসারের সমস্ত সম্বন্ধই ভগবানের প্রেম-লীলার অন্তর্ভূত ও পরম পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ইহারই আনুসঙ্গিক অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে আর একটী তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিল। জ্ঞানচক্ষু একটু উজ্জ্বল হইলেই, মানুষের কর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, কিন্তু ভক্তিই প্রকৃত স্বরূপ দেখাইতে পারে। মহাপ্রভুর নিত্যলীলাক্ষেত্রে মানুষ দাসরূপে সেবা করিতেছে। যে যাহা করিতেছে তাঁহারই সেবায় লাগিতেছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ম্মকে আরও মধুময় করিয়া তুলিলেন। কে বলে মহাপ্রভুর দাসত্ব ? কে বলে প্রভুর সেবা ? একি আমার দাসত্ব ? এ যে আমারই প্রিয়তমের সেবা। এযে আমার পথ-চেয়ে-থাকা আমার মুখের হাসি দেখ্তে ব্যাকুল সেই চিরবাঞ্ছিতের চিরসাথীর মিলনাভিসারের নিত্য চেষ্টা। সকল কর্ম্মের হীনতা চলিয়া গেল, সকল কর্ম্মের গুরুভার লাঘব হইয়া গেল। তুমি সুন্দর আসনে বসিয়া সুখে, স্বচ্ছন্দে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে করিতে যেমন অনুভব করিতে পার, আমার প্রিয়তমের সেবা করিতেছি, তেম্নি ঐ রাজপথ-পরিষ্কারক, দীন, অস্পৃশ্য সাধারণের ভৃত্য আপন কাজ করিতে করিতে

মহাভাবাবেশে অনায়াসে ভাবিতে পারে যে, এই রাজপথ বাহিয়া আমারই প্রিয়তম নানাবেশে নানারূপে নিত্য যাত্রা করেন, এযে আমারই প্রিয়তমের জন্য আয়োজন—আমারই প্রিয়তম এই সেবা লইবার জন্য, পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন, আমার সেবা না হইলে তাঁহার সকল যাত্রা, সকল শোভা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে—তাঁহার সকল আনন্দ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইতেছে। যখন কোন সহরে রাজা আসিতেছেন বলিয়া ঘোষণা পড়ে, তখন সহরের রাজপথের উভয় পার্শ্বে আবালবৃদ্ধ নর-নারী রাজ-দর্শন অভিলাষে সারি দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। যে দিক হইতে রাজার আসিবার কথা সেই দিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। কে কোথায় দাঁড়াইয়াছে তাহার খবরও রাখে না। কেহ হয় ত কোন সুসজ্জিত সুদৃশ্য সওদাগরের দোকানের সম্মুখে, কেহ বা অশ্বশালার সম্মুখে, কেহ বা কোন ধনীর সুরম্য প্রমোদ-ভবনের প্রাঙ্গণ-সম্মুখে, কেহ বা সরাইএর পাকশালার পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে। কাহার পায়ের কাছে কি রহিয়াছে—তাহারও কেহ সন্ধান রাখে না। ঘটনাক্রমে কেহ কোন ধনী-গৃহের পরিষ্কৃত দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছে, তাহার পায়ের কাছে হয়ত বাসি ফুলের তোড়া পড়িয়া রহিয়াছে, আবার ঘটনাক্রমে কেহ রাজপথের পুঞ্জীকৃত আবর্জ্জনা-স্তূপের নিকটে দাঁড়াইয়াছে, তাহার পায়ের কাছে ঐ রাজ-পথের আবর্জ্জনার অংশ পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ রাজপথের কঙ্করময় অংশে দাঁড়াইয়াছে, তাহার পায়ের কাছে কঠিন ইষ্টক-খণ্ড বা প্রস্তর-কণা পড়িয়া রহিয়াছে। আজ কেহই কিছু গ্রাহ্য করিতেছে না। রাজ-দর্শনে আসিয়া কেইবা আর এ সকল সাময়িক তুচ্ছ বৈষম্যের দিকে দৃষ্টি করিবে? লোক-কোলাহল ভেদ করিয়া সাড়া পড়িল

রাজা আসিতেছেন, অমনি সকলে সেই দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইল। আমার দীন বেশ, মলিন ছিন্ন বসন, তোমার বহু মূল্য বসন-ভূষণ, সুখ-ঐশ্বর্য্যের প্রভাব-ছটায় উজ্জ্বল কান্তি, আজ আর সে কথাও মনে পড়িতেছে না। রাজ-দর্শনের আনন্দে তোমারও প্রাণ পূর্ণ হইয়াছে আমারও প্রাণ পূর্ণ হইয়াছে। এ আনন্দ আজ সকলে সমানভাবে পাইতেছে। রাজার সুসজ্জিত রথ, হয়, হস্তী, পদাতিক নিকটবর্ত্তী হইল। রাজা তাঁহার রথ হইতে অবতরণ করিয়া এই দীন আমার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; আমার সকল সমাচার লইলেন, আমার কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে উৎসুক হইলেন; সকল হয়-হস্তী-সৈন্য-সামন্ত-অমাত্য পড়িয়া রহিল। তিনি আমার মলিন হাত ধরিয়া আমার কুটীরে আসিয়া আপনার জন হইয়া বসিলেন। এম্নি করিয়া তিনি জনে-জনে সম্ভাষণ করিয়া সকলের আপনার হইয়া সকলের প্রেম ভিক্ষা করিয়া সকলকে প্রেম দিয়া সকলের প্রেম গ্রহণ করিয়া চলিয়া-ছেন। কে আর মনে করিবে—তাহার দুঃখ-তাপ-ব্যথার কথা, তাহার অভাব-দৈন্য-লাঞ্ছনার কথা, আজ রাজা তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন; তাহার ব্যথা-অভাব-দৈন্যের স্বয়ং ভাগী হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তিনি আমার মলিন হাত ধরিয়া বলিলেন, তুমি না আসিলে তোমার-দেওয়া ঐ কদন্নের মুষ্টি না পাইলে আমার তৃপ্তি হয় না; আমার সকল যাত্রা, সকল সমারোহ অপূর্ণ রহিয়া যায় তোমায় ফেলিয়া গেলে। তুমিইত আমার আনন্দ-শোভা-সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ সফল সার্থক করিয়া দিতেছ—তোমাকে কি বাদ দেওয়া যায়। কি আনন্দ, কি আশায় প্রাণ ভরিয়া গেল। ওগো জগতের লোক! তোমরা আমার দুঃখ-দৈন্য-অভাব-দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়া করিলে কি হইবে? তোমরা আমায় উপেক্ষা করিলে কি আসে যায়?

ঐ যে জগতের রাজা যিনি, তিনি যে আমার আশায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; আমার

"দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই নাম্‌ল।
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই থাম্‌ল॥"

চিরকাঙ্গাল আমার অর্দ্ধেক আসনে বসিয়া আমার ঘরের "ক্ষুদকণা" খাইয়া তাঁহার কত আনন্দ, আমার বন-ফুলের মালা পরিয়া কত আনন্দ, আমার উচ্ছিষ্ট বন-ফল না পাইলে তাঁহার ক্ষুধা মিটে না। আমি না হইলে তাঁহার চলে না। তিনি আমার জন্য ব্যাকুল হইয়া চাহিয়া রহিয়াছেন,

"তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে
নিশি দিন অনিমিষে দেখ্‌চ মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মিল্‌ব যবে
তোমার ওই চেয়ে দেখা সফল হবে
এ আকাশ দিন গুনিছে তারি তরে॥
ফাগুনের কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি
আমার এই একটা কুঁড়ি রইলে বাকি।
সে দিনে ধন্য হ'বে তারার মালা
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা,
আমার এই আঁধার টুকু ঘুচলে পরে॥"

আমাকে পেয়ে আমাকে নিয়ে তিনি পূর্ণ, তিনি সার্থক। আমার জন্য তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, অপেক্ষা করিতেছেন, আমি না গেলে তিনি

কেঁদে ফেরেন, আমাকে নিয়েই তাঁর তৃপ্তি, তাঁর শাশ্বত আনন্দ; সব জগত জুড়ে আয়োজন করে, তিনি আমার জন্য চেয়ে রয়েছেন।

যে প্রিয়তমের সন্ধান পাইয়াছে, সুখ-স্পর্শ প্রাণে অনুভব করিয়াছে, তার কাছে বাহিরের অবস্থা, দুঃখ-দৈন্য, অমর্য্যাদা, রাজপথের ধূলিরাশি মাত্র। প্রিয়তম যে তাহাকে চাহিতেছেন, বাঁশীর সুরে তাহাকে ডাকিতেছেন, এই পরমানন্দেই, তাহার ছোটখাটো দুঃখদৈন্য একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে, অতি অকিঞ্চিৎকর হয়েছে, তাই কবি গাইলেন—

"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে, ফুট্‌বে গো ফুল ফুট্‌বে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে' উঠ্‌বে।
আমার লজ্জা যাবে যখন পাব দেবার মত ধন।
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে প্রাণের আরাধন।
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে, পরশ তারে কর্‌বে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দল গুলি সব চরণে তার লুটবে।

কবীরের ভাষায় বলি,

"মন্দির ঝরোখে রাবটী গুল চমন মেঁ রহতে সদা।
কহতে কবীর হৈঁ সহী হরদম মেঁ সাহির রমরহা॥"

যেখানেই থাকি প্রতি মুহূর্ত্তে স্বামী আমাতে আনন্দ ভোগ করিতেছেন। আহা কি মধুর সান্ত্বনাপূর্ণ সমাধানই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ আনিয়া দিলেন। সংসার-ক্লান্ত মানবের সকল ভার লাঘব হইয়া গেল—তাপিত তৃষিতের চিরপিপাসা প্রিয়তমের অমৃত-প্লাবনে মিটিয়া গেল।

চতুর্থ তত্ত্ব রসো বৈ সঃ; তিনি রসস্বরূপ তৃপ্তির হেতু। সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়া, সকল আনন্দের ভিতর দিয়া, সকল ভোগের ভিতর দিয়া তিনি আপনাকে রসস্বরূপরূপে প্রকাশিত করিতেছেন। সকল

উপভোগ সার্থক হইতেছে তাঁহার স্বরূপ উপভোগ করিয়া। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য মানসিক অতীন্দ্রিয় আত্মিক সকল প্রকার সম্ভোগের (Realisation) ভিতরে রস-স্বরূপকে উপলব্ধি করাই চরম সম্ভোগ। এই তত্ত্বের অনুশীলন ও পূর্ণ পরিণতি নানা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মূলতত্ত্ব অপেক্ষা বাহিরের বিষয় লইয়াই অনেকে চর্চ্চা করিয়াছেন। কাজেই নানাক্ষেত্রে নানা বিকার ব্যভিচারের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, রস ভিন্ন অনুরাগ হয় না, শুদ্ধ রসের সম্বন্ধেই কেবল অহেতুক সত্য অনুরাগ জাগিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ অনুরাগের জন্য শ্রেষ্ঠ রসাস্বাদন আবশ্যক। ভগবানেতে শ্রেষ্ঠ অনুরাগ অর্পণ করিতে হইলে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ রসের আশ্রয়রূপে ধরিতে হইবে, তাই হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে—

"আত্ম সুখ দুঃখ গোপী না করে বিচার!
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সব ব্যবহার ॥
কৃষ্ণ বিনা আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥
এই দেহ কৈঁনু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্ভোগ সাধন ॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ।

* * * * *

আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥

* * * * * *

গোপিকা জানেন কৃষ্ণ মনের বাঞ্ছিত !
প্রেম সেবা পরিপাটী ইষ্ট সমীহিত ॥

এই ভাবের অনুপ্রাণনায় বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি গাহিলেন,

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হ'কনা হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ
ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটী আঁখি তারা।

এই মত আশ্রয় করিয়াই পরবর্ত্তী যুগে নানা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। জয়দেব ইহার আদি কবি ও এই মধুর রস সাধনার প্রবর্ত্তক। বিদ্যাপতিও এই মতের সাধক, চণ্ডীদাস এই মতের শ্রেষ্ঠ সাধক ও কবি। চৈতন্য যুগের অনেক বৈষ্ণব মহাজন এই মতের ভক্ত সাধক। শ্রীচৈতন্য এই সমুদয় তত্ত্বকে একত্রিত গ্রথিত করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ভাষায় ও ভাবে ব্যক্ত করিলেন। পরবর্ত্তী যুগে তত্ত্ববস্তু প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতরে যে অমৃত রসধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাও সাধারণ লোকের অনধিগম্য হইয়া পড়িল।

এই সুমধুর তত্ত্ব কথা আমি কি বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে পারি ? ভাবুক ও সাধক কবি না হইলে এই নিগূঢ় তত্ত্ব কেহই আস্বাদন করিতে পারে না, কেহই ব্যাখ্যা করিতে পারে না। আমি কি বুঝিব, আর কি দিয়া প্রকাশ করিব ? বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিতে করিতে উষার অরুণালোক-ছটার মত এই

তত্ত্বের যে ক্ষীণ আভাস আমার প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহাতেই আমার প্রাণ পুলকিত মোহিত হইয়াছে। ইহার আভাস অনুভব করিয়া ঋষি টলষ্টয় শেষ বয়সে বলিয়াছিলেন, হায় হায়! এত দিন কিসের পশ্চাতে ছুটিয়া ছিলাম। সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক অধিকার লাভ, শিক্ষা বিস্তার, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বিনাশ, কারা-সংশোধন দণ্ডবিধির সংস্কার প্রভৃতি বিষয় লইয়া কি উন্মত্ত হইয়া ছিলাম, আর এই সকল বিষয়কে জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনার বিষয় ভাবিয়া সকলকেই ইহারই দিকে টানিতে চেষ্টা করিয়াছি; আগে যাহা সকলের আয়ত্ত, সকলের প্রাপ্য, সংসারের কোন বৈষম্য, কোন ক্ষমতা, কোন দৈন্য, কোন বিকৃতি যাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারে না, ঐ মুক্ত আকাশের আলো-বাতাসের মত, যাহা সংসারের সকলের জন্য পড়িয়া রহিয়াছে এবং যাহা পাইলেই মানুষের সকল পরিতৃপ্তি, সকল সার্থকতা, আগে এত দিন আমার চোখে পড়ে নাই, আমি ধরিতে পারি নাই; ওগো পৃথিবীর শ্রান্ত ক্লান্ত বৈষম্য-পীড়িত চির-ব্যথিত নর-নারী, এস এস আপনার সহজলভ্য নিশ্চিত প্রাপ্য ধনের অধিকারী হইয়া সংসারের সকল ব্যথা সকল জ্বালাকে তুচ্ছ করিতে সমর্থ ও শক্তিশালী হও, জীবন সার্থক ও ধন্য কর।

বিশ্বের সকল সাধনা তাঁহাকে পাওয়ার জন্য মানবের প্রাণে যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা, যে অতৃপ্ত পিপাসা রহিয়াছে তাহাই ফুটাইয়া তুলিতেছিল; সকল সাহিত্যে, শিল্পে এই ভাবের অনুপ্রাণনায় উচ্চতত্ত্বসকল ব্যাখ্যাত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। "সর্ব্বস্য:প্রভু মীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ" তাঁহাকে পাইলেই পরমানন্দ, পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও সার্থকতা এ কথা জগতের সকল ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিতেছিল; কিন্তু দীনহীন লাঞ্ছিত, প্রবৃত্তি-প্রকৃতি-পীড়িত দুর্ব্বল মানুষ আপন চেষ্টায় আপনার সাধনায় সে পথে চলিতে

পারিতেছিল না, পদে পদে আঘাত পাইয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল, মাথা তুলিবার ভরসা ছিল না। বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব সকল তত্ত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া সকল মুমূর্ষুকে সঞ্জীবিত করিয়া, নিরাশকে আশ্বস্ত করিয়া, ব্যথিত, পীড়িতকে শান্ত করিয়া ঘোষণা করিল, তিনি আমার জন্য নিত্য অপেক্ষা করিতেছেন, নিত্য আমাকে চাহিতেছেন; এখন আর তাঁহাকে পাওয়া আমার চাওয়ার উপরে নির্ভর করে না। যাঁর চাওয়া সারা বিশ্বভুবন অহরহ প্রতিক্ষণে পরিপূর্ণ করিতেছে—সেই তিনি আমাকে চা'ন, আমি না গেলে তার সব ব্যর্থ হ'য়ে যায়।

"ভেবেছিল চিরকাঙাল সে এই ভুবনে।
কাঙাল মরণে জীবনে,
ওগো মহারাজা বড় ভয়ে ভয়ে
দিন শেষে এল তোমার আলয়ে
আধেক আসনে তারে ডেকে ল'য়ে
নিজ মালা দিয়ে বরিলে।"

দিন শেষে না গেলেও সে আমার জন্য বসিয়া থাকে, ক্ষুদ্র আমাকে বাদ দিলেও যে সে পূর্ণ হয় না, কাজেই আমি না হ'লে চলে না।

"কত দিন যে তুমি আমায়
ডেকেছ নাম ধরে
কত জাগরণের বেলায়
কত ঘুমঘোরে।
পুলকে প্রাণ ছেয়ে সে দিন
উঠেছি গান গেয়ে
ছুটী আঁখি বেয়ে আমার
পড়েছে জল ঝরে'॥

দূর যে সেদিন আপন হতে
এসেছে মোর কাছে।
খুঁজি যারে সে দিন এসে
সেই আমারে যাচে।
পাশ দিয়ে যাই চলে, যারে
যাইনে কথা বলে
সেদিন তারে হঠাৎ যেন
দেখেছি চোখ ভরে।”

আহা কি আনন্দে কি সান্ত্বনায় মানুষের প্রাণ ভরিয়া গেল। এই প্রথম তত্ত্বের সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, ইহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাস রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া বিশ্বমানবের প্রাণ-মন আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। দ্বিতীয় তত্ত্ব সকল ভোগের ভিতরে যে তিনি রহিয়াছেন, সকল ইন্দ্রিয় বিক্ষোভের পশ্চাতেও যে অতীন্দ্রিয়ের সাড়া পাওয়া যায়, সকল উপলব্ধি, সকল অনুভূতি, সকল বোধ-বেদনা ও অনুপ্রাণনা তাঁহার দ্বারা পরিপূরিত ও তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত। এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশ করিবার কবি এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। কোন কোন স্থলে ব্রাউনিং ইহার আভাস অস্পষ্টরূপে পাইয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ যাহা আভাসে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টরূপে পাইয়াছেন, তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশ করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন।

খ। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব

রাধাকৃষ্ণ কবে কি ভাবে ভারতবর্ষের সাহিত্যে ও সাধনায় স্থান পাইল, তাহার যথাযোগ্য ঐতিহাসিক সমালোচনা এখনও উপস্থিত হয় নাই। অথচ রাধাকৃষ্ণ ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর পরম পূজনীয়,

ঈশ্বরের অবতার অথবা স্বয়ং ঈশ্বর। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ইহা অনেকে দৃঢ় বিশ্বাস করেন। বর্ত্তমান যুগে বঙ্কিমচন্দ্র সগর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, "আমি নিজে কৃষ্ণকে যে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করি—পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণামে আমার সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।" শিশির ঘোষও লিখিয়াছেন "কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—অবতার নহেন।" বঙ্গদেশের সাহিত্যে ও সাধনায় রাধাকৃষ্ণের যে প্রভাব, তাহা অবর্ণনীয়। রাধা-কৃষ্ণ বলিয়া অনেক বাঙ্গালী হিন্দু শয্যা ত্যাগ করেন, ক্লান্তি দূর করেন, কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, দূর যাত্রা করেন। আবার অন্তিমকালেও এই কৃষ্ণনাম শুনান হইয়া থাকে। সাহিত্য-চর্চ্চার ফলে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহাই অতি সঙ্কোচে নিবেদন করিব। বৈদিক যুগে, কি পৌরাণিক যুগে বা অনাদিকাল হইতে এই "কৃষ্ণ" নাম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল সে কথা আলোচনা করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করিবার মত সাধ্য আমার নাই, তবে বাঙ্গালাদেশে রাধাকৃষ্ণ বৈষ্ণব যুগের বহুপূর্ব্বে ছিল না একথা অনেকটা সাহস করিয়া বলা যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ পূজা যেমন ছিল, তেম্‌নি হয়ত কোথায়ও কৃষ্ণপূজা থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কিয়ৎ কাল পূর্ব্ব হইতে এবং তৎপরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবল অভ্যুদয়ের সময়েই রাধাকৃষ্ণ বাঙ্গালার সাহিত্যে চিরস্থায়ী স্বত্ব দখল করিয়া বসিল। আর এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাধনা ক্ষেত্রেই রাধা কৃষ্ণের পরিপূর্ণ প্রকাশ। এই রাধা কে, কৃষ্ণ কে? "রাধা ভাব", "রাধাপ্রেম" প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রের সাধন-সঙ্কেত বুঝিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। বাঙ্গালার সকল প্রেম-গীতি ঐ প্রেমে অনুপ্রাণিত, সকল প্রেমের কবিতা রাধাপ্রেমের ভাবে প্রভাবান্বিত। সমাজের নানাস্তরেও ইহার প্রভাব বড় কম নহে। "রাধা"ই বাঙ্গালীকে প্রেমিক ও

ভাবুক করিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিবার পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব কিছু বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। এই তত্ত্ব বৈষ্ণব ধর্ম্মের যেমন প্রাণ, বৈষ্ণব সাহিত্যেরও তেম্নি প্রাণের প্রাণ। মহাভারত বা গীতার কৃষ্ণ বৈষ্ণবের কৃষ্ণ নহেন, শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণও বাঙ্গালার বৈষ্ণবের কৃষ্ণ নহেন। এই সকল কৃষ্ণ হইতে বৈষ্ণবের কৃষ্ণের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" ইনি একথাও বলেন না, অথবা "সমোহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোঽস্তিন প্রিয়ঃ" একথাও বলেন না। ইনি পরলোকের পরিত্রাতা বা গোলোকের অধিপতি নহেন বা বৈকুণ্ঠের হরি নহেন। মানব-প্রাণের চিরদিনের পিপাসা, আকাঙ্ক্ষা, আশা ও সাধনা যাহা খুঁজিয়া মরিতেছিল, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকল রূপ-রস-সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ও তৃপ্তি, শান্তি ও চরিতার্থতার নিধানরূপে কৃষ্ণকে গ্রহণ করিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে অধ্যাত্ম জগতের পরম তত্ত্বের সহজ সুস্পষ্ট প্রকাশ। বৈষ্ণব সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। যে আমার সকল চাওয়া পূর্ণ করিতে পারে, আমার সকল আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইতে পারে, আমার সকল আদর্শকে আয়ত্ত করিতে পারে, আমার সকল অনুভব, সকল বেদনা, সকল আকুলতা, সকল পিপাসা মিটাইতে পারে, আমার দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-আত্মা আমার মনুষ্যত্বের সমুদায়কে যে পূর্ণ করিতে সার্থক করিতে পারে, বৈষ্ণবের মতে সেই কৃষ্ণ। আর ঐ মানব-প্রাণের অতৃপ্ত কামনা, অশান্ত বেদনা ও চির আকুলতার নিত্যস্বরূপ ঐ রাধা। বৈষ্ণবের কৃষ্ণ—"আমার পরাণ যাহা চায়—তুমি তাই, তুমি তাই গো।" মানুষ রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে সেই নিখিল রসামৃত মূর্ত্তিকেই খুঁজিতেছে; সেই চিরকিশোর, চিরসুন্দর নিত্যরসময়কে সন্ধান করে বলিয়াই যতক্ষণ সেই চিরবাঞ্ছিত প্রাণ-জুড়ানো পরম সুন্দরের সাড়া না

পায়, আপনার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়া ধরিতে না পারে, ততক্ষণ বিশ্বের সকল রূপ, রস, সম্ভোগের ভিতরে কি অপূর্ণতা, কি অতৃপ্তি রহিয়া যায়—কিছুতেই প্রাণের পিপাসা মিটে না; এই জন্যই ইন্দ্রিয় ভোগের ভিতরে, সম্পূর্ণ সম্ভোগের বিষয়ের মধ্যে মগ্ন হইয়াও মানুষ পরিতৃপ্ত, চরিতার্থ, শান্ত হইতে পারে না। এই জন্যই রূপ-রস-স্পর্শ-সুখের ভিতরেও মানুষের প্রাণ সেই পরম সুন্দরের সাড়া না পাইলে আরও কিছু চায়; কি যেন পাওয়া হইল না এই ভাব আর মিটে না। এই পাগল-করা অতৃপ্তি—এই কি যেন চাই অথচ পাই না—এই সেতু ধরিয়া বৈষ্ণব মহাজনগণ ইন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিয়ের, রূপ হইতে অরূপের অথবা বিশ্বরূপের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মলিন ধূলিময় আবর্জ্জনাময় বলিয়া এই রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শের ইন্দ্রিয়ানুভূতির, ইন্দ্রিয় সম্ভোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া শূন্যে সকল মায়া-মোহের উপরে নিরাপদ পথ রচনা করিলেন না, অথবা ধূলি-ময়লা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কিম্বা এ সকলকে দূর করিবার জন্য, কোন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিলেন না, কোন আচার, নিয়ম, শুচিতারও রক্ষা কবচ বাঁধিয়া দিলেন না। ঐ ধূলির পথ যে অদূরে দেবালয়ে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে; ঐ ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ অনুভূতি যে অতীন্দ্রিয়ের ভূমিতে লইয়া যাইতে পারে, ঐ ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ যে দেহাতীতের নিত্য সম্বন্ধকে চিরপ্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে না। একদিকে যেমন দেহ-ইন্দ্রিয়-গ্রাম ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ; অন্য দিকে তেমনি আত্মা, আত্মবস্তু আত্মার বিকাশেচ্ছা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও সাক্ষাৎকার। নিখিল বিশ্বের রস বস্তু এই উভয়ের মধ্যে সেতু হইয়া রহিয়াছে। বৈষ্ণব মহাজনেরা এই সার সত্যকে দৃঢ়রূপে ধরিতে পারিয়াছিলেন, তাই তঁাহাদের পদাবলীতে অমন শরীর ও আত্মার, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের, বিশ্বের

রূপের ও বিশ্বরূপের অমন অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রুতি যাহাকে "রসো বৈ স" বলিয়াছেন, বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বার্থসাধিকা, প্রেম ও আনন্দের পরিপূর্ণ বিষয় ও অবলম্বন। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যাহা চায় শ্রীরাধিকাতে তাহাই পরিপূর্ণরূপে পায়; আবার শ্রীরাধিকা যাহা চান, শ্রীকৃষ্ণতেই তাহা পরিপূর্ণরূপে পান।

"রাধার দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অচেতন॥"

জীবে ও পরমাত্মাতেও এই সম্বন্ধ। এই নিত্য সম্বন্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ রাধাকৃষ্ণের নিত্য বৃন্দাবন-লীলায় সূচিত ও প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আপনার জীবনে এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও বৃন্দাবন-লীলা প্রকট করিয়া তুলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ও পরবর্ত্তী মহাজনগণ এই সাধন-সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম সার্থক হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে" তিনি জনসাধারণের নিকট সত্যরূপে উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং এই তত্ত্বের আশ্রয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-সাধনের সহজ সঙ্কেত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের কৃষ্ণ-লীলার ভিতরে মানব-প্রাণের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা, আকুলতা ও মর্ম্ম-বেদনা ঝঙ্কৃত ও প্রকাশিত হইতেছে, তাই রাধার সকল কামনা, সকল আকুলতা, সকল বিরহ-বেদনার সহিত স্বাভাবিক ভাবে সহানুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠে। রাধার বেদনা যেন মানব-প্রাণের চিরন্তন মর্ম্ম-বেদনা।

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।

মোহন মুরলী রবে, শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ ॥
সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কান্থ অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না শুনে ধরম লব লেশ ॥
নাসিকা সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আর নাম।
নব নব গুণ গুণে বাঁধিল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম ॥

বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ বৈষ্ণব সাধনার সঙ্কেত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আপন জীবনে এই পরমতত্ত্ব এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বৈষ্ণব ভক্তগণ কৃষ্ণলীলার রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই রাধাকৃষ্ণ বাঙ্গালার বৈষ্ণবের নিজস্ব সামগ্রী। ভাগবতে, পুরাণে যাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট ছিল, শ্রীচৈতন্য সেই পৌরাণিক অনাদৃত তত্ত্ব-বস্তুকে পরমোজ্জ্বল ভক্তি-রসে অভিসিঞ্চিত করিয়া রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ "তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্" নহেন। ইনি "আয়াসঃ স্মরণে কোঽস্য স্মৃতো যচ্ছতি শোভনম্" তাই গোপীগণ বলিয়াছিলেন,

"কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃত বেণুগীত
সম্মোহিতার্য্য চরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম।
ত্রৈলোক্য সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজ দ্রুম মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥"

তুমি বেদ-পুরাণে যে ধর্ম্ম প্রচার করেছিলে, সে ধর্ম্মে তুমি এমন

আপন হইতে না, সে ধর্ম্মে তুমি দূরে দূরে থাকিতে। বেদ তোমাকে এত নিকটে এত আপন করিয়া দেখে নাই। তোমার বেণু-রব ত শুনে নাই। তুমি নিজে সম্মুখীন হইয়া এমন আকর্ষণ কর নাই। বৃন্দাবনে তোমার নূতন লীলা, নূতন পদ্ধতি। বৃন্দাবনের এই নিত্য লীলা বৈষ্ণবের সাধ্য শিরোমণি। তাই বৈষ্ণবের কৃষ্ণ নির্গুণ নির্ব্বিশেষ পরম তত্ত্ব নহেন, পরম পুরুষ চিরবাঞ্ছিত চিরপ্রিয়তম প্রাণ-জুড়ানো ধন,

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণিমণ্ডলং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চতে।
রমণনঃ স্তনেষর্পয়াধিহম্ ॥

সে কথা প্রকাশ করা যায় না—

সখিহে কি কহব নাহিক ওর।
স্বপন কি পরতেক, কহই না পারিয়ে
কি অতি নিকট কি দূর।

তিনি শুধু আমার সর্ব্বস্ব নন, আমিও তাঁর সর্ব্বস্ব। আমার প্রিয়তম নন, আমিও তাঁর পরম প্রিয় চিরবাঞ্ছিত। ইনি বাঁশীতে গাহেন,

রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি ॥
নিশি দিশি সদা বসি আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে ॥

তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুনহে কিশোরি চারিদিক হেরি
যেমতি চাতক পাখি ॥

ইনি গাহিতেছেন—

স্বজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে তড়িতলতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥

ইনি দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাও নহেন, সুখেষু বিগতস্পৃহও নহেন। ইনি রূপে, রসে, প্রেমে অতুলনীয়, পরম রমণীয়। ইনি প্রেমে গদগদ, ভাবে চল চল। সে প্রেমে যে পড়ে, সে বড় দুঃখেও সেই প্রেমের অগৌরব করে না। তাই বড় দুঃখেও রাধা বলিলেন,

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়া'ব কাহার কাছে ॥

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

এখানেই রাধাভাবের চরমোৎকর্ষ। তুমি ভিন্ন এ সংসারে আমার আপন বলিতে কেহ নাই, জুড়াইবার স্থান নাই, তাই শীতল বলিয়া তোমার চরণ-কমলে আশ্রয় লইলাম আর আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে' প্রাণ-মন এক করে' তোমারই দাসী হইলাম; জনমে-জনমে তুমিই আমার প্রাণনাথ হইও। এজনমে আমার মিলনের পথে যত বাধাই থাকুক, যত ব্যথাই পাই না কেন, 'চিরজনম ধরে' জীবনে-মরণে তুমি আমার প্রাণনাথ হইও।

"আশ্লিষ্য পাদরতাং পিনষ্টু মাম দর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো, মৎপ্রাণ নাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

তুমি যতই ব্যথা দাও, যতই পীড়ন কর, আর যাহাই কর না কেন তুমিই আমার প্রাণনাথ, তুমিই আমার পরম প্রিয়। আগে জীবাত্মা যখন এম্‌নি করে' আশ্রয় খুঁজে আকুল হ'য়ে সব সমর্পণ করে, পরম দেব-

তাকে চায়, তখন তিনি স্বরূপ প্রকাশ করে' আনন্দে মিলন-সুখ প্রদান করেন। সে মিলনে সকল দুঃখ-জ্বালা দূর হ'য়ে যায়, সকল আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তির নিবারণ হয়। সেই মিলনেই সকল অস্তিত্বের সকল বিশিষ্টতার চরম সার্থকতা।

এখান হইতে আমরা রাধাকৃষ্ণকে চিনিতে চেষ্টা করি। জীবের কত বন্ধন, কুলের বন্ধন, জাতির বন্ধন, মানের বন্ধন, সংসারের বন্ধন। এত সীমার রেখা টেনে কি সেই অসীমের অনন্তের সন্ধান মিলে? ভক্ত-হৃদয় রাধার মত রাজকন্যা হইয়াও সব সমর্পণ করিয়া নিশ্চিত দাসী হয়। সংসারের সুখ-সৌভাগ্য, আদর-যত্ন ক্ষণিক হ'ক আর ভঙ্গপ্রবণ হ'ক আমাদিগকে রাজকন্যার মত করে' ঘিরে রেখেছে। যার যা' আছে, তা' অন্যের সঙ্গে তুলনায় ছোট হ'লেই কি দূরে ফেলে আস্‌তে পারি? নিশ্চিত কেননা এক মন-প্রাণ হ'য়ে সে প্রেমের দাসখতে নাম না লিখাইলে পরমানন্দ স্বরূপ নন্দ-নন্দনকে পাওয়া যায় না। সকল দ্বিধা শূন্য হ'তে হবে, সকল ভেদ-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা ছাড়্‌তে হবে, তবেই না সে প্রেমের অধিকারী হওয়া যায়।

"কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥"

সমুদায় তাঁহাকে নিত্য অর্পণ করিতে হইবে, তবে তন্ময়তা লাভ হয়। নিত্য সম্বন্ধই পরিপূর্ণ প্রেমলীলার মূল। ভেদ-দ্বিধা, লোক-ধর্ম্ম সব ছাড়িয়া, স্বজন-পরিজন, সমাজ-ধর্ম্ম, বেদ-ধর্ম্ম, ইহলোক-পরলোক সব তুচ্ছ করিয়া, পশ্চাতে ফেলিয়া, তাঁহার কাছে না গেলে তাঁহার সেই পরম প্রেমের স্বাদ পাওয়া যায় না, তিনি আপনাকে বিলাইয়া দেন না। তাঁহাকে আপনার নিজ স্বরূপে একান্ত করে' পেতে হ'লে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব একান্তমনে সমর্পণ করিতে হইবে। এই

সংসারের কিছুতেই প্রাণের পিপাসা মিটে না। অথচ এই সংসারে সব সাধ-কামনা মিটাইতে যাওয়াই যেন মানব-ধর্ম্ম, মানুষের স্বাভাবিক সহজ ধর্ম্ম। তাই মিথ্যা মায়া এত সত্য হয়ে উঠেছে। এই আলেয়ার আলো, মায়ার খেলা, মোহের পুরী সংসার আমাদের কর্ত্তা স্বামী হ'য়ে রয়েছেন কিন্তু তিনি ক্লীব অর্থাৎ আমাদের চরম সার্থকতা দিতে পারেন না। সংসার-বুদ্ধি জটিলা আর লোকাচার কুটিলা। ইহারা চিরদিনই ভগবদ্‌প্রেমের বিরোধী। সংসার-ধর্ম্ম যেন মানবাত্মার স্বাভাবিক কর্ম্ম, জাতি-কুল-শীল সব রক্ষা পায় ঐ সংসার-সেবায়, আর এ সকলকে পশ্চাতে ফেলে পরমানন্দকে অনুসন্ধান করিতে গেলেই লোকে কলঙ্কিনী বলে। এ দিকে কিন্তু

বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥

সে প্রেমোল্লাসে মগ্ন হ'লে আর কি এ ঘর-সংসার ভাল লাগে। 'যত পাই তোমায় আরও তত যাচি, যত জানি তত জানিনে।' তখন আর কি কিছু ভাল লাগে। তার নামেই যে প্রাণ আকুল করে' দেয়, দরশনে না জানি কি হয়।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাশরিতে করি মনে, পাশরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায় ।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় ॥

এই ভাবোন্মাদের পরেই ভাব সম্মিলন। ভক্ত-হৃদয় এম্‌নি করে' তাঁহাকে চাহিয়েছে, আর যুগে-যুগে নব বৃন্দাবন রচনা করিতেছে। ইহাই বৃন্দাবন-লীলার প্রাণ। এই মহাভাব সম্মিলনের রাজ্যে অষ্ট-সাত্বিক মহাভাবই অষ্টসখী গোপীকাগণ। সখীরা না হইলে প্রিয় সম্মিলনে কে সহায়তা করিবে ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈষ্ণব সাহিত্যের কৃষ্ণ মহাভারতের কৃষ্ণ হইতে, গীতার কৃষ্ণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এখন অগ্রসর হইয়া বলিতেছি পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ ভাগবতের কেন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র পুরাণের রাধাকৃষ্ণ হইতেও সম্পূর্ণ পৃথক। ভাগবতে রাধা একেবারেই ফুটে নাই, অন্য গোপিকাদিগের পর্য্যায়ভুক্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও রাধা তেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। রাধা বৈষ্ণব সাহিত্যের অপূর্ব্ব উদ্ভাবন, মনোরম সৃষ্টি। ভাগবতে কৃষ্ণ যোগেশ্বর হৃষীকেশ পরমানন্দ গোপীহৃদয়-রঞ্জন আবার ব্রহ্মস্বরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কেশব আত্মারাম ; গোপীরা তাঁহার জন্য ব্যাকুল। তিনি গোপীদিগকে কৃপা করিতেছেন, তাহাদের আর্ত্তি দূর

করিতেছেন। পদাবলীতে কৃষ্ণও ব্যাকুল এই রাধার প্রেমের জন্য; কৃষ্ণও পাগল, কৃষ্ণের জন্য রাধাও পাগল। রাধা পঞ্চ বহিরীন্দ্রিয় ও পঞ্চ অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণকে পাইতে চাহিতেছেন, আবার কৃষ্ণও অস্থির।

সুন্দরি কাঁহে করসি তুঁহু খেদ।
তুয়া বিনা রাতি দিবস হাম না জানিয়ে
কোন কয়ল তুঁহু ভেদ॥
তুয়া মুখ চাঁদ, হেরি মঝু মানস
অহনিশি তঁহি রহি গেল।
নয়ন কমল পর, ভাঙ মদন ধনু
তাহে উমতি মতি ভেল॥
কোটী ধরণী তুয়া পায়ে নিরমঞ্ছিয়ে
তুঁহু মঝু জীবন রাই।
তোঁহারি নাম গুণ, অবিরত জপি হাম,
সদাই হৃদয় তুয়া চাই॥
এত কহি মাধব, ছল ছল লোচন
হৃদয় উপরে ধনী রাখি।
চরণ পরশি কহে হাম তুয়া অনুগত
প্রেমদাস তাহে সাখী॥

বৈষ্ণব সাহিত্য এখানে ভাগবতকে পরাজয় করিয়াছে, অথবা ভাগবতের তত্ত্বকস্তুকে প্রস্ফুটিত বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। ভক্তির ধর্ম্মের, প্রেমের ধর্ম্মের, কি অভিনব সুন্দর মনোরম অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে।

রাধা ত প্রেমোন্মাদিনী—

রাধার কি হ'লো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়ে বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দু'হাত তুলি॥
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী—
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাসে কয়, নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥

কৃষ্ণও ভুলিতে পারে না—

রাই তব রূপ-গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥

শয়নে স্বপনে জাগরণে রাধাকে ভুলিতে পারে না। রাধাকে লইয়াই যে কৃষ্ণ পূর্ণ, রাধাকে আশ্রয় করিয়াই কৃষ্ণ উজ্জলরূপে প্রকাশিত তাই—

রাধে ভিন না ভাবিও তুমি।
সব তেয়াগিয়া ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লইনু আমি ॥
শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত, করি এ মিনতি
সকলি করিবা ক্ষমা ॥

এখানে কৃষ্ণ রাধার জন্য পাগল। রাধার চরণ নূপুরধ্বনি শুনিতে উৎকণ্ঠ। কৃষ্ণ রাধাগত প্রাণ। অসীম অব্যক্ত অনন্ত তার রূপের রসের ডালি ভরিয়া লইয়া ব্যক্ত শান্ত সসীমকে ধরিতে আসিতেছে, পাইতে চাহিতেছে। তাই ত জগতের সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব খেলা, মনোরম লীলা চলিতেছে, রসে, রূপে, গন্ধে, লাবণ্যে তৃপ্তির আর শেষ নাই। মানুষের হৃদয় ধরতে এসে দেবতাও ধরা পড়িতেছেন। ব্যক্ত যদি অব্যক্তেরই প্রকাশ না হ'ত, অসীম ভূমা মহান যদি সসীম ক্ষুদ্রতেই পরিব্যক্ত না হইত, তাহ'লে যাহা কিছু আছে সবই নিশ্চল অপ্রকাশ হয়ে' থাকতো। এত দিন ভক্ত-হৃদয় ভগবানের জন্য লালায়িত তৃষিত ছিল, আজ সেই ভগবান্ প্রেমে গলে দয়া করে কৃতার্থ কর্ত্তে নয়—স্বয়ং কৃতার্থ হতে, মধুর আদান-প্রদানের জন্য স্বয়ং প্রেমভিখারী হয়ে' বিশ্বের সকলের দ্বারে উপস্থিত, তাই ভক্ত কবি গাহিতেছেন—

"তাই ত তুমি রাজার রাজা হ'য়ে
তবু, আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি।

তাই ত প্রভু যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।"

এখানেই বৈষ্ণব সাধনার বিশিষ্টতা, পদাবলী সাহিত্যের সকল মধুরতা সকল সরসতা সকল সৌন্দর্য্য প্রতিষ্ঠিত।

আর একটী কথা এই প্রসঙ্গে এখানেই উল্লেখ করিতে চাই। ভাগবতে রাসলীলা প্রভৃতি বর্ণনা করিতে করিতে শুকদেবকে পরীক্ষিতের প্রশ্নে উত্ত্যক্ত হইতে হইয়াছিল এবং সর্ব্বত্র নিগূঢ় তত্ত্ববস্তু পরিস্ফুট হয় নাই, অন্ততঃ সাধারণ বোধগম্য ভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম, পরস্পরের ভাববিলাস, রূপোল্লাস, রসোল্লাস, প্রেম বিচিত্রতায় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। কেমন অজ্ঞাতসারে এই নায়ক নায়িকার পূর্ব্বরাগ,স্বয়ং দৌত্য, প্রেম বৈচিত্র, অভিসার, অভিমান, রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ ধীরে ধীরে স্বর্গীয় ভাবসম্মিলনে মহাভাবে পরিণত হইয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই আকুলকরা, প্রাণভরা প্রেমের গীতিঝঙ্কারের মধ্যে মানবের চিরন্তন বিশিষ্টআত্মবোধের (Individual Self-consciousness) চরম সার্থকতা রহিয়াছে বলিয়াই এই মধুর পদাবলী বাঙ্গালীর মন-প্রাণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে ও বৈষ্ণবধর্ম্ম-সাধনার ভিতরে উপাসনাতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

"দুহুঁ মুখদরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস॥"

আমার প্রাণের পিপাসা যেমন তোমাকে না পাইলে মিটে না তেম্নি তোমারও আমি না হইলে চলে না। বৈষ্ণবধর্ম্ম এই মূল-তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। নানা সম্প্রদায় নানাভাবে সেই পরমানন্দস্বরূপ নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি নন্দনন্দনকে প্রেমময় প্রাণেশ্বররূপে গ্রহণ করিয়া নানাভাবে ভজনা করিয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম সেই পরম সুন্দর চিরকিশোর, নিত্য নূতন রসস্বরূপ তৃপ্তি হেতুকে প্রেমে পাগল "অনুখণ তত্থিক সমাধি" চিরব্যাকুলরূপে ভজনা করিয়াছে এবং এই মহাভাবই তাপিত, তৃষিত, দুর্ব্বল নর-নারীকে ভক্তিপ্রেমের সুধা-ধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া চির আশ্বস্ত, চিরশান্ত ও চিরতৃপ্ত করিয়াছে।

ইন্দ্রিয়ভোগ, দেহের সুখ মানুষকে চিরদিন পাগল করিয়াছে। এই সকল চিত্তবিক্ষেপকারী ভোগের বিষয় হইতে দূরে থাকিবার জন্য সকল শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছে আবার ভোগের ভিতর দিয়া নিবৃত্তি অনুসন্ধান করিবারও উপদেশ কোন কোন শাস্ত্রে দেখা যায়, কিন্তু ইহার কোন পথই সাধারণ মানুষের জন্য প্রশস্ত নহে। এই দেহ-সম্বন্ধ বা ইন্দ্রিয়ভোগের ভিতরে একটা বিশেষত্ব আছে, এমন কিছু আছে যাহাকে উড়াইয়া দেওয়াও চলে না, আবার ধরিয়া রাখিলেও প্রাণ জুড়ায় না। শরীর ধর্ম্মসুলভ ইন্দ্রিয়-বিকার বলিয়া তুচ্ছ করিলেও চলে না, আবার ইহারই পশ্চাতে যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাড়া পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে জন্মিয়াও যে এই রসবস্তু অতীন্দ্রিয়-রাজ্যে লইয়া যায় এবং দেহ এবং দেহাতীতের মধ্যে ইন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে সেতু হইয়া রহিয়াছে তাহাও অস্বীকার করা চলে না। এই কথা বুঝিয়াই বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সকল ভোগ, বাসনা, কামনা, লালসা "শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" বলে নিবেদন করে দিল।

অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ শ্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।
অতোময়ি রতিং কুর্য্যাৎ দেহাদির্যৎ কৃতে প্রিয়ঃ॥

আমি সকল আত্মার আত্মা সুতরাং প্রিয় হইতেও প্রিয়তম আমাকেই প্রেম করিবে কেন না দেহাদি সকলই আমার জন্য প্রিয়। ভাগবতের এই শ্লোকের ভিতর বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটী অপূর্ব্ব তত্ত্ব নিহিত হইয়া রহিয়াছে। তাই চরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়—

"আত্ম সুখ-দুঃখ গোপী না করে বিচার।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ বিনা আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেঁহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈনু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্ভোগ সাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥

তিনি আমাদের নিকট নিয়ত সাক্ষাৎ বিদ্যমান এবং এ বিশ্বের সমুদায় তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত ও পরিপূর্ণ। ভক্ত সর্ব্বদা দেহাদিতে তাঁহারই প্রেরণা অনুভব করেন, মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার বিচ্ছেদ তাঁহার ক্রিয়ার বিরতি দেখেন না। সকল ভোগের ভিতরে তিনি রহিয়াছেন, সকল ভোগের বিষয় তিনি যোগাইতেছেন এবং সমুদায় বস্তুতেই তিনি প্রকাশিত হইতেছেন। ভোগের জন্য যাহা কিছু আসিতেছে তাহাতে প্রতিক্ষণ তাঁহারই প্রেম অনুভূত হইয়া আনন্দ উচ্ছ্সিত হইয়া উঠে। ভক্তের চিত্ত সাক্ষাৎসম্বন্ধবিশিষ্ট ভগবানে নিয়ত নিবদ্ধ থাকাতে কোন

বিষয়ের আসক্তি ভক্তকে দূরে লইতে পারে না। সকল ভোগ, সকল বিষয়, সকল সম্বন্ধ সেই রসস্বরূপের সহিত মিলিত করিয়া দিতেছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের এই তত্ত্ব পৃথিবীতে প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মের তত্ত্ব হইতে বিশিষ্ট এবং অতি অপূর্ব্ব। দুঃখী, তাপী নরনারীর জন্য কি সান্ত্বনা, কি আশ্বাসবাণীই ইহাতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সাধারণ সম্বন্ধ নহে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিশেষ সম্বন্ধ!

"আমার মিলন লাগি তুমি আস্‌ছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায় রাখ্‌বে কোথায় ঢেকে।
কত কালের সকাল সাঁঝে, তোমার চরণ-ধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে, গেছে আমায় ডেকে।"

আবার এই দেহাদি সকলই তাঁহার জন্য প্রিয়। কৃষ্ণ বিলাসের দেহ বলিয়া রাধা সখীগণকে দেহ রক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন

"আমার এই দেহখানি তুলে ধর
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর।"

বৈষ্ণব কবিরা দেহকে কৃষ্ণ বিলাসের দেহ বলিয়া আরও গৌরব বাড়াইয়া দিয়াছেন।

• রাধিকার মুরলী শিক্ষা-নামক পদগুলিতে এইরূপ বর্ণনা আছে, রাধা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী লইয়া বাজাইতে শিখিতেছেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে কৃষ্ণের সুখস্পর্শ অনুভব করিতেছেন। দুরন্ত বাঁশী রাধা রাধাই বাজিয়া উঠিতেছে। ভক্ত তাঁহার দেহ-বীণাখানির দশেন্দ্রিয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভগবানের সুখস্পর্শই অনুভব করেন, প্রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে তাঁহারই চুম্বন-লেখা অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আমার দর্শন, শ্রবণ,

মনন সেই প্রিয়তমের চুম্বন-স্পর্শে সম্ভব সফল ও সার্থক হইতেছে। ভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথ তাই গাহিলেন

বাজাও আমারে বাজাও
বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষা ভোলা গীতে
শিশুর নবীন জীবন বাঁশীতে,
জননীর মুখ তাকানো হাসিতে
সেই সুরে মোরে বাজাও।

এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের ভিতরে যদি মানব-প্রাণের চির আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ অমৃতের সন্ধান না থাকিত তবে সাধারণ চক্ষে যাহা নিতান্ত গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট, সাধারণ ও দোষণীয় তাহা এমন করে এত যুগযুগান্ত ধরে' ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারীর হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিতে পারিত না। পদাবলী সাহিত্যে তাই রাধাকৃষ্ণ-লীলার কোন কৈফিয়ৎ নাই বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও নাই অথবা রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ইহারও বর্ণনা নাই। রাধা রাধা আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিলেই যেন সব বলা হইল। বিশ্বের কামনা সাধনা এবং সাধনার ধন প্রাণজুড়ানো নিত্যানন্দ রসামৃতস্বরূপ লইয়া বৈষ্ণবের রাধা ও কৃষ্ণ। গোপীভাব আর রাধাভাব বৈষ্ণব সাধনার সাংকেতিক বাক্য। এ বিষয়ে পরে পৃথকভাবে আলোচনা করিব। গোপী ভাব বিলাস ভাগবতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু সেখানকার ভাব বিলাসে গোপীর প্রেম সর্ব্বস্বসমর্পণ আর কৃষ্ণের করুণা। কিন্তু প্রেমময় কৃষ্ণ ও প্রেমময়ী রাধা বৈষ্ণব সাহিত্যের নিজস্ব সামগ্রী। আর এই রাধা-তত্ত্বের ভিতরে বৈষ্ণব সাধনার মূল তত্ত্ব বৈষ্ণব ভক্তের

চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা নিহিত হইয়া রহিয়াছে। বৈষ্ণব ভক্তেরা গোপীভাব লাভ করা জীবনের আদর্শ বলিয়া মনে করেন। কেননা রাধাভাব মহাভাব সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। রাধাপ্রেমের মাধুরী অনুভব করিয়াই শ্রীচৈতন্য রাধা রাধা বলিয়া অস্থির হইয়া পড়িতেন। আহা এমন করে' প্রাণের ভিতরে অনুপ্রাণনা অনুভব না করিলে কি সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা যায়?

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান গদিতুং
নৃশংসং সত্যং কুরুহ্ব নিগমং তব পাদমূলং।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসীদাম পদাবসৃষ্টং কেশৈ
নির্বোঢ়ুমভিলষ্য সমস্ত বন্ধূন॥

তোমার চরণতলের তুলসী দাম মস্তকে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইবার জন্য সমুদয় বন্ধুবান্ধব বিবর্জ্জন করিয়া তোমার চরণতলে উপস্থিত হইয়াছি। আহা জীবন-যমুনাতীরে যখন বাঁশরীর রব শোনা যায়, তখন কি আর মানুষ স্থির থাকিতে পারে? কুলমান, লাজভয় দশের কথা কি আর মনে পড়ে? মানুষ বিশিষ্ট আত্মবোধের চরম সার্থকতা উপলব্ধির সঙ্কেত পায় বলিয়া বাঁশরীর রবে ঘরের বাহিরে দশের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। শ্যামের বাঁশী এখনও নীরব হয় নাই, বাঁশীর সুরে এখনও যখন ডাক পড়ে, মানুষ পাগল হইয়া চিরদিনের চলা পথ ছাড়িয়া, কুলের, মানের ভরম ফেলিয়া, চির-বাঞ্ছিতের সংকেত ধরিয়া ছুটিতে থাকে। বিংশশতাব্দীর ভক্ত কবি গাহিলেন

তোমার বাঁশী কেমন বাজে
নিবিড় ঘন মেঘের মাঝে
বিদ্যুতেরে মাতালে।

নাটের লীলা হায় গো এ কি
পুলক জাগে আজকে দেখি
নিদ্রা ঢাকা পাতালে।
লুকিয়ে রবে কেগো মিছে
ছুটেছে ডাক মাটীর নীচে
ফুটায়ে ভুঁই চাঁপারে।
রুদ্ধ ঘরের ছিদ্রে ফাঁকে
শূন্য ভরে তোমার ডাকে
রইতে যে কেউ না পারে।
কত কালের আঁধার ছেড়ে
বাহির হয়ে এল যেরে
হৃদয় গুহার নাগিনী।
নত মাথায় লুটিয়ে আছে
ডাকো তারে পায়ের কাছে
বাজিয়ে তোমার রাগিণী।

পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছিলেন—

মধুর মুরলী পূরে বনমালী
রাধা রাধা বলি গান।
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান॥
অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী গীত।
অবিচলকুল রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত॥

শ্রবণে যাইয়া রহিল পশিয়া
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখরাশি ॥
আনন্দ অবশ পুলক মানস
সুকুমারি ধনি রাধে।
গৃহ কর্ম্ম যত হৈল বিসরিত
সকল করিল বাধে ॥
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি করিল বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী ॥
কুলের করম ধৈরজ ধরম
সরম ভরম ফাঁসী।
চণ্ডীদাস ভণে এই সে কারণে
কানুর সরবস বাঁশী ॥

কানু বাঁশীর রবে আমাদিগকে ডাকিতেছেন। অব্যক্ত ব্যক্তকে প্রকাশের জগৎকে নিত্য আহ্বান করিতেছে। অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত অসীম, উজ্জ্বল ব্যক্ত প্রকাশকে বাঁশীর রবে নিত্য অভিসারের জন্য আহ্বান করিতেছে।

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে আমি এতক্ষণ যথাসাধ্য বৈষ্ণব-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব বিবৃত করিতে চেষ্টা করিলাম। বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই অন্তর প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া থাকিলে আমরা সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে পারিব এবং উপযুক্ত মর্য্যাদাও দিতে পারিব। মানুষ

একদিকে জন্মগত, অবস্থাগত, অপরিহার্য্য বৈষম্য পীড়িত হইয়া সান্ত্বনা খুঁজিতেছিল আবার অন্যদিকে রূপরসের আকর্ষণে কেবল ক্ষুদ্রত্বেই ডুবিয়া যাইতেছিল। পৃথিবীর সুখেও বঞ্চিত ছিল, স্বর্গও অতি দূরে আশার অতীত দূরে পড়িয়াছিল। পৃথিবীর দীন-হীনের জন্য যেন স্বর্গ পৃথিবীর সকল দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল ; বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রেমের যাদু-মন্ত্রে সকল দ্বার সকলের জন্য খুলিয়া দিলেন, এঘর ওঘর একাকার হইয়া গেল। মানুষ অবাক্ হইয়া দেখিল পৃথিবীর রূপের দ্বার দিয়া স্বর্গের অরূপের ঘরে পৌছান যায়। আপন বিশিষ্টতার চরম সার্থকতার আকাঙ্ক্ষায় নিত্য এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দের ভিতরে কি অমৃতের সন্ধান করিতেছিল। কি আকুলতা, কি পিপাসা লইয়া এই রূপ, রসের বিষয়ের পশ্চাতে ছুটিতেছিল। সে অনুভবের বর্ণনা করা যায় না।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
অনুক্ষণ নৌতুন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয়ে রাখনু
হৃদয় জুড়ন নাহি গেল॥
বচন অমিয় রস অনুক্ষণ শুনলু
শ্রুতি পথে পরশ না ভেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝনু কৈছন গেল॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।

বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥

আবার—

জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময় ।
নয়ন চকোর মোর পিতেকরে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয় ॥

ঐ রূপের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপের লীলা হইতেছে বলিয়া জগৎ রূপে পাগল। রূপের তৃষ্ণার মূলে এই অরূপের সন্ধানের সঙ্কেত রহিয়াছে। সকল স্পর্শের ভিতরে পরমানন্দের সুখ স্পর্শ আসিয়া উৎফুল্ল ও পুলকিত করিতেছে। সকল রস রস হইয়াছে, তৃপ্তি হইয়াছে, রস স্বরূপের ছায়া স্পর্শে। সকল রসের ধারা, ক্ষুদ্রকে লইয়া সসীমকে লইয়া অসীমের নিকট উপস্থিত করিতেছে। এই অপূর্ব্ব লীলা বৈষ্ণব কবিরা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের কবিতায় সর্ব্বত্র এই ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে! উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য সকলেও এই ভাবের বিশেষ উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাবেরই অনুপ্রাণনায় বিংশশতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি গাহিলেন

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে
অরূপ তোমার রূপের লীলা জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর!

তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে
বিশ্ব সাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাইত ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।

এই নিত্য প্রেমের লীলাই ব্রজলীলার প্রাণ। এই আদর্শ লইয়া কত রসিক ভক্ত ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন। তাই বিল্বমঙ্গল গাহিয়াছেন

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেত দহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

তাই ভক্ত কবি রজনীকান্ত গাহিলেন

তুমি সুন্দর তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।
তুমি উজ্জ্বল তাই নিখিল দৃশ্য নন্দন প্রভাময়।
তুমি অমৃতবারিধি হরিহে তাই তোমার ভুবন ভরিহে,
পূর্ণচন্দ্রে পুষ্প গন্ধে সুধার লহরী বয়।
ঝরে সুধাজল ধরে সুধা ফল পিয়াসা ক্ষুধা না রয়॥
তুমি প্রেমের চিরনিবাস হে তাই প্রাণে প্রাণে প্রেম পশেহে
তাই মধুরতাময় বিটপীলতায় মিলি প্রেম কথা কয় হে।
জননীর স্নেহ সতীর প্রণয় গাহে তব প্রেম জয় হে॥

শুধু কি জননীর স্নেহে সতীর প্রেমে জয়ধ্বনি উঠিতেছে? বিশ্বের সকল আঘাতে সকল ব্যথাতে সকল উত্থানে, পতনে তাঁহারি জয়ধ্বনি হইতেছে

"দিয়ে দুঃখ সুখের বেদনা
আমায় তোমার সাধনা।

আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া
এলে তোমার সুর মেলিয়া
এলে আমার জীবনে।”

রবীন্দ্রনাথ আবার অগ্রসর হইয়া গাহিলেন—

এই লভিনু সঙ্গ তব
সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম
ধন্য হ'ল অন্তর।
সুন্দর হে সুন্দর।
আলোকে মোর চক্ষু দুটী
মুগ্ধ হয়ে উঠলো ফুটি
হৃদ্-গগনে পবন হ'ল
সৌরভেতে মন্থর।
সুন্দর হে সুন্দর।
এই তোমারি পরশ রাগে
চিত্ত হ'ল রঞ্জিত
এই তোমারি মিলন সুধা
রৈল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম জন্মান্তর।
সুন্দর হে সুন্দর।

সেই নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি কেমন করিয়া ধরা দেন, কেমন

করিয়া বাঁধা পড়েন, আবার এই প্রেমের লীলার জন্য প্রেমময় পরমানন্দস্বরূপ কি আশ্চর্য্যভাবে আপনার চিন্ময় আনন্দঘনরূপ প্রকাশিত করিয়া মানবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি দিতেছেন আবার চাহিতেছেন, শুধু দিয়াই তিনি তৃপ্ত নহেন। এই ক্ষুদ্র আমার কাছে এই দুঃখী আমার কাছে, দীন আমার কাছে, তিনি চাহিতেছেন। আমার পাওয়া তাঁহার চাওয়াতে সার্থক হইতেছে, তাঁহার পাওয়া আমার চাওযাতে পরিপূর্ণ হইতেছে, আমার চাওয়া না হইলে তাঁহার সব ফুরিয়ে যায়, এই অপূর্ব্ব প্রেমের লীলা, এই মধুর সান্ত্বনার সমাচার, বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই তত্ত্বের মাধুর্য্য আলোচনা করিয়া শেষ করা যায় না। এ ত বলার কথা নহে অনুভবের কথা। আর এ কথা কি, যে সে বলিতে পারে, না বোঝাইতে পারে। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

"তুমি আমার অঙিনাতে ফুটিয়ে রাখ ফুল
ওরা আমার হৃদয় পানে মুখ তুলে যে থাকে
ওরা তোমার মুখের ডাক নিয়ে যে আমারি নাম ডাকে
ওগো ঐ তোমারি ফুল।
তোমার কাছে কি যে আমি সেই কথাটী হেসে
ওরা আকাশেতে ফুটিয়ে তোলে ছড়ায় দেশে দেশে।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।
হাসি মুখে আমার যতন নীরব হয়ে যাচে
তোমার অনেক যুগের পথ চাওয়া যে ওদের মুখে আছে
ওগো ঐ তোমারি ফুল।"

"অসীম ধনত আছে তোমার
তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে
কণায় কণায় বেঁটে।
দিয়ে তোমার রতন মণি
আমায় কর্‌লে ধনী,
এখন দ্বারে এসে ডাক
রয়েছি দ্বার এঁটে।
আমায় তুমি করবে দাতা
আপনি ভিক্ষু হবে
বিশ্বভুবন মাতল যে তাই
হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ঐ রথে
নাম্‌বে ধূলাপথে
যুগযুগান্ত আমার সাথে
চল্‌বে হেঁটে হেঁটে।"

"হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্ব-ছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্রতর বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।"

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব

বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ পৌরাণিক উপকথাও নহেন, রূপকও নহেন, কবিকল্পনাও নহেন, দেবতাও নহেন, অবতারও নহেন, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব-বস্তু। পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণের লীলা-কথার সঙ্গে যে সকল কল্পনা কিম্বদন্তী ও কাহিনী জড়িত হইয়া রহিয়াছে সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, তবেই বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বোধগম্য হইবে।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ভাগবতের এই শ্লোক শুনিয়া কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন—

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তাঁর রূপ॥

পণ্ডিতেরা অদ্বয়জ্ঞানবস্তুকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। এই পরম তত্ত্ব উপনিষদের ব্রহ্ম, যোগীজনের পরমাত্মা আর ভাগবতের ভগবান এবং এই ভগবানই বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের বিগ্রহে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম॥

* * *

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥ চৈঃ চ।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের চিৎশক্তি, চিদানন্দময়ী।

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ॥

শক্তি ও শক্তিমান একই অদ্বয় বস্তু, জ্ঞানগম্য তত্ত্ব বস্তু।

সৎ চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা যত তাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব॥

মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি॥
কৃষ্ণ প্রেমে ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥

* * * *

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

* * * *

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখ-রূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ বিস্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধাঠাকুরাণী॥ চৈঃ চ।

এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে পৌরাণিক সকল কাহিনী ভুলিয়া আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে গভীরতম অধ্যাত্মযোগে অপরোক্ষ স্বানুভূতিতে ইহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। রাধাকৃষ্ণ শব্দ দুইটীর সহিত যে সকল চির-প্রচলিত পৌরাণিক লীলা-কথা ও কল্পনা-জল্পনা জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া, আমাদের জীবনের ও জীবত্বের নিত্য আশ্রয়-ভূমিতে এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে, রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

আমরা পরমতত্ত্বকে তিন ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। প্রথমতঃ,

শব্দ স্পর্শ রূপ রসগন্ধাদির বিচিত্র আধার এই বিশ্বের অপূর্ব্ব সৃষ্টির মধ্যে তাঁহাকে জগদাত্মা, জগন্নিয়ন্তা জগৎস্রষ্টা ও বিশ্বরূপরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের আত্মবোধের ভিতরে আমাদের আত্মানুভূতি ও আত্মজ্ঞানের মূলে তাঁহাকে সাক্ষীচৈতন্য দ্রষ্টা অন্তর্য্যামী-রূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। তৃতীয়তঃ, এই সংসারের বিবিধ সম্বন্ধের মধ্যে, পিতা পুত্রের সম্বন্ধের মধ্যে, স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে, সখা সখীর সম্বন্ধের মধ্যে, সাধুভক্তদিগের মধ্যে, ত্যাগী কর্ম্মীদিগের মধ্যে, ব্যক্তিগত জীবনের নানা জয় পরাজয়ে, সামাজিক জীবনের নিত্য বিকাশের মধ্যে তাঁহার প্রকাশ ও নরনারায়ণরূপে লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। অদ্বৈত সিদ্ধান্ত জীব জগৎও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, মায়াতে এই অসত্য জগৎ অনিত্য জীব সত্য নিত্য বলিয়া বোধ হই-তেছে। এই তত্ত্বের মধ্যে ভক্ত ভগবান্ জ্ঞাতা জ্ঞেয় প্রভৃতি দ্বৈত-সম্বন্ধের কোন অস্তিত্ব বা সম্ভাবনা নাই। জ্ঞাতা জ্ঞেয় সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া, উপাসনারও অবসর থাকে না। বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপ ও জীবের স্বানুভূতিতে সাক্ষীচৈতন্য আশ্রয় দ্রষ্টা অন্তর্য্যামীরূপ দুইই মায়ার বিক্ষেপ হইলে অভেদ অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞান কি ভাবে প্রকাশিত হয় তাহা নিম্ন অধিকারীরা ধারণা করিতে পারেন না। এই অদ্বৈতব্রহ্মসাক্ষাৎ-কার অথবা ব্রহ্মসংসিদ্ধি লাভ, ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান অতিজ্ঞানের অবস্থা সাধারণের বোধগম্য নহে। আবার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, এই তত্ত্বের ভিতরে কিছু স্ববিরোধিতা রহিয়া যায়; কেন না মায়া কি, মায়ার মূল কোথায় এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা সহজে হয় না। আবার সৃষ্টির আদিকালে কোন্ ইন্দ্রিয়বোধের আশ্রয়ে এই বিচিত্র বিশ্বের অপূর্ব্ব প্রকাশরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিল? জগতের অস্তিত্ব যদি মায়িক হয়, তবে কাহার

পক্ষে মায়িক ? সেই আদি যুগে আমার আত্মজ্ঞানের ইন্দ্রিয়-বোধের উপরে যখন ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করিত না, তখন এই রূপরসভরা বসুন্ধরা কাহার বোধের আশ্রয়ে প্রকাশিত হইত এবং কাহার নিকট মায়িক ও অলীক ছিল ? আমার প্রত্যক্ষ অনুভবের ও উজ্জ্বল অভিজ্ঞতার সমস্ত বিষয় ভ্রম, মায়া ; কেবল অখণ্ড অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান সত্য ? আমার ব্যক্তিত্ব-বোধ মায়া, আমার আত্ম-জ্ঞান মায়া, আমার বিশ্বসৌন্দর্য্যবোধ মায়া, আমার সব চলিয়া গেলে, সব মিথ্যা হইলে এই অখণ্ড অভেদ কোথায় দাঁড়ায় ? এই বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে ক্রমেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। আবার এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে প্রত্যক্ষ অনুভব ও অভিজ্ঞতার বিরোধী অতি জ্ঞানের অবস্থার সঙ্গে ব্রহ্মাতিরিক্ত মায়াকে মানিয়া লইতে হয়। বিশ্বের নাম ও রূপের মধ্যে যে বিচিত্র প্রকাশ, জীবে-জগতে যে পরমচৈতন্যের নিত্যলীলা, সকল মূর্ত্তির ভিতর দিয়া সেই নিখিলরসামৃতমূর্ত্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ, জগতের খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য্য ও বিচিত্রতার ভিতরে সেই অখণ্ড অনন্ত রূপের পরমোজ্জ্বল ভাতি, ইহাকে স্বীকার করিয়া সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়াই বর্ত্তমান যুগে সমস্ত বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অদ্বৈত সকলকে বাদ দিয়া মায়িক অলীক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া পরম ব্যোমে অবস্থিতি করিতেছেন, না সকল বৈচিত্রকে লইয়া সকল খণ্ড শান্ত অপূর্ণকে লইয়া সকল রূপ-রস-নামের সীমার ভিতরে সকলের অন্তরতম ও নিত্য আশ্রয়রূপে চিরবিরাজ করিতেছেন ? আমাদের স্বানুভূতি বিশ্ব-বোধে পূর্ণ হইতে চাহিতেছে, ভূমার সঙ্গে নিত্যযোগ অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে।

এই অদ্বৈত-তত্ত্ব জ্ঞানমার্গ বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

ভক্তি-ধর্ম্ম এই তত্ত্ব স্বীকার করেন না। অন্যান্য দেশের ভক্তি-ধর্ম্ম-তত্ত্বের ভিতরে এই অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত অস্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু মীমাংসিত হয় নাই। বৈষ্ণবমহাজনেরা এই অদ্বৈতসিদ্ধান্ত চরম বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং সুন্দর সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিয়াছেন। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বলিতেছেন, জগৎ ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে; জগত ও জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ, তাহাতে অভেদের মধ্যেই ভেদের ও ভেদের মধ্যেই নিত্য অভেদেব প্রতিষ্ঠা হইতেছে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে, ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা প্রচ্ছন্ন ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে। জ্ঞেয় বস্তু যতক্ষণ জ্ঞাতার সঙ্গে এক না হয় ততক্ষণ জ্ঞান পূর্ণ হয় না, আবার ভিন্ন না হইলেও জ্ঞান সম্ভব হয় না। আনন্দ ও ভোগের বেলায়ও এই এক কথা। এই কারণেই বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত জগৎ, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করেন। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তে অদ্বৈতমতকেও গ্রহণ করা হইয়াছে, দ্বৈতমতকেও সার্থক করা হইয়াছে। এখানে দ্বৈত ও অদ্বৈতের মহা সমন্বয় হইয়াছে।

জীব ব্রহ্ম নহে, জগৎও ব্রহ্ম নহে, কিন্তু জীব ও জগৎ ঈশ্বর ছাড়া নহে, ব্রহ্মের বাহিরে নহে। ব্রহ্ম এই জগতের নিত্য আশ্রয় হইয়াও জগৎ হইতে বড় ও স্বতন্ত্র হইয়া আছেন। তিনি জগতের ও জীবের স্রষ্টাও আশ্রয় হইয়াও জগৎ ও জীব হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। এই জগতের একটা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ আছে, সেই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপেতে এই জগৎ ভগবানের নিত্য জ্ঞানের ও নিত্য ভোগের বিষয় হইয়া আছে। জীবেরও একটা আশ্রয় একজন জ্ঞাতা ও ভোক্তা আছেন। জগতের যেমন নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ আছে, জীবের তেম্‌নি একটা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ আছে। এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের নিত্য জ্ঞানের নিত্য বিষয়রূপে অনাদিকাল হইতে

বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই নিত্যের আশ্রয়েই এই বিশ্বের পরিণাম-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই জগৎ ঈশ্বরের জ্ঞানের ও ভোগের বিষয় হইয়া অনাদিকাল হইতে তাহারই মধ্যে রহিয়াছে। জীবও তেমনি অনাদিকাল হইতে তাহার জ্ঞানের ও ভোগের বিষয় হইয়া তাহারই মধ্যে রহিয়াছে। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া নহে, তাহা হইতে দূরে নহে, তাহার আশ্রয়ে জীব ও জগৎ নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাহিরের সকল প্রকাশ, সকল রূপ-রসের বিচিত্র মূর্ত্তিকে অলীক মায়িক বলিতে হইলে সৃষ্টির আদির অব্যক্ত অবস্থায় যাইতে হয়। অব্যক্ত যখনই আপনাকে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, নানা রূপেরসে অনন্ত যখন আপনাকে নানা মূর্ত্তি দিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সেই প্রকাশের ব্যক্তের জগতেই জ্ঞানের আনন্দের অরুণালোক সম্ভব হইয়াছে; তাহার আদিতে যাহা, সেই অসীম অনন্ত পরম ব্যোমের কথা, তাহা শুধু তত্ত্ব মাত্র; তাহার সহিত আমাদের জীবনের কোন যোগ নাই।

জীবমাত্রেরই একজন জ্ঞাতা ও আশ্রয় আছেন। ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞাতৃত্বের অধীনে নহে, কাহারও সাপেক্ষ নহে, স্বতন্ত্র। অপরোক্ষ অনুভূতিতেই জ্ঞাতা বা বিষয়ীরূপেই ইহাকে উপলব্ধি করা যায়। এই ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানবস্তু, ইহাই বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ, আর সব তাঁর প্রকৃতি। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে পুরুষ বলিতে কেবল শ্রীভগবান্‌কেই বুঝায়, আর সৃষ্ট জগৎ ও জীব তাঁর প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। তিনি একা ভোক্তা, বিষয়ী আর জীব ও জগৎ তাহার নিত্যানন্দ ও নিত্যজ্ঞানের বিষয়রূপে নিত্যলীলার আয়োজন ও রচনা করিতেছে। আমাদের পুরুষাভিমান আছে। আমরাই বিশ্বের রূপরসাদির জ্ঞাতা ও ভোক্তা, এ সকল আমাদের জ্ঞেয় ও ভোগ্য; আমরাও নিজেরা বিবিধ ক্রিয়ার

সৃষ্টি করি, আমাদের কিছু শক্তিও আছে; সুতরাং আমরাও কর্ত্তা। কিন্তু আমরা স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বতন্ত্র নহি। আমাদের জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব বাহিরের বিষয়াধীন এবং যে ভোক্তা, জ্ঞাতা ও কর্ত্তার ভোগ্য জ্ঞান ও কর্ম্মরূপে এই বিশ্বের নিত্য প্রতিষ্ঠা, আমাদের ভোক্তৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারই অধীন। তিনি একমাত্র পরিপূর্ণ ভোক্তা, এক কর্ত্তা, এক জ্ঞাতা—এই জন্য বিশ্বে একমাত্র পুরুষ তিনি। আমাদের পুরুষাভিমান মিথ্যা, তাই ভক্তমালে মীরাবাইর জীবন-চরিত্রে দেখা যায় :—

> "বৃন্দাবনে গিয়া বাই আনন্দে মগন।
> বাঞ্ছা হৈল শ্রীরূপ গোস্বামী দরশন ॥
> কহি পাঠাইল শ্রীরূপেরে কার দ্বারে।
> দরশন করি যদি কৃপা করে মোরে ॥
> গোসাঞি কহেন মুই করি বনে বাস।
> নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ ॥
> এ কথা শুনিয়া বাই ক্ষোভ পাই মনে।
> পুন কহি পাঠাইল গোসাঞির স্থানে ॥
> এতদিন শুনি নাই শ্রীমন্ বৃন্দাবনে।
> আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে ॥
> পুরুষ কোকিল ভ্রমরাদির অগম্য।
> তেঁহ যে আইলা তাতে নাহি বুঝি মর্ম্ম ॥
> প্যারীজীর প্রিয় সখী ললিতা জানিলে।
> কেমনে রহিবে তেঁহ অন্তঃপুর স্থলে ॥
> এতেক প্রহেলী যদি কহি পাঠাইলা।
> শুনিয়া শ্রীরূপ কিছু লজ্জিত হইলা ॥"

যাহাকে আপনার পূর্ণ জ্ঞানের, পূর্ণানন্দের আশ্রয় করিয়া ভগবান্ পরমপুরুষ হইয়া আছেন, বৈষ্ণবমহাজনেরা তাহাকেই প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। এই প্রকৃতি নিত্যকাল পুরুষের অনুসরণ করিতেছে, আর পুরুষ তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। ব্যক্ত ও অব্যক্তের এই নিত্য লীলাই পুরুষপ্রকৃতির লীলা। বাহিরের প্রকাশ অন্তরের দেবতাকে নানা বর্ণে ছন্দে বরণ করিয়া আপনার করিতে চাহিতেছে, অন্তরতম আশ্রয় আশ্রিতের ভিতর আপনাকে খণ্ডিত করিয়া, মণ্ডিত করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছে। বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত, সৃষ্টির সহিত, বিশ্বের পরমপুরুষের বিশ্বেশ্বরের নিত্য আদান-প্রদান, নিত্য মিলন-বিরহের নিত্যলীলা চলিতেছে। এই পুরুষ-প্রকৃতি-সমন্বিত যুগলতত্ত্বে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের ঈশ্বর তত্ত্ব। এই জন্য বৈষ্ণব সাধকেরা যুগলোপাসনা করিয়া থাকেন।

পিতা পুত্রই হউক, প্রভু দাস হউক, সখা সখী হউক, যুগলতত্ত্বের উপরই সকল মধুর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। এক দিয়া এককে বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। সৃষ্টি প্রকাশ ও প্রকৃতিকে ছাড়িয়া স্রষ্টা ও ভগবান্ পরমপুরুষকে বুঝিতে যাওয়া, পুত্রকে ছাড়িয়া সন্তানকে ফেলিয়া মাকে বুঝিতে যাওয়ার মত। সন্তানকে লইয়াই মায়ের মাতৃত্ব। তেমনি এই ব্যক্ত খণ্ডের ভিতরে, প্রকাশের ভিতরে, অব্যক্ত পরমপুরুষের শ্রীভগবান্‌রূপে প্রতিষ্ঠা। বৈষ্ণবের যুগলতত্ত্ব ইহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব-প্রকৃতিতে যে লীলা মহোৎসব নিত্য চলিতেছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া কবি, শিল্পী ও ঋষি কাব্য, শিল্প ও মন্ত্র রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রকাশের উজ্জ্বল পীত বসন পরিয়া ব্যক্ত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরিয়া নানা রূপে রসে ভরপূর হইয়া দশ দিক আলো করিয়া চলিয়াছে, শ্যামায়-মান অসীম অব্যক্ত আপনার বুকের ধন ঐ প্রকাশোজ্জ্বল ব্যক্তকে

মোহন বাঁশীর রবে ডাকিতেছে, ওগো আমার, ওগো আমার বলিয়া আহ্বান করিতেছে, আবার সেই বাঁশীর রবে পাগল হইয়া ব্যক্ত, প্রকাশের কূল ছাড়িয়া কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, বলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।"

বাহিরের জগতে সেই অচিন্ত্যপরমপুরুষ প্রকৃতির সহিত নিত্য লীলা করিতেছেন, দুইএর লীলা খেলা চলিয়াছে। এক পরিপূর্ণ অখণ্ড অনন্তশক্তিমান্ অসীমরহস্যময় ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সকল শ্রী ও আনন্দেপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ব্যক্তরূপে, খণ্ডরূপে বিশ্বময় রূপে রসে বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ পরমোজ্জ্বল প্রকাশের সহিত কি আদান-প্রদান, কি মধুর প্রেমলীলা করিতেছেন; এই নিত্য রস-লীলার দুই এক বিন্দু রসের আস্বাদ পাইয়াই মানুষ বিজ্ঞান, দর্শন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, নাট্য-সঙ্গীত, চিত্রাদি চৌষট্টী কলার সৃষ্টি করিতেছে। তেম্‌নি এই দেহের ভিতরে আমিও 'আমি'র অতীত আর এক জনের নিত্যলীলা চলিতেছে। ভগবান্ পূর্ণ পুরুষ স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তিনি আপনার মধ্যেই বিষয়-বিষয়ী, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কর্ত্তা-কর্ম্ম, ভোক্তা-ভোগ্য হইয়া রহিয়াছেন; তাই তিনি পুরুষ-প্রকৃতিরূপে, রাধা-কৃষ্ণরূপে নিত্যলীলা করিতেছেন। এই পরমতত্ত্বের প্রকাশে পুরুষ-প্রকৃতি এই ভেদ জন্মিতেছে, আবার যুগপৎ এই ভেদের মধ্যেই ইহাদের মিলনে অভেদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-সমন্বিত যে পরমতত্ত্ব, তিনিই শ্রীভগবান্। এই ভগবান্ জীবের মধ্যে রহিয়াছেন। জীবের

জীবত্ব তাঁহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারই আশ্রয়ে প্রকাশিত। আমার জীবনের ও জীবত্বের নিত্য আশ্রয়-ভূমিতে পুরুষ-প্রকৃতির লীলা হইতেছে। আমার ভিতরে আমার অস্তিত্ব-বোধ, আমার জীবত্ব ও আমার সাক্ষী চৈতন্য, দ্রষ্টা অন্তর্যামী অন্তরতম আশ্রয় উভয়ের কি অপূর্ব্ব খেলা চলিয়াছে। আমার প্রতিদিনকার জীবনের রঙ্গভূমির অন্তরালে এই নিত্যলীলার অভিনয় হইতেছে। এই নিত্য প্রেমলীলার দুই এক বিন্দু বাহিরে পড়িয়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি সম্বন্ধের আশ্রয়ে নিত্য নব নব রসে ফুটিয়া উঠিতেছে। সংসারে মগ্ন হইয়া মানুষ কেবল বাহিরের খেলাই দেখে, কিন্তু ইহার অন্তরালে যে অন্তরঙ্গ লীলা চলিতেছে তার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না।

"সেদিনে. আপদ আমার যাবে কেটে
পুলকে হৃদয় যেদিন পড়্‌বে ফেটে।
তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু
আপনি বাহির হবে বঁধু হে
তা'রে আমার বলে' ছলে বলে,
কে বল আর রাখ্‌বে এঁটে।
আমারে নিখিল ভুবন দেখ্‌বে চেয়ে রাত্রি-দিবা।
আমি কি জানি না তার অর্থ কিবা।
তারা যে জানে আমার চিত্তকোষে
অমৃতরূপ আছে বসে গো,
তারেই প্রকাশ করি আপনি মরি
তবে আমার দুঃখ মেটে।"

এই আমার ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের ভিতরে, আঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরে, জয়-পরাজয়ের অন্তরালে কে আমার সাথের সাথী, ব্যথার ব্যথী হইয়া

আশ্বাস-সান্ত্বনা লইয়া নিত্য আমার অন্তরতম প্রদেশে কি প্রেমের লীলা করিতেছেন, যেদিন আমার প্রাণ সাড়া দিবে, এই লীলার আস্বাদ করিতে সক্ষম হইবে, সেদিন সকল ব্যথা, সকল জ্বালা দূর হয়ে যাবে। আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখি কে আমার হৃদয়ের নিভৃত গোপন-ঘরে, আমার সকল চেতনা. সকল বেদনার ভিতরে, নীরবে আমার প্রেম চাহিতেছে এবং প্রেমে পূর্ণ হয়ে' হৃদয়-পাত্র সুধায় পূর্ণ করিয়া দিতেছে; আমার সকল গ্লানি মুছাইয়া দিয়া নিত্য নবরসে প্রাণ সরস করিয়া দিতেছে, আবার তৃষিত ব্যাকুল হইয়া এই আমার প্রেম চাহিয়া আমাকে ধন্য করিতেছে।

"কে গো অন্তরতম সে?
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয় বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুখে হরষে।
সোণালি রূপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধা সরসে।
কত দিন আসে কত যুগ যায়
গোপনে গোপনে পরাণ ভুলায়
নানা পরিচয়ে নানা নাম লয়ে'
নিতি নিতি রস বরসে।"

আমার এই ক্ষুদ্র 'আমি' ধন্য হইয়া গিয়াছে, আর সে তুচ্ছ দীন নহে। আমার সকল ব্যর্থতা, সকল পরাজয়, সকল গ্লানি, সকল দুঃখ-বেদনা বহন করিয়া আমার অন্তরতম আমাকে সার্থক করিয়া তুলিতেছেন। আমার বুকভরা বুকভাঙ্গা সকল কামনা আকাঙ্ক্ষা আবেগকে তিনি পরিপূর্ণ ও সার্থক করিয়া দিতেছেন। একি প্রেম-পিপাসা, একি প্রেম-বিতরণ, একি নিত্য অভিসার, নিত্য বিরহ-মিলন! কোন যুগ-যুগান্ত হ'তে, সৃষ্টির অনাদিকাল হ'তে আমার এই অস্তিত্বের বিশেষ ধারা ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হইতেছে। জীবন-দেবতা অন্তরতম পরম প্রিয়, জন্ম-জন্মান্তর, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আমার এই ক্ষুদ্র আমিকে কত ভাল-মন্দ, কত ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া বিশ্বচরাচরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া বিকশিত করিয়া তুলিতেছেন। এই আমির একটা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ আছে, তাই যুগ-যুগান্তের বহু বিচিত্র জীবন-স্মৃতি লইয়া জীবন-দেবতার সহিত নিত্য অভিসার, নিত্য প্রেমলীলা করিতে সক্ষম হইতেছি। এ অপূর্ব্ব লীলার কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, অপরোক্ষ অনুভূতিতে ইহাকে লাভ করিতে হয়। ভাগ্য প্রসন্ন হইলে যখন এই ভাগবতীলীলার সাক্ষাৎকার হয়, তখন এই হৃদয়-বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণলীলা রসাস্বাদন করিয়া মানুষ ধন্য ও তৃপ্ত হইয়া যায়। এই অবস্থা যাঁহাদের লাভ হইয়াছে, এই সাধন যাঁহাদের আছে, তাঁহারা কখনও পুরুষের সঙ্গে, কখন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিয়া তাঁহাদের ভাবে ভাবিত হইয়া এই নিগূঢ়লীলারস আস্বাদন করেন। তাই যে সকল বৈষ্ণব কবিতা বা পদাবলী পরবর্ত্তী যুগে বহির্ম্মুখ ইহসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদিগের নিকটে মদনমহোৎসবের গীতাবলী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সেই পদাবলী ভক্ত সাধক বৈষ্ণবের নিকট অন্তরঙ্গ সাধনের প্রাণজুড়ানো পরিপূর্ণ সঙ্গীত, লীলাতত্ত্বের অপূর্ব্ব স্বর্গীয় মাধুরীময় প্রকাশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

এই দেহতত্ত্ব এই আমির মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈত ভাব এদেশের সাধনের নিজস্ব সামগ্রী। বৈষ্ণবধর্ম্মের অপূর্ব্ব দান। এই দেহের মধ্যে এই দেহের অতীত ও দেহধর্ম্ম বিবর্জ্জিত একটা কিছু আছে, যাহার সহিত আমার আমি নিত্যযুক্ত হইয়া আছে। দেহের ভোগ সুখের উর্দ্ধে আমি প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয়ের ভোগ বাহিরের আবরণ মাত্র। সাক্ষী চৈতন্যের উপরে আমি প্রতিষ্ঠিত, যাহার জ্ঞানে আমি জ্ঞানী, চৈতন্যে আমি সচেতন, প্রেমে আমি প্রেমিক, যাহার শক্তিতে আমি শক্তিমান্ ও কর্ম্মী সেই আমি নিত্য বস্তু। আমার নিত্যসিদ্ধস্বরূপেই পরম চৈতন্যের লীলা সম্ভব হইতেছে। বিশ্ব অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে এই আমি অভিব্যক্তির ধারাও অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমার জীবনদেবতা আমার এই ক্রমবিকাশের ধারাকে অনাদিকাল হইতে ধারণ করিয়া আছেন। তাই আমার ব্যক্তিত্বের একটা নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপ আছে। ঐ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপেই আমি অমৃতের পুত্র মরিয়াও মরি না!

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

তাই সেই পরম দেবতার সহিত নিত্যকালের যোগ; নানারূপে নানাছন্দে আমাদের মিলন হইতেছে। আমি অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিলে সে আসিয়া আমার সাধ্য সাধনা করে, আমি না হ'লে যে চলে না!

"হে অন্তরের ধন
তুমি যে বিরহী, তোমার শূন্য এ ভবন
আমার ঘরে তোমায় আমি
একা রেখে দিলাম স্বামী
কোথায় যে বাহিরে আমি
ঘুরি সকল ক্ষণ।
হে অন্তরের ধন
এই বিরহে কাঁদে আমার নিখিল ভুবন।
তোমার বাঁশী নানা সুরে
আমায় খুঁজে বেড়ায় দূরে
পাগল হ'ল বসন্তের এই
দখিন সমীরণ।"

"সন্ধ্যা হ'লো একলা আছি বলে'
এই যে চোখে অশ্রু পড়ে গলে'
ওগো বন্ধু বল দেখি
শুধু কেবল আমার এ কি ?
এর সাথে যে তোমারও অশ্রু দোলে।
থাক না তোমার লক্ষ গ্রহ তারা
তাদের মাঝে আছ আমায় হারা।
সইবে না সে সইবে না সে
টান্‌তে আমায় হবে পাশে।
একলা তুমি আমি একলা হলে।"

সে না হ'লে যে আমারও চলে না।

"একি গভীর একি মধুর
একি হাসি পরাণ বঁধুর
একি নীরব চাহনি।
একি ঘন গহন মায়া
একি স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া
নয়ন অবগাহনি।"

এ খেলার শেষ নাই বিরাম নাই।

"আজ মনে হয় সকলের মাঝে
তোমারেই ভাল বেসেছি।
জনতা বাহিয়া চিরদিন শুধু
তুমি আর আমি এসেছি।"

"আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।
কত যে গিরি কত যে নদী তীরে
বেড়ালে বহি ছোট এ বাঁশীটিরে
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব।
তোমারি ঐ অমৃত পরশে
আমার হিয়া খানি
হারাল সীমা বিপুল হরষে
উথলি উঠে বাণী।

আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবস বিভাবরী
হল না সারা কত না যুগ ধরি
কেবলি আমি লব।"

আপনার অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ অনুভূতিতে মগ্ন হইলে এই দুই এর যে নিত্য লীলা প্রত্যক্ষ হয় তাহাই উপনিষদের—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদবত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভি চাকশীতি ॥

এই শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহারই ভাবে এই সঙ্কীর্ত্তনটি রচিত হইয়াছে—

এক শাখী পরে, দু-বিহগবরে
সুখে বসবাস করে রে
উভে উভয়ের সখা প্রেমে মাখা মাখা
দোঁহে দোঁহায় নিরখে রে।
(একজন) সুরস রসাল লইয়ে যতনে দিতেছে আর সখারে
(আর জন) লভিয়ে সে ফল, প্রেমেতে বিহ্বল
সুখেতে ভোজন করে।
(সখা দেখেন কেবল নিরশন থেকে, ফল দাতা ফল দিয়ে সুখী)

আরও অগ্রসর হইলে দেখি এই আমির মধ্যে একটী অপূর্ব্ব ত্রিত্ব ত্রিধারা বিরাজ করিতেছে। ইন্দ্রিয় ভোগে রূপে রসে বদ্ধ আমি একজন, আর আমার অহঙ্কার আত্ম-জ্ঞানের উপরে পরমচৈতন্যের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত, আর এক আমি যে আমি, সর্ব্বদা সকল সুখদুঃখের ভিতর দিয়া সকল রূপরসের ভোগের ভিতর দিয়া গোপন-হৃদয়-নিভৃতের অমৃতের অনুসন্ধান করিতেছে—

"জীবন আমার যে অমৃত
আপন মাঝে গোপন রাখে
প্রতিদিনে আড়াল ভেঙে
কবে আমি দেখ্‌ব তাকে।
তাহারি স্বাদ ক্ষণে ক্ষণে
পেয়েছি ত আপন মনে
গন্ধ তারি মাঝে মাঝে
উদাস করে আমায় ডাকে।"

আর তৃতীয় আমি সেই আমির সাক্ষী চৈতন্য সাক্ষী জীবন অন্তর্যামী, জীবন দেবতা। এই তিন লইয়া পরিপূর্ণ আমি। বৈষ্ণব সাধকেরা এই শেষোক্ত দুই আমিকে হৃদয়-বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়াছেন এবং প্রথম আমিকে সখীভাবে মঞ্জরীভাবে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রাধাভাবে ভাবিত হইয়া জীবনদেবতার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া ভজনা করিতেন আর এই নিগূঢ় লীলাতত্ত্ব, জীবের জীবত্ব প্রতিষ্ঠা ভূমিতে যে রাধাকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন এবং নিয়ত লীলা করিতেছেন এই পরম তত্ত্ব অন্তরঙ্গ ভক্ত রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতির সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং এই লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন।

এই নিগূঢ়লীলাতত্ত্ব কাহারও ভাগ্যক্রমে যদি অপরোক্ষ অনুভূতিতে সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহা হইলে তিনি মহাপ্রভুর মতন দিবানিশি লীলারসেই মগ্ন থাকিবেন আর পদাবলী সাহিত্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবরস, সাহিত্য কেবল রূপ বিলাস বা ইন্দ্রিয় ভোগ বিলাস বর্ণনা পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে না, সকল তুচ্ছ দেহের লীলা খেলার মধ্যে অরূপের বিশ্বরূপের অপূর্ব্ব লীলারসাভাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। সকল উপলব্ধির

ভিতরে পরমসুন্দরের উপলব্ধি, সকল স্বানুভূতির ভিতরে বিশ্বানুভূতির সন্ধান, সকল রসসম্বন্ধের ভিতরে নিখিল রসামৃতের দর্শন এই প্রথম সংকেত; আর বিশ্বময় যে ব্যক্ত ও অব্যক্তে খেলা চলিয়াছে, সীমার ও অসীমে লীলা হইতেছে, রূপরসের বিচিত্রতা যে বিশ্বরূপের পরিপূর্ণ প্রকাশ করিতে চাহিতেছে সেই প্রকৃতি পুরুষের রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলা দর্শন দ্বিতীয় সংকেত; আর অপরোক্ষ স্বানুভূতিতে যে আপনার ভিতরে, জীবনের রঙ্গভূমির অন্তরালে ক্ষুদ্র খণ্ড 'আমি'র সহিত অখণ্ড অনন্ত অসীম জীবনদেবতার লীলা, আমার সুখ দুঃখ ব্যথাভরা বুকের ভিতরে যে প্রকৃতি পুরুষের নিত্যলীলা চলিতেছে আমার হৃদয়-বৃন্দাবনে যে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা হইতেছে, সেই লীলা প্রত্যক্ষ দর্শন, তৃতীয় সংকেত। এই তিন সংকেত লইয়া আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রবেশ করিলে প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিব।

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব, যাহা মহাপ্রভুর পরম যত্নের ধন, তাহা তিনি গোপনে অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার বৈষ্ণবশিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে দুই একজনই তাহা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এই সহজ সরল অথচ নিগূঢ় প্রেমের ধর্ম্ম সাধারণের নিকট গৌরবান্বিত হইবে না ভাবিয়াই, তিনি সকলকে এ তত্ত্ব দেন নাই, আর সকলের সহিত ইহার প্রসঙ্গও করেন নাই। জগতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম মনুষ্যের চরম ধর্ম্ম তাই প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অপরোক্ষ অনুভূতিতে শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা সকলে সকলকালে প্রত্যক্ষ করিতে পারে তাহাই তাঁহার নিত্যলীলা। যাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলিয়াছে সেই দেখিতে পায়। যাহার দেহাভিমান আছে, কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে সে

শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে পাইবে না। অন্ধ হইয়াও বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন। জয়দেব এই নিত্যলীলার সন্ধান পাইয়াই মধুর পদাবলীতে তাহা বিন্যস্ত করিলেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এই লীলা-রসে মগ্ন হইয়াই অপূর্ব্ব গীতিকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য এই রাধাকৃষ্ণের লীলাতত্ত্ব আপনজীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের নিকট এই তত্ত্ব প্রকট করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার অপরূপ নাটকে এই নিত্য লীলার কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া গোবিন্দ লীলামৃত প্রচার করিয়াছেন।

এইমত নিত্য লীলা যার নাহি নাশ।
রসিক ভকত যাহা পাইতে করে আশ॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি ইহার নিত্যতা।
অদ্ভূত ইহাতে নাই ‍দুর্ভাবনা ব্যথা॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজের কৃষ্ণ সঙ্গে স্থিতি।
অতএব ব্যক্ত কৈল সে সব চরিতি॥

গোবিন্দলীলামৃত।

মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন,

অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

এই মানসিক সেবার দ্বারাই লীলারস আস্বাদনের সামর্থ্য জন্মিবে। পরে ইহা হইতেই নিত্যলীলা প্রত্যক্ষ হইবে।

বৃন্দাবনে দুই জন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সময় বুঝিয়া রহে সুখে।

সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বুল যোগাব চাঁদ মুখে ॥
যুগলচরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি
অনুরাগে থাকিব সদাই।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ দেহে পাব তাহা
পক্বাপক্ব সুবিচার এই ॥
পাকিলে সে প্রেমভক্তি অপক্বে সাধন কহি
ভকত লক্ষণ অনুসারে।
সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধ দেহে তাহা পাই
পক্ব অপক্বের এ বিচারে ॥
নরোত্তম দাসে কয় এই যেন মোর হয়
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ গণনাতে আমারে গণিবে তাতে
তবহুঁ পূরিবে অভিলাষ ॥

অন্তরঙ্গ সাধনের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারি, ব্যাখ্যা করিতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই। এই সকল তত্ত্ববাক্যে প্রকাশ করিতে গেলেই মহিমার খর্ব্ব করা হয়, প্রকাশের ত্রুটীতে সত্যের অপলাপ হয়, অপরাধ হয়। রামানন্দ রায়ের সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের যে আলোচনা হইয়াছিল, চরিতামৃত হইতে সংক্ষেপে তাহাই উদ্ধার করিতেছি।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয় ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার ॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্ম ত্যাগ এই সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম ভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো উত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তারতম॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রেম এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥
প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপাকরি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥

*　　　*　　　*

প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে!
সেই সব রসবস্তু তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥
এইত জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয়।
আগে কিছু আমার শুনিতে চিত্ত হয়॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা স্বরূপ।
রস কোন তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্ব রূপ॥

*　　　*　　　*

রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥

*　　　*　　　*

ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দ তনু শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্ব শক্তি সর্ব্ব রসপূর্ণ ॥

* * *

নানা ভক্তে নানা মত রসামৃত হয় ।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥
সঙ্ক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্ব রূপ ॥
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান ।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে ।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সভার উপরে ॥
সৎচিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী ।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥

* * *

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম ।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥*
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি ।
সেই মহাভাব রূপা রাধাঠাকুরাণী ॥

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥

রাধাপ্রেম সাধ্য শিরোমণি। বৈষ্ণব সাধনের মূলমন্ত্র এখানে। কৃষ্ণ বাঞ্ছাপূর্ণ করে, "যাঁহা যাহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" "কৃষ্ণ-প্রেমে ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়" কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে এই শ্রীরাধা ইহ পরকাল জাতিকুলমান, লোকধর্ম্ম, সমাজ-ধর্ম্ম সব পরিত্যাগ করিয়া চিত্তেন্দ্রিয়কায় শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণসুখ-সাধনের জন্য কৃষ্ণ বাঞ্ছাপূর্ণ করেন এবং কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইয়া থাকেন, এই রাধার প্রেম বৈষ্ণবের সাধ্য শিরোমণি। এই প্রেম আদর্শ। বেদমার্গ, বিধিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণগত প্রাণ হইয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণ ও কৃষ্ণপ্রেমে আত্মবিসর্জ্জন রাধা ভাবের প্রাণ। এই রাধা ভাব ভক্তি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও পরিপূর্ণ সাধন সংকেত। এই রাধা ভাব মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পক্ষেই স্বাভাবিক ও সম্ভব। অন্য সাধকের পক্ষে মহাভাবের এই অভ্রভেদী শিখরে পরমগৌরবময় সর্ব্বোচ্চ সাধনশৃঙ্গে আরোহণ সম্ভব নহে ভাবিয়াই গোপীভাব সাধনের সংকেত সাধক সাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ভক্তি ধর্ম্মের মূলমন্ত্র

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্ম সমর্পণ॥
শরণ লঞা কৃষ্ণে করে আত্ম সমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে তৎকাল করেন আত্মসম॥

সাধন ভক্তি-সম্বন্ধে মহাপ্রভু সনাতনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতেই সাধন-তত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যায়। নিম্নাধিকারী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্যও সেখানে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সেই সাধনতত্ত্ব উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধন প্রেমবিলাস

প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, চৈতন্য চরিতামৃত হইতে সেই আলোচনা উদ্ধার করিতেছি। যে সাড়ে তিন জন শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম-তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, রামানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। রাধাকৃষ্ণপ্রেমের বিলাসমাহাত্ম্য কি জিজ্ঞাসা করিলে রামানন্দ রায় স্বরচিত এই গান করিলেন :—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সো সব প্রেম কাহিনী!
কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন।
দুঁহুকেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ॥
অবসোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখপ্রেমিক ঐছন রীতি॥

প্রথম দর্শনেই আমি আকৃষ্ট হইলাম, দিনে দিনে আমার অনুরাগ বাড়িতে লাগিল, আমার দূতীও লাগিল না মধ্যস্থও লাগিল না, সে আমার মনোভাব বুঝিল আমিও তাহার মনোভাব বুঝিলাম। সে রমণও নহে, আমিও রমণী নহি; আমাদের এ কি সম্বন্ধ ভাষায় বলা যায় না। এই গান শুনিয়া মহাপ্রভু অস্থির হইয়াছিলেন এবং "আর না আর না" বলিয়া রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। এখন এই সাধ্য বস্তু কোন্ সাধনের দ্বারা পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করিলে রামানন্দ বলিলেন, রাধাকৃষ্ণ লীলা অতি গূঢ়তম অন্যের পক্ষে আস্বাদন করা সম্ভব নহে, তবে সখীভাবে ইহার সাধন করিতে হয়।

সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখী ভাবে তাহা যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা সে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটী সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণ লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটী সুখ হয়॥

* * *

নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গেতে বিহার॥
সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম সর্ব্ব তেজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিনে চিন্তে রাধা কৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধ দেহে চিন্তি করে তাহাঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী অনুগতি বিনে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥

ইহার পরে রামানন্দের সঙ্গে লীলাতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে শ্রীচৈতন্য আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল নিগূঢ়তত্ত্ব চৈতন্য-চরিতামৃতকারও লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। সে সব নিগূঢ় রসতত্ত্ব প্রেমতত্ত্বের কথা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবও নহে। নিজের ধর্ম্মতত্ত্ব ও লীলারসের কথা শ্রীগৌরাঙ্গ রামানন্দকে বলিয়াছিলেন, তাহার আভাস মাত্র চরিতামৃতে পাওয়া যায়। রসরাজ ও মহাভাব এই দুইরূপই যে একরূপে তাঁর স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, তাহা দেখাইলেন আর রাধাভাবে ভাবিত তাহা বলিলেন,

"তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে কৃষ্ণ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন।"

এখন সনাতনের সহিত যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার অনুসরণ করিতেছি।

এবে সাধন ভক্তি লক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ প্রেম মহাধন॥
শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করেন উদয়॥
সেইত সাধন ভক্তি দুইত প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর॥
রাগহীন জনে ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়॥
বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার॥

গুরুপাদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন ॥
কৃষ্ণ প্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস ॥
ধাত্র্যশ্বত্থ গো বিপ্র বৈষ্ণব পূজন।
সেবা নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন ॥
অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ বহু শিষ্য না করিব।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব ॥
হানি লাভ সম শোকাদির বশ না হইব।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন।
পরিচর্য্যা সখ্য দাস্য আত্ম নিবেদন ॥

* * *

সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তের শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণ প্রেম জন্মে এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥

এই যে সাধন তত্ত্ব এখানে উল্লিখিত হইল তাহা বৈধী ভক্তি সাধনের পথ সাধারণ বৈষ্ণবদিগের অনুসরণীয়। নামকীর্ত্তন সাধুসঙ্গ ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ সকল ধর্ম্ম সাধনেরই প্রথম সোপান। "মথুরাবাস" শব্দটি ভৌগলিক অর্থে গ্রহণ করিলে চলিবে না। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা লীলা ঐশ্বর্য্য বিস্তারের লীলা শক্তি প্রকাশের লীলা আর ব্রজলীলা মধুর প্রেমলীলা। এই নিত্য

প্রেমলীলায় প্রবেশাধিকার সকলের নাই, তাই শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তিমত্ত্বা অনুধ্যান প্রথমাধিকারীর নিত্য কর্ত্তব্য। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সৃষ্টিস্থিতি-পালনকর্ত্তা দুষ্টের দণ্ডদাতা শিষ্টের পালয়িতা এইভাবে ভগবানের অনুধ্যানই "মথুরাবাসে" সূচিত হইয়াছে। এই জন্যই সাধনের পঞ্চ অঙ্গকে সকল ধর্ম্ম সাধনের সোপান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। "কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎকৃপাবলোকন'' ইহাও সাধনের সংকেত। সব তাঁরই, সবেই তাঁর কৃপা, এই ভাবে সংসারের সমুদায় দর্শন করিতে পারিলেই ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায়।

বৈধী ভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন ॥

*　　　　*　　　　*

বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥
নিজাভিষ্ট কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মন হঞা ॥
এইমত যেই করে রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি ॥

প্রীত্যঙ্কুরে রতি ভাব হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান্ ॥

*　　　*　　　*

এবে শুন ভক্তি ফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরসজ্ঞান ॥
কৃষ্ণ রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণ ভক্তি রসের সেই স্থায়ী ভাব নাম ॥
এই দুই ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্তে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে ভক্তি হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণ প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেমনাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম ॥
যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন শাস্ত্রে এই কয় ॥
ক্ষান্তিরব্যর্থ কালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥

আসক্তি স্তদগুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে॥
এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভেতে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণে সম্বন্ধ বিনে কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি জানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নাম গানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ গুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥
কৃষ্ণ রতি চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণ প্রেমের চিহ্ন তবে শুন সনাতন॥
যার চিত্তে কৃষ্ণ প্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥
প্রেমা ক্রমে বাঢ়ে হয় স্নেহমান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহা ভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিশ্রী শুদ্ধ মিশ্রী আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল ক্রমে বাঢ়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদিকে তৈছে বাঢ়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারি ভেদে রতি পঞ্চ পরকার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রতি আর॥

এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব হয় পঞ্চ রস।
যেই রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ ॥

*　　　　*　　　　*

এই রসাস্বাদ নহে অভক্তের গণে।
কৃষ্ণ ভক্তগণ করেন রস আস্বাদনে ॥
সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ।
পঞ্চম পুরুষার্থ এই প্রেম মহাধন ॥

এখানে শ্রদ্ধা শব্দের একটু বিশেষ অর্থ আছে। গীতাতেও সেই বিশেষ অর্থেই শ্রদ্ধা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণ ভক্তি কৈলে সব কর্ম্ম কৃত হয় ॥

সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস সহজে হয় না। এই শ্রদ্ধা যাহার হয় সে ত স্বাভাবিক ভাবেই সাধনতৎপর হয়। শ্রদ্ধা অভাবাত্মক বা নিষ্ক্রিয় ভাবমূলক (Negative বা Passive) নহে। কাজেই শ্রদ্ধা আসিলেই অন্যান্য ভাব স্বাভাবিক ভাবেই উপস্থিত হয়। তখন মানুষের পক্ষে গতানুগতিকভাবে কোনক্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া দিনকাটান সম্ভব হয় না। এই শ্রদ্ধা সাধু সঙ্গে লাভ হয় আবার সাধু-সঙ্গের ফল ভাগবত শ্রবণেও পাওয়া যায়। কেন না ভাগবতে সাধু-দিগের জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ-লাভের ফল হয়। ভাগবত কোন বিশেষ গ্রন্থের নাম বলিয়া গ্রহণ না করিলেও চলে। তবে হিন্দুর পক্ষে ভাগবত অতি অপূর্ব্ব সামগ্রী পরম আদরের ধন। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ভাগবত-পাঠ হইতে শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি ও ভক্তি হইতে প্রেমের উদয় হয়। এমন সুনির্দ্দিষ্ট সাধন সংকেত সর্ব্বদা পাওয়া যায় না।

সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্ত্যে যদি শ্রদ্ধা হয়।
ভক্তি ফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥

সাধুসঙ্গের উপকারিতা বলিয়াই কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে অসৎসঙ্গ ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। বাস্তবিক অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে এ বিষয়ে একটু বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে প্রথম সাধনার্থীর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্ত্রী-সঙ্গী, অভক্ত ও অসাধু এই তিন অসৎসঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বৈষ্ণবের আচারের মধ্যে অসৎসঙ্গত্যাগ অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কৃপালু অকৃত দ্রোহ সত্য সার সম।
নির্দ্দোষ দান্ত মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম অনীহ স্থির বিজিত ষড়গুণ॥
মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥

অকিঞ্চন কৃষ্ণৈক শরণ অমানী মানদ করুণাপূর্ণ সর্ব্বোপকারক অদ্রোহী কৃপালু মিতভুক মিতবাক্ বৈষ্ণবের আবির্ভাবে কুলপবিত্র ও দেশ ধন্য হয়। এই আদর্শ বৈষ্ণব-চরিত্র সমুদায় বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে সহজসুলভ না হইলেও ইহার অনেক প্রভাব সাধারণ বৈষ্ণব-চরিত্রেও সর্ব্বত্র প্রতিভাত হয়। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতার বীজ কোন ভাগ্যবান প্রাপ্ত হইলেও অতিযত্নের সহিত তাহা রোপণ করিতে হয় এবং শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল তাহার মূলে সেচন করিতে হয়। এই ভক্তিলতা কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করিলেও সাবধানে রক্ষা করিতে হয়, কেন-না নানা অপরাধ (সেবাপরাধ, নামাপরাধ, বৈষ্ণব অপরাধ) এই লতা

ছিন্ন করিতে পারে ; আবার ভুক্তি মুক্তির বাঞ্ছা প্রভৃতি উপশাখা উদ্গত হইলেও যেমন বিপদের কথা, তেমনি আচারানুষ্ঠানানুরাগ লাভ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উপশাখাও লতার প্রাণান্ত করে। এই কারণে নিত্য শ্রবণ, কীর্ত্তন, জল সিঞ্চন করিতে হয়। মূল লতা বাড়িয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হয় এবং কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষের প্রেমফল আস্বাদন করিবার সুযোগ হয়। এই প্রেমই পরমপুরুষার্থ, পঞ্চমপুরুষার্থ এবং ইহার নিকট চতুর্ব্বর্গ ফল অতি তুচ্ছ।

শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন,

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সঙ্গ স্ততোঽথ ভজন ক্রিয়া।
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমা ভ্যদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎক্রমঃ॥

প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, পরে ভজন, ভজনের ফল অনর্থ নিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে রুচি, রুচি হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভাব, ভাব হইতে প্রেমের উদয় হয়। এই যে সাধন পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহা যেমন তত্ত্বের দিক হইতে সত্য ও সুন্দর, তেমনি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতারও উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সময়ে সময়ে ভগবানের নাম লইতে প্রাণ চায় বটে, কিন্তু নিষ্ঠাও নাই, রুচিও নাই তাই জীবনে কোন স্থায়ী ভাবের প্রতিষ্ঠা হইল না এমনি ভাবে কত জীবনই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। বৈধী ভক্তিসাধনের যে সংকেত ও প্রণালী চরিতামৃতে ও অন্যান্য বৈষ্ণব-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা যেমন সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিক এবং সুসঙ্গত তেমনি অতি অপূর্ব্ব ও মনোরম। রাগাত্মিকা ভক্তি সাধনের চরমনিগূঢ়তত্ত্ব আলোচনার বিষয় নহে, প্রথম প্রবেশদ্বারের যেসকল সংকেত রহিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন॥

গাঢ় তৃষ্ণা ও আবিষ্টতা লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে। এই গাঢ় তৃষ্ণা ও আবিষ্টতা লাভের জন্য সাধনভক্তির পঞ্চসাধন পথ অবলম্বন করিতে হইবে।

সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তের শ্রদ্ধায় সেবন॥

এই পঞ্চসাধনের যে কোনটার "স্বল্প" হইলেও "কৃষ্ণ প্রেমোদয়" হয়। ইহার মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের কথা সকল অবস্থাতেই বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে। এই নামকীর্ত্তনের ফলও আশ্চর্য্য, তাহা এখনও আমরা দেখিতেছি। ভগবানের নাম নিয়ে যে অকপটে একান্তে পড়ে থাকে সে আর খালি হাতে শূন্য প্রাণে কখনও ফিরে না।

এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥

এই নাম একবার মাত্র কীর্ত্তন করিলে সকল পাপ দূর হইয়া যায়।

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য।
তরণিরিব তিমির জলধের্জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

এই অখিলপাপ দূরকারী নাম কিরূপে কীর্ত্তন করিতে হইবে, সেই বিষয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তদিগকে বলিয়াছেন,

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণ যেমন কাহাকেও বাধা দেয় না, ব্যথা দেয় না, কিন্তু সকল বাধা ও ব্যথা বুক পাতিয়া লয়, তেমনি তৃণের মত নিজেকে নত করিতে হইবে। আত্মাভিমান একটুতেই ক্ষুব্ধ হয়, অল্পতেই অস্থির হইয়া পড়ি, এই

আমাদের স্বভাব। বৃক্ষের মত সব সহিষ্ণু হইতে হইবে। যে ডাল কাটে তাকেও ফল দেয়, ছায়া দেয়, আশ্রয় দেয়, তেমনি যে আঘাত করিবে তাকেও ছায়া ও আশ্রয় দিতে হইবে। সকল আঘাত, সকল রৌদ্র-বৃষ্টি ঝড় ঝঞ্ঝা কুজ্ঝটিকা শীতাতপ সহ্য করিয়া, ফল ও ছায়া দিতে হইবে। একটু ব্যর্থতার রৌদ্র, একটু দরিদ্রতার ঝড়, একটু মনোমালিন্যের কুজ্ঝটিকা আসিলে অস্থির হইয়া পড়ি, সহিষ্ণু হইতে পারি কই? অথচ এই বিশ্বের দেবতা যিনি, আমার অন্তরতম পরম প্রিয়তম প্রাণেশ্বর যিনি, তিনি কিন্তু সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন বলিয়াই আমার জীবন সার্থক ও পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, নহিলে আমার দাঁড়াইবার স্থান থাকিত না। তারপর ঐ আমার মান গেল, আমাকে সম্মান করিল না, আমার ন্যায্য প্রাপ্য আমি পাইলাম না, এই ভাব সর্ব্বদাই আমাদের মধ্যে জাগরূক থাকে, সর্ব্বদা এই মানের আলেয়ার পশ্চাতেই ছুটিতেছি। এমন কি নিত্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গিয়াও, নিজ জন ও নিকটের জনের নিকটেও, এই মান বজায় রাখিতে ব্যস্ত হই এবং কোন ত্রুটি হইলেই ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ হই, সকলের চেয়ে আগে এই কথাটা অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে জাগে আমি কর্ত্তা, আমি জ্যেষ্ঠ, আমি পিতা, আমি স্বামী, আমি বড় আমাকে মানিল না। আবার অন্যকে মান দেওয়া সেও বড় কম কঠিন কাজ নয়। নিজের মানের প্রাপ্য ষোল আনা আদায় করিতে ব্যস্ত থাকিলেও, অন্যের মানের পাওনা একটুও স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করিতে পারি না। মান দেওয়া বলিতে গেলেই কিয়ৎপরিমাণে আপনাকে অনুদ্ধত হইতে হবে; আপনাকে নত করিতে হইবে, যথাযোগ্য শ্রদ্ধা দিবার মতো অবস্থায় আনিতে হইবে। অনেক শাস্ত্রে অনেক দেশের সাহিত্যে অমানী হইবার উপদেশ আছে, কিন্তু মানদ হইবে এই অপূর্ব্ব উপদেশ

বৈষ্ণব সাধনার বৈষ্ণব সাহিত্যের নিজস্ব। আবার এই রকম অবস্থাও ত কতকপরিমাণে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও প্রাণের সাধনঅনুকূল অবস্থা সূচনা করে, যেখানে সেইরূপ অনুকূল অবস্থার অভাব সেখানে উপায় কি? গোস্বামীগণ সেখানেও নাম কীর্ত্তন করিতেই উপদেশ দিয়াছেন আর নাম শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন। শ্রবণটা কীর্ত্তনের পূর্ব্বে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা শ্রবণ বলিলে অন্যের নামকীর্ত্তন বুঝাইবে, আমার বিমুখভাব ও শুষ্কতা থাকিলেও অন্যের প্রাণের উচ্ছ্বাস ও ভক্তিপ্রেমেভরানামকীর্ত্তন-শ্রবণে আমার প্রাণে ভাবের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা। ভাগবতে নারদ বলিতেছেন,

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা মনুগ্রহেনাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়ামেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয় শ্রবস্যঙ্গ মমা ভবদ্রুচি॥
ইত্থং শরৎ প্রাবৃষিকা বৃতু হরে বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলং।
সংকীর্ত্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভির্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্ম রজস্তমোপহা॥

"সেই মুনিগণ যে কৃষ্ণ কথা গান করিতেন প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত তাহা শুনিতে শুনিতে সেই ভগবানে আমার রুচি জন্মিল। এইরূপে শরৎ ও প্রাবৃটকালে মহাত্মা মুনিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্ত্যমান হরির অমল যশ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে শুনিতে শুনিতে আমাতে রজস্তমনাশিনী ভক্তির উদয় হইল।" আবার বিনা শ্রদ্ধায় শুনিতে শুনিতেও ভক্তের নামকীর্ত্তন শ্রবণে মহাপাপীর জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ভক্ত হরিদাস বেনাপোলের বনে যখন নাম-সাধনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্ম নাশ করিবার জন্য রামচন্দ্র খাঁন একটা বেশ্যা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিন রাত্রি, নাম জপ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে কাটিয়া গেল, সাধুসঙ্গের ফলে ও নামের প্রভাবে বেশ্যার জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি ॥"

ভক্ত হরিদাস নামজপকীর্ত্তনের ফল-সম্বন্ধে বলিতেছেন,

কেহ বলে নাম হইতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হইতে জীবের মোক্ষ হয় ॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজয়ে ॥
আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥

নামকীর্ত্তন শ্রবণ ও জপ ভক্তিপথের প্রধান সহায়, ধর্ম্মপথের অবলম্বন, দুর্ব্বলহৃদয়সাধনার্থীর একমাত্র সম্বল। নামের মহিমা শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ভক্তগণ যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন এমন আর কোথায়ও দেখা যায় না।

চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনং।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্ ॥
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্ম স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্ ॥

বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই নামের মহিমা কতভাবেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম নামিনঃ ॥
মধুরম্ মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং।
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্ ॥

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা।
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম॥

ভক্তগণ নাম স্মরণে কীর্ত্তনে ভাবে গদগদ হইয়া পড়েন, তাঁহারা নাম করিতেই, প্রিয়তমের নাম শ্রবণে গুণানুবাদে যেমন প্রেমিক হৃদয় ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে, তাঁহাদের সেইরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস হয়।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা॥
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥

এখন অন্তরঙ্গ সাধন ও গম্ভীরালীলার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিজ সাধনতত্ত্বের বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। ভজনসাধনহীন লোকের পক্ষে এই সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে যাওয়া এমন কি কোন কথা বলাও মূঢ়তা, ধৃষ্টতা মাত্র। দিনের পর দিন চলিয়া যায় কোনও দিন কি মনে হয় আজ ভগবানের নাম একবারও লই নাই এই অধন্য দিন আমার বৃথাই গেল।

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথ বন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥

নিষ্ঠা নাই, শ্রদ্ধা নাই, রুচি নাই, শুধু বাহিরের সৌজন্যের মতো ধর্ম্মের কথা বাগিয়ে পড়িয়া রহিল, এই অবস্থায় এই সকল নিগূঢ় সাধনের কথা আলোচনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সর্ব্ব ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত যে ভগবদ্ভক্তি তাহাতে নানাপ্রকার বিধি-ভক্তির, নানাপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ঈশ্বর ও আমি এই ভাবে ধারণা করিতে গেলেই উভয়ের মধ্যে দিগন্তবিস্তৃত ব্যবধান আসিয়া পড়ে। আমি দীন হীন ঈশ্বর করুণাময় পরিত্রাতা এই ভাবে ভজনা করিলে প্রেমভক্তির সাধন হয় না আর মধুর রস আস্বাদনেরও সুযোগ হয় না। তুমি আমার সকলের চেয়ে আপনার, আবার আমাকে না হলে তোমার চলে না, আমার দিকে তুমি চাহিয়া রহিয়াছ, আমার প্রেমভিখারী হইয়া অপেক্ষা করিতেছ, এই সাধননির্দ্দেশ শ্রীচৈতন্যের সাধনতত্ত্বের প্রথম কথা। এখন এই ভাবে ভজনের উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ব্রজের নির্ম্মল রাগ, ব্রজের গোপগোপীদিগের ভাব।

ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রস সার করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥

রাগমার্গে ভজন ব্রজের ভাবে মধুর রস আস্বাদন শ্রীচৈতন্যের সাধনতত্ত্বের দ্বিতীয় বিষয়। এই ব্রজগোপীগণের প্রেম বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ও অতি অপূর্ব্ব।

গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
কামপ্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়ে প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥

* * *

আত্ম-সুখ দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে সঙ্কেত বিহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সর্ব্ব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

* * *

আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত॥

এই গোপীভাব, গোপীপ্রেম বৈষ্ণবের পরম আদরের বস্তু, চরম সাধনার ধন। রাধাভাব, রাধাপ্রেম ও এই গোপীপ্রেম রত্নহার উজ্জ্বল মণি; কিন্তু সাধারণ বৈষ্ণবসাধক আপনাকে রাধাপ্রেমের অধিকারী রাধাভাবে ভাবাপন্ন মনে করা ধৃষ্টতা মনে করেন এবং এই রাধাভাব সর্ব্বোচ্চ সাধনার বস্তু বলিয়া ইহাকে সুদুর্ল্লভ মনে করেন। শ্রীচৈতন্য

এই রাধাপ্রেমে মগ্ন হইয়া, রাধাভাবে ভাবিত হইয়া স্বরূপ ও রামানন্দ রায়ের সহিত গম্ভীরায় মধুর রসের আস্বাদন করিতেন।

রাধা সহ ক্রীড়া রস বৃদ্ধির কারণ।
আর গোপীগণ সব রসোপকরণ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
তাহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ॥
সেই রাধার ভাব লৈয়া চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥

এই নাম ও প্রেম প্রচার শ্রীচৈতন্যের সাধনতত্ত্বের তৃতীয় বিষয়। রাধাপ্রেম কিভাবে সাধন করিতে হয়, রাধাপ্রেম কি অপূর্ব্ব বস্তু, তাহা তিনি আপন জীবনে আপনি "আচরিয়া" প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। সকল 'বেদবিধির ধর্ম্মকর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাগমার্গে ব্রজের ভাবে ভজনা শ্রীচৈতন্যের সাধনের চতুর্থ বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে সুখ অদর্শনে দুঃখ এ ভিন্ন অন্য সুখ দুঃখ নাই। শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি দেওয়া, সুখ দেওয়া একমাত্র লক্ষ্য; আমার সকল ইন্দ্রিয় কৃষ্ণসুখের কারণ এই দেহ মন তাঁহার সম্ভোগ সাধন, কোন কর্ম্মও নাই, কামনাও নাই এই গোপীভাব। ব্রজের ভাবে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের খেলার সাথী, ব্যথার ব্যথী, আমার উচ্ছিষ্ট ফলের প্রত্যাশী, আমার "বাধা" বহনকারী, আমার পায়ে ধরে মানভঞ্জনকারী, আমার নিজ জন। আমি না হলে তাঁর চলে না, মথুরায় কৃষ্ণ না হলে কংসবধ হয় না, বসুদেবের উদ্ধার হয় না, আর ব্রজে রাধা না হইলে চলে না, রাধার কাছে দাসখত লেখা রহিয়াছে ইহাই ব্রজের বিশেষত্ব। এই রাধাভাব মহাপ্রভু আপন জীবনে "আচরিয়া" অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে লইয়া নানা রসের আস্বাদন করিয়াছেন। এই তত্ত্ব সাধারণে আয়ত্ত করিতে

পারিবে না। বলিয়াই নামকীর্ত্তন প্রভৃতি সাধন ভক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেম উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধ ভক্তির করিয়ে লক্ষণ॥
অন্য পূজা অন্য বাঞ্ছা ছাড়ি, জ্ঞান ধর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
ভক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যদি এই মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

ভক্তি, মুক্তি, বাঞ্ছা শূন্য হইয়া আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন করিতে হইবে অন্য পূজা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান কিছু থাকিবে না। এই সাধনের প্রথম সংকেত। তারপরে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি যে কোন রসাশ্রয়ে ভজনা দ্বিতীয় সংকেত। শ্রীচৈতন্য মধুর রসের সাধনাকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়াছেন।

মধুর রসে কৃষ্ণ নিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদির গুণ যৈছে পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥

এই সকল রসের চরম সাধন কান্ত ভাবে সাধন। এই অতি

মধুর ও সুকঠিন সাধন শ্রীচৈতন্যের সাধনতন্ত্রের অতি নিগূঢ় তত্ত্ব। কান্ত ভাবে প্রত্যক্ষ ভজন মহাপ্রভু নিজের জীবনে সাধন করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের নিকট প্রকট করিয়াছিলেন। রসের সাধনা চরম সাধন হইলেও নিম্নাধিকারীর পক্ষে পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের মত। তাই "কৃষ্ণ প্রেম মহাধন" লাভ করিবার জন্য বিবিধ সাধন সংকেত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করেন উদয়॥

এই শ্রবণাদি কি ? চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তি সাধনের নব অঙ্গ

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্॥

আবার এই নব অঙ্গের মধ্যে সজাতীয়াশয়ের সহিত শ্রবণ কীর্ত্তন সাধুসঙ্গ ও ভাগবত পাঠ—চারি অঙ্গ শ্রেষ্ঠ।

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহুঅঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ॥

নিষ্ঠার সহিত যে কোন অঙ্গ সাধন করিলেই ভগবদ্‌প্রেম লাভ হয়। এমন সুনির্দ্দিষ্ট পৌর্ব্বাপর্য্যবিধিনির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালী আর কোথায়ও দেখা যায় না।

শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কান্তভাবে ভজন করিতেন বলিয়াই, জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে অমন মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। এই সকল পদে, যাহা ইহ সর্ব্বস্ব অন্তর্দ্দৃষ্টিশূন্য খোসা ভক্ষণকারীর নিকট রূপ বর্ণনা ও নায়ক নায়িকার শারীরিক সম্বন্ধের চিত্রাঙ্কন তাহা শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সাধন পথাবলম্বীদিগের নিকট মধুর রসের প্রেম সাধনার ভজন-গীতি ও পরম প্রিয়তমের নিকট আত্মনিবেদনের মধুর ঝঙ্কার। এই মধুর-

রসের সাধনমাধুর্য্য ও ভজনসৌন্দর্য্য বাঙ্গালার নিজস্ব সামগ্রী, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের পরম গৌরবের সামগ্রী। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় এই সাধন ভজন প্রচলিত ছিল। জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও রামানন্দ রায় এই সাধন পথাবলম্বী ছিলেন। ইঁহাদের সহিত মহাপ্রভুর সাধনের পার্থক্য এই যে, ইঁহারা কান্তভাবে ভজন করিয়া, মধুর রসের সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; নিজেরা মগ্ন হইয়াছিলেন, কৃতার্থ হইয়া ছিলেন, কিন্তু অন্যকে দিতে পারেন নাই। আর একটা ধারাবাহিক সাধনপ্রণালীও নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যাহা জীবনে লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার জীবনে তাহা অধিকতর পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি এই জগতের দুঃখী, তাপী, নরনারীর ব্যথায়, অক্ষমতায়, মূঢ়তায়, ব্যর্থতায় কাতর হইয়া অতি সহজ প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন এবং আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন এই ভজনের সংকেত। সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে তাঁহাকে উপলব্ধি করা, সকল ভোগে, সুখে, শরীর চেষ্টায়, দেহরক্ষায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা, অতি কঠিন সাধন। সব তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে, নিত্য অর্পণ করিতে হইবে। এই নিত্য অর্পণই মুক্তির পথ।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

কাম হউক, ক্রোধ হউক, ভয় হউক, স্নেহ হউক, একতা হউক, সৌহৃদ্য হউক যে কোন ভাব হউক যদি হরিতে নিত্য অর্পণ করা যায় তাহা হইলে তন্ময়তা লাভ হয়। নিত্য সম্বন্ধই তন্ময়তার মূল। আবার সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে তাঁহাকে উপলব্ধি করা কি দুরূহ ব্যাপার। স্বর্গের দেবতা আমার আস্তাকুঁড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমার নিভৃত কাম-

কামনার মূলেও তিনি আছেন, যেদিন দেখিতে পাইব সেদিন আমার অন্তর বাহির আলোকিত ও পবিত্র হইয়া উঠিবে। সকল পূতিগন্ধ দূর হইয়া যাইবে। এই যে প্রেমভক্তি সাধন ইহাতে পাপবোধ, অনুতাপ, অনুশোচনার নামমাত্র নাই। পাপাচারে, পাপচিন্তায় মন প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানে বা যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥

এই প্রেম সাধনায় সুখ ভোগ কামনা প্রভৃতি নূতন আকার ধারণ করে, অন্তর্দৃষ্টি দূরান্ত প্রসারিত হয়, ক্রমে পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ও পঞ্চ অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানকে আস্বাদন করা যায়। ক্রমে শ্রীমতীর মত বলা যায় "বন্ধুর সর্ব্বাঙ্গ লাগি কান্দে সর্ব্ব অঙ্গ মোর।" সুতরাং শ্রীচৈতন্যের সাধনপ্রণালীতে কেবল মাত্র মধুর রসের সাধন নহে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের কান্তভাবে ভজন প্রণালীও নহে; এই সকল সাধনের মূলতত্ত্ব পল্লবিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের সাধনপ্রণালীতে অন্তর্নিহিত হইয়া এই বৈষ্ণব সাধনা অধিকারী ভেদে সকল নরনারীর আশ্রয়স্থল হইয়া রহিয়াছে। ইহাই শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব সাধনার বিশেষত্ব। ঘটে ঘটে নারায়ণ নিত্যলীলা করিতেছেন, সেই লীলাময় হরিকে ভালবাসি ইচ্ছা হয়, তাঁর সঙ্গে নিত্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, তিনি আমার ঘরকন্নার সাথী হউন, আমার সখা, ব্যথার ব্যথী হইয়া কাছে কাছে থাকুন। এ জীবনে তাঁহাকে তেমন করিয়া কাছে পাইলাম না, পাইব কি না কে জানে, কিন্তু সকল ঘটে যে তিনি রহিয়াছেন। নারায়ণ স্বং সর্ব্ব দেহিনামাত্মা, অখিল লোক সাক্ষী

আর কাহাকেও ঘৃণা করা চলে না, ব্যথা দেওয়া যায় না, উপেক্ষা করা যায় না, তাই মহাপ্রভু বিবিধ সাধনাঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া দীনহীন নিম্নাধিকারীর জন্য নামে রুচি ও জীবে দয়া এই দুই সাধনপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি দীনদুঃখী, কাঙ্গাল আমি, কি করিয়া দয়া করিব, কি করিয়া দুঃখ মোচন করিব, ব্যথা দূর করিব? কিছু না দিতে পারি দুঃখে দুঃখী হ'তে পার্ব্বো। চোখের জলে চোখের জল মিশাতে পার্ব্বো, আর কিছু না পারি দুটো মিষ্ট কথা বল্‌তে পার্ব্বো? সহানুভূতিতে প্রাণ পূর্ণ করে' সরল হৃদয়ে সকলের জন্য প্রাণ খুলিয়া রাখিতে পারিব। আমি যেমনই হই এই জীবে দয়ার সাধন করিলে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারিব। আর অন্য সাধন করিতে পারি না পারি দিনান্তে নিশান্তে তাঁর নাম স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ করিতে পারিলেই ক্রমে আমার কাছে দ্বার খুলিয়া যাইবে।

নদেশ নিয়ম স্তস্মিন্ ন কাল নিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নিলুব্ধকে॥

এই মহিমাময় নামকীর্ত্তনের দেশকাল নিয়ম নাই, কোন বিধি নিষেধ বিচার নাই। এই জগন্মঙ্গল হরি নাম গ্রহণেই মানুষ ক্রমে পবিত্র ও ধন্য হয়। বৈষ্ণবসাধনার অন্তরঙ্গ সাধন ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার এ জন্মে পাইলাম না, সাধুভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করুন, কুলদেবতা কৃপা করুন, ভক্ত বৈষ্ণবের চরণধূলি মাথায় পড়ুক, জীবনের বাকী কয়দিন যেন নামে রুচি ও জীবে দয়া বৈষ্ণব সাধনার এই সংকেত ধরিয়া যেন অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে পারি, হয়ত ভগবদ্ কৃপায় কোন দিন অন্তরঙ্গ সাধনদ্বারে উপনীত হইতে পারিব।

বৈষ্ণব মতের প্রভাব

শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম যখন প্রচার করিলেন তখন এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে নির্ম্মূল হয় নাই।

বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।
প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥
তর্ক-প্রধান বৌদ্ধ শাস্ত্র নব মতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥

এই বৌদ্ধমতের স্থায়ী পদচিহ্ন বাঙ্গালার সমাজে রহিয়া গিয়াছে। অদৃষ্ট কর্ম্মফল প্রভৃতি যে সকল কথা এখন সাধারণ বাঙ্গালীর মুখে সর্ব্বদা শোনা যায় এবং যাহা বাঙ্গালার আপামর সাধারণ নরনারীতে বিশ্বাস করেন এই অদৃষ্ট ও কর্ম্মফল বৌদ্ধধর্ম্মেরই নিদর্শন। কর্ম্মফল মানুষকে ওষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, এক পা এগিয়ে ফেলবার যো নাই; এই মারাত্মক মত ও বিশ্বাসের প্রভাবে বাঙ্গালার নরনারী অসাড় ও নিরাশ হয়ে পড়েছিল, যেন নাগপাশে বদ্ধ হয়ে মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল, বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ভগবানের কৃপা অহেতুক প্রেম ও জীবের নিত্য কল্যাণ কামনার কথা প্রচারিত হইলে সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। মানুষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কেবল আমার কর্ম্মফল আমার জীবনের পশ্চাতে

ছায়ার মত ঘুরিতেছে না, শ্রীভগবানের প্রেম আমার রক্ষা-কবচ হইয়া রহিয়াছে, তাহার দয়া আমার জীবনকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

আমি একা নহি অসহায় নহি এই পরম আশ্বাসবাণী ভীত অক্ষম মূঢ় সাধারণকে আশ্বস্ত ও বলশালী করিল। শঙ্করের মত যে পথে বল লাভের ও আশার কথা বলিতেছিল সে পথ দুর্গম ও সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য এবং নিঃসঙ্গ বলিয়া সংশয়দ্বিধাপূর্ণ এবং দুর্ব্বলের পক্ষে দুরতিক্রম্য। এই অভ্রভেদী শিখরে আরোহণ করা যেমন কঠিন আবার এখানে প্রাণের সকল আশা কামনাও পরিতৃপ্ত হয় না। শ্রীচৈতন্য সকলের জন্য সহজ সুলভ আশার ও আলোকের পথ নির্দ্দেশ করিলেন এবং "তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদী দার্শনিক পণ্ডিত" সকলের সংশয় ও সমস্যার সমাধান করিয়া প্রাণ জুড়ানো সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ব বস্তু উপস্থিত করিলেন। কেহ কেহ মনে করেন এবং সত্যরূপেই অনুমান করেন যে, বৌদ্ধদিগের অহিংসা পরমো ধর্ম্মই বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের জীবে দয়াতে পরিণত হইয়াছে। একথা সত্য হইলেও বৈষ্ণবের জীবে দয়ার মূল শ্রীভগবানের ঘটে ঘটে স্থিতি ও তাহাকে প্রীতি করার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই জীবে দয়া সাধনের ফলে আতিথ্য আশ্রিত বাৎসল্য অদ্রোহ ও সেবা বাঙ্গালার জন সমাজে সকল সম্প্রদায়ে এত সহজ সুলভ ও স্বাভাবিক হইয়াছে। বাঙ্গালার বিনয়নম্র ব্যবহার ও প্রেমিক হৃদয়ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ ও পরমোজ্জ্বল নিদর্শন। বাঙ্গলার সমস্ত নর-নারী কখনই বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই সত্য কিন্তু কেহই ইহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব হইতে দূরে থাকিতে পারেন নাই। সকল সম্প্রদায়ের নর নারীই সেবা ভক্তি ও ভগবদ্‌কৃপা নির্ভরশীলতা এই বৈষ্ণব সাধনা হইতেই লাভ করিয়াছেন।

বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচারের সময়ে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের কাল হইতে এদেশে

এক প্রকার মর্কট বৈরাগ্য প্রচারিত হইয়াছিল যাহা বৈরাগ্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারুক না পারুক সংসারে ধর্ম্ম সাধনের পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছিল এবং সাংসারিক নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যে মধুর রস আস্বাদন করিয়া রসস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ জানা যায় তাহা হইতেও দূরে রাখিয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বৈরাগ্য প্রচার করিল বটে, কিন্তু মধুর রসের ভজন ও রসাশ্রয়ে সাধনের কথা বলিতে গিয়া সংসারকে মধুময় করিয়া তুলিল। ভবরোগ, সংসারসাগর, সংসার কানন, ভবজলধি প্রভৃতি শব্দের ও ভাবের ছড়াছড়ি বৈষ্ণব সাহিত্যে সেই জন্যই পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য নিজে সন্ন্যাসী হইয়া, দেশে-বিদেশে ভারতের বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিলেও, গৃহে থাকিয়া সংসারে থাকিয়া নাম সাধন করিতে ভগবানে প্রীতি করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

হরি নামে যার চক্ষে বহে অশ্রুধারা।
সেই জন হয় মোর নয়নের তারা॥

এই নামের শক্তিতে এমন বিশ্বাসী ছিলেন যে সংসারের সকল অবস্থার লোককে এই নাম করিতে উপদেশ দিতেন। "ভৃগুবর নর মাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম"। যোগও চাই না, সাধনও চাই না, সমস্ত ছাড়িয়া যেন আমার রসনা কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চারণ করে। এই শিক্ষায় সংসারে থাকিয়া গৃহধর্ম্ম করিতে করিতেও ভগবদ্‌কৃপালাভ সম্ভব এই আশ্বাসে মানুষ সংসারকে বিভীষিকাময় মনে করিতে ক্ষান্ত হইল। যাগযজ্ঞ তপ, দান, ব্রত-নিয়ম, নানা অনুষ্ঠানকে তুচ্ছ করিয়া, পশ্চাতে ফেলিয়া নামসাধন শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া কীর্ত্তিত হওয়ায় যাজনজীবী ব্রাহ্মণগণের অন্নলোপের উপক্রম হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারে ব্রাহ্মণগণের শুধু উপার্জ্জনের কথা গেল তাহা নহে, সমাজে সম্মান যাইবার গতিক হইল। ব্রাহ্মণগণ চিরদিন শিক্ষা দিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণই সকল

বর্ণের গুরু ও পূজ্য। গৌরাঙ্গ বলিলেন, যে ভক্ত সেই পূজ্য। ভক্ত যদি চণ্ডাল হয় তবু সে অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরি ভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

ব্রাহ্মণ সমাজে কাজেই মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। স্বার্থ লইয়া যেখানে টানাটানি, সেখানে বিরোধ প্রতিবাদ অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী। আবার ব্রাহ্মণেতর জাতি যখন দীক্ষাগুরুর আসনে বসিলেন, তখন দেশের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থ, তাঁহার নিকট বলরাম মিশ্র, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী অদ্বিতীয় মহাপণ্ডিত, তিনি ঠাকুরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সমাজে বিশেষভাবে উৎপীড়িত হইলেন। ঝড়ু ঠাকুর ভুঁইমালি, বৈষ্ণব হইয়া সকলের পূজ্য হইলেন। ব্রাহ্মণদিগের ঠাকুর গোঁসাই উপাধি অতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও বৈষ্ণব হইয়া গ্রহণ করিলেন। ঝড়ু ঠাকুরের প্রসাদ ভুঁইমালির প্রসাদ—ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বৈষ্ণবেরা ভক্তির সহিত গ্রহণ করিলেন। মুচি যবন যে কেহ হরিভক্ত সেই পূজ্য। জাতি ভেদের মূলে কুঠারাঘাতের উপক্রম হইল। রুই দাস মুচি, তাঁহার নিকট এক রাণী মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। মুরারি দাস চামার, রাজার গুরু, ক্ষত্রিয় রাজারাণী এই মুরারি দাসের পাদোদক পান করিলেন। গোবর্দ্ধনে নাথজীর মন্দির-দ্বারে কানা নামে এক হাড়ি পরম ভক্ত ছিল। এই হাড়ি মন্দিরের ছিদ্র-পথে ঠাকুর দর্শন করিয়া আনন্দে মগ্ন হইত পুলকিত হইয়া চাহিয়া থাকিত। গোঁসাইরা ছিদ্রপথ বন্ধ করিলেন, ঠাকুর স্বপ্নযোগে গোঁসাইকে বলিলেন, তোমার পূজা-অর্চ্চনা অপেক্ষা ঐ হাড়ির "পুলকভরা দরশন" আমার অতি প্রিয়, এই হাড়ির দর্শনের সুযোগ করিয়া দাও। গোঁসাই ঠাকুরেরা হাড়ির স্তুতিনতি করিয়া

দেবদর্শনে লইয়া আসিলেন। সাধনা কসাই—পরম ভক্ত, এই সাধনার চরণ ধূলি, পাদোদক জগন্নাথের পাণ্ডাগণ গ্রহণ করিলেন। এমনি ভাবে নানাশ্রেণীর অতি অস্পৃশ্য নীচ জাতীয় হিন্দুরাও বৈষ্ণব ভক্ত হইয়া সমাজে পরম পূজ্য হইলেন। শ্রীচৈতন্য নিজ সম্প্রদায়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ও তাঁহার সাধন-তত্ত্বের অল্প ব্যবধানে অবোধের পতন ও ব্যভিচার অসম্ভব নহে জানিয়াই—"প্রকৃতি সম্ভাষণ"-বিষয়ে অত কঠোর নিয়ম করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার স্ত্রী-ভক্তের সংখ্যা কম নহে। সাড়ে তিন মহাপাত্রের মধ্যে মাধবী এক জন। স্ত্রী শূদ্র অস্পৃশ্য নীচ সকলে এই ধর্ম্মের আশ্রয়ে পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ স্ত্রী-জাতির উপর যেরূপ বিষদৃষ্টি থাকে, তাহাতে স্ত্রীলোকের পক্ষে জ্ঞানে ধর্ম্মে পবিত্রতায় বাড়িয়া উঠাও অসম্ভব, ধর্ম্ম সাধন করিয়া জীবন ধন্য করাও দুরূহ আবার এই জন্যই সহধর্ম্মিণী হওয়াও সম্ভব হয় না। "কামিনী কাঞ্চন" প্রভৃতির উপর বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হইতে প্রেমিক সন্ন্যাসীর পর্য্যন্ত যেরূপ কৃপা কটাক্ষ, যেরূপ ঘৃণা ও বিষবৎ পরিত্যাগের উপদেশ, তাহাতে এই দেশে যে ভক্তিমতী সাধ্বী সেবা-পরায়ণা ও ধর্ম্মপ্রাণা নারীর সংখ্যা বিরল হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য। শ্রীচৈতন্যের পরে রমণীর সম্বন্ধে অমন অতিসতর্কতা ও বিষবৎ পরিত্যাগের উপদেশ আর কোন বৈষ্ণবাচার্য্য দেন নাই। বৈষ্ণব সমাজে রমণীর যথেষ্ট আদর ও গৌরব দেখা যায়। অনেক রমণী গুরু হইয়া দীক্ষা দিয়াছেন; অনেক মহান্ত বৈষ্ণবকে উপদেশ ও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছেন। অনেকে সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করিয়া পদাবলী সাহিত্যের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন। মধুর রস সাধনের ফলে সংসারের সকল সম্বন্ধ মধুময় হইয়াছে। যাহা মায়ার বন্ধন ছিল এখন তাহা মুক্তির দ্বার হইল। কেননা সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই সেই রসস্বরূপের রসা-

স্বাদন করা যায়। ইহার ফলে বাঙ্গালার গার্হস্থ্যজীবন পবিত্র ও মধুময় হইয়াছে। শাক্ত প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়েও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হওয়াতে সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সাধনা নূতন আকার ধারণ করিল। বৈষ্ণবগণের প্রেম ভক্তির ভাব লইয়া শাক্তগণ সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। রামপ্রসাদের গীতগুলি এত মধুর, এত প্রাণ জুড়ানো, কারণ এই সমুদয় গীতই বৈষ্ণব ভাবে ভাবিত, বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে গৃহীত প্রেম ভক্তির ভাবে পরিপূর্ণ এবং ভক্তি সাধনের অন্তর্গত। এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব বাঙ্গালার কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই অতিক্রম করিতে পারে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে কালী পূজা করিতে করিতে রামকৃষ্ণ যে অপূর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিলেন, বৈদান্তিক ধর্ম্মের ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রেম-ভক্তির কথা প্রচার করিলেন, ইহাও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। বৈষ্ণবের অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তির কথাই তিনি নানা প্রকারে বলিয়া গেলেন। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যে সকল তত্ত্ববস্তু ও সাধনা প্রকাশিত হইয়াছে, মানব-জ্ঞান ও চিন্তা যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা যে সকল অপূর্ব্ব সামগ্রী লাভ করিয়াছে, ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে জীব ও জগতের সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে—আচার্য্যগণ আধ্যাত্মিক জগতের কত অভ্যন্তরে গিয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, গৌরবে পুলকে প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠে। পৃথিবীর আর কোনও দেশে এমন ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তত্ত্বজ্ঞানের দিক হইতে এত অগ্রসর হইতে পারে নাই। বেদান্ত ধর্ম্মে জ্ঞানের দিক্ হইতে অপূর্ব্ব বস্তু, জগতের জ্ঞান ও চিন্তা এই তটভূমিতে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিতেছে। বহু শতাব্দী চলিয়া গেল আজও তত্ত্বজ্ঞানের দিক হইতে কেহই ইহাকে অতিক্রম ও অস্বীকার করিতে পারিল না। তেমনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম তত্ত্বের দিক হইতে বেদান্ত ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত

হইয়াও আরও অগ্রসর হইয়া সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ও জীবের সহিত নিত্য মধুর সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়া, এক ও অনেকের মধ্যে অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব সুধাধারা, শ্রান্ত-ক্লান্ত-তৃষিত-তাপিত নরনারীর জন্য আনিয়া দিল। এই মধুর সাধন, রসাশ্রয়ে ভজন, মধুব প্রেম সাধন ভজন ধর্ম্মসাধনার ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব মনোরম সামগ্রী। অন্যান্য দেশে ভক্ত সাধকেরা সাধন করিতে করিতে এই তত্ত্বের আভাস পাইয়াই উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, প্রকট করিতে পারেন নাই, সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই স্বর্গের সামগ্রী এই মধুর বস্তু নিজে আস্বাদন করিলেন, আর জনসাধারণের জন্য সহজ সরল স্বাভাবিক ভাবে উপস্থিত করিলেন। ভক্তির ধর্ম্ম আর কোনও দেশে এতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বৈষ্ণবধর্ম্ম তত্ত্ব ও সাধনার দিক হইতে জগতে অদ্যাপি অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে বেদান্ত ধর্ম্মের সুসমাচার যেমন প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেখানকার পণ্ডিতগণকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছে, বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব তেমনি পাশ্চাত্য জগতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইলে তাঁহারা আরও মুগ্ধ হইবেন এবং দেখিবেন কেবল জ্ঞানের অভ্রভেদী শিখরে আরোহণ নহে, ভক্তি প্রেমের মন্দাকিনী-ধারা নরনারীর সকল তৃষা সকল শ্রান্তি দূর করিবার জন্য কেমন প্রবাহিত হইয়া রহিয়াছে। এই ধর্ম্মতত্ত্ব মানুষকে কেমন সহনশীল আশান্বিত সেবাপরায়ণ ও ভগবদেকশরণ ও নির্ভরশীল করিয়াছে। প্রেমের সাধন কি অপূর্ব্ব সাধন। প্রেম দিয়া প্রেমময় প্রেমভিখারী নারায়ণের সেবা, আবার প্রেমেই নরনারায়ণের সেবা। স্বর্গে মর্ত্তে প্রেমের খেলা, প্রেমের লীলা।

"আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে ?
সে সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।"

তৃতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনার সূচনা।

বর্ত্তমান সাহিত্যচর্চ্চার ফলে বৈষ্ণব সাহিত্যের অনেক সামগ্রী সাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এখনও অনেক অপূর্ব্ব মনোরম পদ, কীর্ত্তন, গাথা, কবিতা প্রভৃতি জন সাধারণের চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে। যাহা পাইয়াছি তাহারই সৌন্দর্য্যও সরসতা দেখিয়া তৃপ্ত ও গৌরবান্বিত হইতেছি। প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য যেমন অলৌকিক বিশ্ব প্রেমের ও মধুর ভক্তি ধর্ম্মের ভাবোচ্ছ্বাসে সকল প্রকার অতীতের শাসন, ভবিষ্যতের ভয়, বর্ত্তমানের বিধি, নিষেধ ও ভেদকে পরাজিত করিয়া মনুষ্যত্বকে সুন্দর সহজভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, তেমনি বৈষ্ণব সাহিত্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে সকল প্রকার দীনতা, সকল প্রকার অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ও সুমধুর সরসতায় বিকশিত করিয়া তুলিল। বৈষ্ণব কবির প্রেমের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের ভিতরে সাহিত্য সার্থকতা লাভ করিল। এখন বৈষ্ণব সাহিত্য বলিতে আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার শ্রেণী-বিভাগ দুই প্রকারে করা যাইতে পারে। প্রথম বিষয়-অনুযায়ী, দ্বিতীয় কাল-অনুযায়ী। এখনও আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হয় নাই, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যের কাল নির্ণয় দূরে থাকুক, সমুদয় সামগ্রীই ত এখনও আমাদের কাছে উপস্থিত হয় নাই; আর যাহা উপস্থিত হইয়াছে তাহারও বিশদ্ আলোচনা হয় নাই। দীনেশবাবু তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে যাহা সূচনা করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী সাহিত্য সাধনার দ্বারা পরিপূর্ণ হইলে কাল নির্ণয় ও অন্যান্য আলোচনার সময় আসিবে। এই সকল

আলোচনার পূর্ব্বে, যেখানে যত পদ কীর্ত্তন তালপাতের পুঁথিতে মুমূর্ষু অবস্থায় আছে, কীটদষ্ট হইয়া যাহার হয়ত অনেক চলিয়া গিয়াছে—এই গুলিকে মুদ্রিত প্রকাশিত করিয়া রক্ষা করা উচিত। সাহিত্য পরিষদ এই দিকে দৃষ্টি করিলে, দেশের ও সাহিত্যের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, লুপ্ত রত্নের পুনরুদ্ধার হইবে।

বিষয় অনুযায়ী বিভাগ করিলে, বৈষ্ণব সাহিত্য ১। পদাবলী ২। চরিতাখ্যান ৩। অনুবাদ ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী, এই তিন পর্য্যায়ে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম পর্য্যায়ের পদাবলী সাহিত্যেরই কিয়দংশ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, অতি সামান্য তাঁহার জীবদ্দশায় রচিত হইয়াছিল, আর অন্যান্য সমুদয়ই তাঁহার তিরোভাবের পরে রচিত হইয়াছিল। এই পদাবলী সাহিত্য বাঙ্গালার অপূর্ব্ব সামগ্রী, এই ক্ষেত্রে অদ্যাপি বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই পদাবলী আলোচনা করিয়া পূর্ব্বে বিদ্যাপতিকে আদি কবি বলিব না চণ্ডীদাসকে আদি কবি বলিব—এ বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক। বৈষ্ণব পদকর্ত্তা দিগের মধ্যে ইঁহারা যেমন শক্তিশালী, তেমনি নূতন পথের প্রবর্ত্তক আবার ইঁহারা উভয়েই শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইঁহাদের পদ বৈষ্ণব সাধনার আদি হইয়া রহিয়াছে এখনও বৈষ্ণব সাধকেরা এই সকল পদকীর্ত্তন করিয়া নিত্য উপাসনা করেন। এই চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদ রাত্রিদিন মহাপ্রভুর নিকট গীত হইত, তিনি এই সকল পদ শুনিয়া ভাবে বিভোর হইতেন। চরিতামৃতে দেখা যায়—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিই পদাবলীর প্রবর্ত্তক। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের মহিমাময় দেবচরিত্রের প্রভাব ও অলৌকিক প্রেমোন্মাদ ও লীলারসের সংস্পর্শ এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধকজীবনের প্রভাব ইঁহারা প্রাপ্ত হন নাই, অথচ পদাবলী সাহিত্যে ইঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরবর্ত্তী যুগের প্রেমোচ্ছ্বাস ও ভাববিলাস ইহাদের গীতি কবিতায় মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব ভক্তের আকাঙ্ক্ষা ও বৈষ্ণব সাধকের সকল সাধনতত্ত্ব যেন এই পদাবলীর ভিতরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সাধনা এই পদাবলীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সাধক মহাজনদিগের সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল ব্যাকুলতা, সকল আশা বিশ্বাস, এই পদাবলীতে ব্যাখ্যাত ও কীর্ত্তিত হওয়াতে পদাবলী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বিদ্যপতি ও চণ্ডীদাসের পৌর্ব্বাপর্য্য লইয়া যে এত বিচার বিতর্ক হয়, তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর স্বদেশীয় আত্মাভিমানও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। চণ্ডীদাস বাঙ্গালার কবি, খাঁটী বাঙ্গালী; কাজেই চণ্ডীদাসকে আদি কবি বলিতে পারিলে স্বভাবতঃই বাঙ্গালীব প্রাণ জুড়ায়। এই মধুর সাধনার অমরকবি জয়দেব বাঙ্গালী কবি, রামানন্দ রায় বাঙ্গালী, বিল্বমঙ্গল বাঙ্গালী, সুতরাং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও বাঙ্গালার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের জন্মকাল সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই। শ্রীচৈতন্য-যুগের ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই, তথাপি তাঁহার আবির্ভাব প্রভৃতির কালনির্ণয় হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে দেহ ধারণ করেন এবং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লীলাবসান হয়। এই সময়ের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় বিদ্যাপতির জন্মকাল-সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিয়া শেষে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে

বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; দীনেশ বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বেই তিনি দেহ ত্যাগ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হয়ত তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষদ হইতে কিছু দিন পূর্ব্বে বিদ্যাপতির পদাবলীর যে নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ১২৭২ শকাব্দা জন্মকাল ও ১৩৬০ শকাব্দা মৃত্যুর কাল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের রচিত সাঙ্কেতিক পদপূর্ণ কবিতা দেখিয়া রমণীমোহন মল্লিক ও অন্য কেহ কেহ চণ্ডীদাস ১৩২৫ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করেন। সাহিত্য পরিষদ হইতে কিছু দিন পূর্ব্বে যে চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও জন্মকাল সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অথবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই আজ পর্য্যন্ত অনুমান। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েই সমসাময়িক। কেবল জন্মধারণ নহে, কবিত্ব-সাধনায়ও সমসাময়িক। সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে কেহ ২।৪ বৎসর পূর্ব্বে জন্মধারণ কেহ ৫।৭ বৎসর পরে দেহত্যাগ করিলেও ইঁহারা উভয়ে সাহিত্যের হিসাবে সম্পূর্ণ সমসাময়িক। তবে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া একটা সাধারণ ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। কিন্তু পদ রচনা কে কখন আরম্ভ করেন, তাহার নির্ণয় নাই সুতরাং সাহিত্যের সমসাময়িকতা-সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই সম্প্রতি উঠিতে পারে না। এই দুই কবির জীবনী ও অন্যান্য বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া অন্য প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের জীবনকাহিনী।

দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত জরাইল পরগণায় বিসপী গ্রাম। এই গ্রামে বিদ্যাপতি ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিবাস। বিদ্যাপতি কখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা স্থির নির্ণয় হয় নাই, তবে কতক অনুমান করিয়া স্থির করা যায়। রাজা শিব সিংহের তিনি সমসাময়িক ছিলেন। সুতরাং শিব সিংহের জন্মকাল ধরিয়া তাঁহার জন্মকাল নির্ণয় করা যায়। প্রবাদ আছে, বিদ্যাপতি শিব সিংহ অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ছিলেন, এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া অনুমান করা যায়, বিদ্যাপতি ২৪১ লং সং অর্থাৎ ১২৭২ শকাব্দা ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন ও বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিদর্শন তাঁহার রচিত গ্রন্থাদিতে সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। সেকালে মিথিলা বিদ্যানুশীলনের প্রধান স্থান ছিল। বিদ্যাপতি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই রাজার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শেষে বিবিধ সুমধুর গীত রচনা করিয়া রাজা ও রাণীর মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং রাজার প্রিয়পাত্রও হইয়াছিলেন। রাজা শিব সিংহের সহিত বিদ্যাপতি ঠাকুরের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। শিব সিংহের মৃত্যুর পরে বিদ্যাপতি ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন। অনুমান ৩২৯ লং সং কার্ত্তিক মাস শুক্ল ত্রয়োদশীতে বাজিতপুরে গঙ্গাতীরে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি প্রায় ৯০ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবি-প্রতিভা সমুজ্জ্বল ছিল। ইহা ভিন্ন বিদ্যাপতির জীবনের আর কোন কাহিনী অদ্যাপি অবগত হওয়া যায় নাই। বিদ্যা-

পতির পদাবলীতে অথবা পদের ভনিতায় তাঁহার কোন আত্ম-পরিচয় দেখা যায় না। রাজারাণীর নাম ভিন্ন নিজের নাম ও স্থানে স্থানে উপাধি, পদের ভনিতায় দেখা যায়। বিদ্যাপতির অনেকগুলি উপাধির প্রমাণ পাওয়া যায়। কবিশেখর কবিরঞ্জন কবিকণ্ঠহার কবিরতন দশাবধান অভিনব জয়দেব ও পঞ্চানন—এই সকল তাঁহার বদাবলীর ভনিতায় পাওয়া যায়। কবিশেখর উপাধি বাঙ্গালার পদাবলীতে গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে শেখর কিম্বা কবিশেখর নামে একজন বৈষ্ণব কবি ছিলেন, তাঁহার রচিত পদ ও বিদ্যাপতির কবিশেখর ভনিতাযুক্ত পদ মিশিয়া গিয়াছে। রচনায় ভাষায় ভাবে ও কাব্যাংশে যে সামান্য পার্থক্য আছে তাহা লক্ষিত হয় নাই।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণ পণ্ডিত ও কেহ কেহ প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পণ্ডিত গ্রিয়ারসন প্রভৃতি বিদ্যাপতির যে বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখনও সর্ব্ব-বাদী-সম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয় নাই। বিদাপতির পিতা গণপতি ঠাকুর—শিব সিংহের পিতার অগ্রজ রাজা গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষদিগের রচিত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ মিথিলায় প্রচলিত আছে। এই সকল গ্রন্থের অনেকগুলি অদ্যাপি প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত ও আদৃত হইয়া থাকে। এই পণ্ডিত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ রাজকার্য্যদক্ষ মনস্বী বংশে বাণীর বরপুত্র বিদ্যাপতি জন্ম গ্রহণ করিয়া এই বংশের অক্ষয় কীর্ত্তি চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির জীবনী-সম্বন্ধে অন্য যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার বার আনা রকমই অনুমান, কতকটা তবে বিশ্বাসযোগ্য অনুমানের উপর প্রতি-ষ্ঠিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে দীনেশবাবুর কথায় বলিতে হয় খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ পঞ্চদশ

শতাব্দীর, শেষ ভাগে তাঁহার জীবন শেষ হয় এই পর্য্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আর তিনি পণ্ডিত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং পণ্ডিত ও রাজা শিব সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহার সুমীমাংসা করা সহজ নহে। মিথিলায় তিনি শৈব কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এদেশে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়াই সকলে বিশ্বাস করে। শৈব হউন আর যাহাই হউন, তিনি ভক্তি-পথাবলম্বী ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার প্রাণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুকূলই ছিল। রামপ্রসাদ প্রভৃতি শাক্ত হইয়াও যেমন ভক্তিতে পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন তেমনি বিদ্যাপতি শৈব হইয়াও ভক্তি সাধনে অগ্রসর হইয়া বৈষ্ণবের ন্যায় পরমভক্ত হইয়াছিলেন। আর তাঁহার দীর্ঘজীবনে ধর্ম্ম মতের পরিবর্ত্তনও অসম্ভব নহে। যে মধুর সাধন ভক্তি ধর্ম্মের চরম ফল, তাহা সাধন-পথে অগ্রগামী মহাজনদিগের নিকট সুলভ হওয়াই স্বাভাবিক। এই সাধনের রসাস্বাদন না করিলে কাহারও পক্ষে "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর" "জনম অবধি হাম রূপ নিহারল নয়ন না তিরপিত ভেল" এই সকল পদ রচনা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে যত্নের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা—তাঁহার ধর্ম্মমতের একটী পরোক্ষ নিদর্শন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব, ভক্তিধর্ম্ম প্রতিপাদক বলিয়া এবং অপূর্ব্ব মধুর রস সাধনের ইঙ্গিত আছে বলিয়া। তত্ত্ব ও ভাবের দিক হইতে এই গ্রন্থের সারবত্তা কাহাকেও আকৃষ্ট না করিলে, অন্য কোন দিক হইতে কাহারও হৃদয় তেমন করিয়া অধিকার করিতে পারে না। বিদ্যাপতির প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরের কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা শৈব ছিলেন অতএব তিনি শৈব এ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন, বিসপীগ্রামের উত্তরে ভেড়বাগ্রামে বানেশ্বর মহাদেব

আছেন ; প্রবাদ আছে, বিদ্যাপতি সেই মহাদেবের উপাসনা করিতেন। চণ্ডীদাস ত বিশালাক্ষীর পূজক ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণব হওয়ার কোন বাধা হয় নাই। রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের কালীর পূজক ছিলেন, কিন্তু সাধনবলে তিনি পরমভক্ত ও বৈষ্ণবসাধক মহাজনের পর্য্যায়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সাধন-পথে অগ্রসর হইয়া তিনি শৈব শাক্ত বৈষ্ণব বৈদান্তিক প্রভৃতি সকল ভেদাভেদের পরপারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কালীর পূজক ছিলেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে শাক্ত বলিয়া দাবী করে নাই। ভক্তি ধর্ম্ম সাধন পথে অগ্রসর হইলে অথবা ধর্ম্মসাধনপথে অগ্রসর হইলেই বৈষ্ণবধর্ম্মের পরম তত্ত্বের নিকট সহজে স্বাভাবিকভাবে সকলেই উপস্থিত হইয়া থাকেন। সেই উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিলে সকল ভেদ বুদ্ধি দূর হয়। সেই চরম বস্তু পরমতত্ত্ব লাভ হইলে শৈবও বৈষ্ণব হইয়া যায়, শাক্তও বৈষ্ণব হইয়া যায়। সে বস্তু বৈষ্ণবের নিজস্ব সামগ্রী হইলেও বৈষ্ণবের একার জন্য নহে। সকল পথই সেই মন্দির-দ্বারে লইয়া উপস্থিত করিয়াছে। আরও একটী পরোক্ষ প্রমাণ এবিষয়ে উপস্থিত করিয়া এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিব। বিদ্যাপতির শিবগীতের পদগুলি, নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, গ্রাম্য ও সাধারণ, তাঁহার কবি প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় তাহাতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন তাঁহার কবি প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি তাঁহার সমস্ত প্রাণ যেন এই পদাবলীর সুধা-লহরীর ভিতরে ঢালিয়া দিয়াছেন। এই বিদ্যাপতির কবিতা যাহা বাঙ্গালী ইহসর্ব্বস্ব বিকৃত-রুচি লেখকগণ মদন-মহোৎসবের সঙ্কীর্ত্তন বলিয়া মনে করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে পণ্ডিত গ্রিয়ারসন লিখিয়াছেন—

"I have grouped the songs into classes, according to the subject of which they treat ; one class, for instance, treating

of the first yearnings of the soul after God, another of the full possession of the soul by love for God, another of the estrangement of the soul and so on. To understand the allegory, it may be taken as a general rule that Radha represents the soul, the messenger or duti, the Evangelist or the mediator and Krishna of ourse the deity. The glowing stanzas of Bidyapati are read by the devout Hindu with as little of the baser part of human sensuousness as the song of Solomon is by the Christian priest" এই বৈষ্ণব পদাবলী বিদ্যাপতির প্রাণের জিনিস বলিয়াই এমন স্বাভাবিকভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব বস্তুর সুমধুর প্রকাশ ও শব্দ-লালিত্য তরলগতি ও উপমার সৌন্দর্য্য এবং ভাব মাধুর্য্য উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। "তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না শৈব ছিলেন" নগেন্দ্রবাবুর এই সিদ্ধান্তের কোন অকাট্য প্রমাণ নাই। তিনি তাঁহার গ্রন্থে বিদ্যাপতি-রচিত যে অপূর্ব্ব শক্তি-স্তোত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই স্তোত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে শাক্ত বলিলেও বলিতে পারিতেন।

বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের রাণী "লখিমা দেবী"র প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া একটী প্রবাদ আছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় মিথিলায় প্রচলিত নাই বলিয়া এই প্রবাদ অমূলক সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রবাদ সত্য মনে করিলেই যে তাঁহার পক্ষে শিব সিংহের সভাপণ্ডিত হওয়া বিপজ্জনক বা অসম্ভব মনে করিতে হইবে এমন কোন কারণ নাই। বিদ্যাপতির এই সকল মধুর পদ রাজারাণীর চিত্ত-বিনোদন ও অবসর-যাপনের জন্য অন্তঃপুরে কলাবিদ্যা-নিপুণা কেটীরা গান করিত। স্বানুভূতিতে উজ্জ্বল সত্যরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলে আত্মজীবনে

সত্যরূপে উপস্থিত না হইলে কোন কবির পক্ষেই এইরূপ অপূর্ব্ব মধুর পদ রচনা সম্ভব নহে। তাঁহার স্ত্রীর কোন উল্লেখ কোথায়ও পাওয়া যায় না। অধিকন্তু ভৃত্য উগিনাকে প্রহারের প্রবাদ হইতে কিছু রণ-চণ্ডীরই আভাস পাওয়া যায়। রাজান্তঃপুরের কোন মর্ম্মগ্রাহিনী কাব্য সৌন্দর্য্যাভিজ্ঞা রূপবতী রমণীর প্রতি হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান কল্পনা করা নিতান্ত অমূলক মনে হয় না। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরস্পরের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন-সম্বন্ধে কতকগুলি পদ আছে। পদকল্পতরুতে এই সম্বন্ধে কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। নগেন্দ্র বাবু এই মিলন কবি কল্পনা বলিয়া মনে করেন, কেন না বিদ্যাপতি রাজপণ্ডিত, তাঁহার পক্ষে বঙ্গদেশে আসিয়া চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভব নহে। বিদ্যাপতি রাজপণ্ডিত হইলেও তিনি রাজার বন্ধুর ন্যায় এবং রাজাও গুণগ্রাহী ; এইরূপ স্থলে ভক্ত কবি চণ্ডীদাসের নাম শুনিয়া ও তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমসাধনার কাহিনী অবগত হইয়া, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উৎসুক হওয়াই আমরা স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ চণ্ডীদাসের জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিবার সময় উল্লেখ করিব। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, যাহা পরবর্ত্তী যুগের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ গোপাল ভাঁড়ের সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মুর্শিদাবাদের নবাব মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করিলে গোপাল ভাঁড় নবাবকে বাক্-চাতুরীতে তুষ্ট করিয়া মহারাজার কারা-মোচনের আদেশ করাইয়া লয়েন। রাজা শিবাসংহ যখন বন্দী হইয়া দিল্লীতে নীত হয়েন সেই সময় বিদ্যাপতি তাঁহার সহিত দিল্লীতে গমন করেন। ইহা হইতে আরও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, বিদ্যাপতির সহিত শিবসিংহের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা অনেকটা ব্যক্তিগত ছিল, কেবল

রাজা ও সভাপণ্ডিতের সম্বন্ধ নহে। দিল্লীশ্বর বিদ্যাপতির অসাধারণ কবি-প্রতিভার পরীক্ষা করিবার জন্য একটী সদ্যস্নাতা সুন্দরী যুবতীর বর্ণনা করিতে আদেশ করেন তদনুসারে "কামিনী করএ সিনানে" পদটী রচনা করেন, বিদ্যাপতি নবাবকে সন্তুষ্ট করিয়া শিবসিংহের মোচন প্রার্থনা করিলেন। বাদসাহ শিবসিংহকে বিদ্যাপতির কবিতার খাতিরেই মুক্তি দেন বলিয়া প্রবাদ আছে। "কামিনী করএ সিনানে"র অপেক্ষা ঐ জাতীয় "আজ মঝু শুভদিন ভেলা। কামিনী পেখন সনানক বেলা॥" "জাইত পেখলি নহাইলি গৌরী।" "নহাই উঠল তীরে রাইকমলমুখী সমুখে হেরল বরকান" এই সকল পদ আরও মধুর এবং সৌন্দর্য্য ও লালিত্যপূর্ণ।

বিদ্যাপতির পদাবলী ভিন্ন শিবগীতের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। তাঁহার রচিত যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার প্রতিভার কোন পরিচয় নাই, কীর্ত্তিলতা ও কীর্ত্তি-পতাকা প্রথম, পরে পুরুষ পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; পরে "লিখনা-বলী" শৈব "সর্ব্বস্বসার" "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী" ও "দানবাক্যাবলী" এই সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির রচিত কোন পদে তাঁহার আত্মপরিচয় পাওয়া যায় না, তাঁহার বংশধরেরা কেহ তাঁহার জীবনী-কাহিনী সংগ্রহ করিয়া রাখা দূরে থাকুক পদাবলীগুলিও সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করেন নাই, সুতরাং তাঁহার জীবনী-সমন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দূরে থাকুক, বিশ্বাসযোগ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণও সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার ও চণ্ডীদাসের আবির্ভাবের যুগ নির্ণয় হইয়াছে মাত্র; আর বিশেষ কিছু এখনও পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাপতির রচিত সমস্ত পদাবলী আমাদের হস্তগত হইয়াছে বলা যায় না। তাঁহার প্রপৌত্রের লিখিত বলিয়া যে তালপত্রের পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা

তাঁহার প্রপৌত্রের লিখিত হউক, বা না হউক, অথবা বংশধরদের কাহারও লিখিত হউক বা না হউক, এই পুঁথিখানি যে অতি প্রাচীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এই পুঁথির অনেক পত্র পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহা সিদ্ধান্ত করিলে অসঙ্গত হইবে না এবং কোন কোন অংশ নষ্ট হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে কত সুমধুর পদ লুপ্ত হইয়াছে তাহারই বা কে নির্ণয় করিবে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মহাশয় নেপাল হইতে তাল-পত্রে লিখিত বিদ্যাপতির পদাবলী লইয়া আসিয়াছেন। এই পুঁথির প্রাচীনতা তত নিঃসংশয় না হইলেও ইহাতে অনেক সুন্দর পদ আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-মহাশয়ের আবিষ্কৃত মিথিলার তালপত্রের পুঁথি ও শাস্ত্রীমহাশয়ের আনীত নেপালের তালপত্রের পুঁথি ইহার কোনটীই সম্পূর্ণ নহে এবং পাঠ-বিকৃতি শূন্যও নহে এবং লিপিপ্রমাদেরও অভাব নাই। উচ্চারণ-অনুরূপ বানান, ছন্দ রক্ষার জন্য বানান, মৈথিল রীতি অনুযায়ী বানান প্রভৃতির সঙ্গে লেখকের লিপিপ্রমাদ যুক্ত হইয়া যথেষ্ট যথেচ্ছাচারের সৃষ্টি করিয়াছে। এখন কোন্‌টী শুদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃত-পক্ষে বিদ্যাপতির স্বীয় লিপি-প্রণালী-অনুযায়ী তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত বিদ্যাপতি ষোলআনা বাঙ্গালা দেশেরই জিনিস; তাহাকে মেকি বলিয়া মিথিলায় ফেলিয়া গেলে, মিথিলার শুদ্ধ সংস্কৃত পদাবলীর উপর বাঙ্গালার তেমন লোলুপ দৃষ্টি পড়িবে না। বাঙ্গালার মেকি বিদ্যাপতির পদাবলীর সহিত বাঙ্গালীর অনেক সুখ দুঃখের স্মৃতি জড়িত, অনেক আশা কামনা সান্ত্বনা ও বেদনার মর্ম্মগাথায় পূর্ণ, অনেক দিনের বহু পরিচিত। অনেক বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষতঃ বৈষ্ণবের পক্ষে এই পদই সুধার ভাণ্ডার, ইহার ছন্দে ছন্দে হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, ইহারই প্রতিশব্দে মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে; তাঁহাদের পক্ষে বহু দিনের পরিচিত এই পদ ছাড়িয়া বিশুদ্ধ পদের রসগ্রহণ ও উপযুক্ত

মর্য্যাদা দান বড় সমস্যার বিষয়। নিরাপদেষু বলিয়া এতদিন চিঠি লিখিয়াছি যে এখন শুদ্ধ করিয়া নিরাপৎসু করিলে ভাল শোনায়ও না, আর লাগেও না ভাল। এই শুদ্ধ সম্বোধনে কারও মন উঠে না। এমনি করে' আমাদের নিত্য ব্যবহারের অনেক শব্দ ব্যাকরণ-দুষ্ট ও বিকৃত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু চিরপরিচিত বলিয়া সেই সকল বিকৃতিই আমাদের আপন হইয়া গিয়াছে। সাহিত্য পরিষদের সংস্করণে খাঁটী জিনিস আছে এবং অনেক দুষ্প্রাপ্য পদ সংগ্রহ আছে সত্য; কিন্তু চিরপরিচিত আবাল-বৃদ্ধ নরনারীর মর্ম্মস্পর্শকারী পদগুলির পরিশুদ্ধি অনেক স্থলে মনোরম না হইয়া শ্রুতিকঠোর হইয়াছে। "জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু" প্রভৃতি পদের একটী বর্ণের ব্যতিক্রম হইলেও চলে না; শুদ্ধ হউক আর অশুদ্ধ হউক, এই সকল পদ যেভাবে প্রচলিত সেইভাবেই আমাদের হৃদয় মনে একাধিপত্য করিতেছে। আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে মিশিয়া গিয়াছে।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাকুলিপুর থানার অধীন নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রায় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন, তখন তাঁহারই চেষ্টায় সাকুলিপুর থানার নাম নান্নুর থানা হইয়াছে। এখনও চণ্ডীদাসের জন্মকাল সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন এবং চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রভৃতির সুললিত পদাবলী পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেন।

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড। দশম পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্য তাঁহার সমসাময়িক সমুদয় ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ

করিয়াছেন। চণ্ডীদাস তাঁহার সমসাময়িক হইলে নিশ্চয় পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎ হইত এবং তাহার উল্লেখ চরিতামৃত বা কড়চায় থাকিত। চণ্ডীদাসেরও কোন পদে শ্রীচৈতন্যের নাম রূপ গুণ বর্ণনা নাই। সুতরাং চণ্ডীদাস চৈতন্যের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। তবে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক। চণ্ডীদাসের নাম শুনিয়া তাঁহার প্রেমসাধনার অপূর্ব্ব সমাচার শ্রবণ করিয়া বিদ্যা-পতি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন এবং পরস্পর আলাপপরিচয় করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই দেখাসাক্ষাৎ নীলরতন মুখোপাধ্যায়-মহাশয় উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভৌগলিক সমস্যাদ্বারা পদকল্পতরুর পদটী অপ্রামাণিক প্রমাণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। তাঁহারই ভাষায় বলি, পদকল্পতরুর সংগ্রাহকের মত ধার্ম্মিক লোক একটা বাজে কবিতা তাহার সংগ্রহে বিনাবিচারে স্থান দিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কেহ কেহ অন্যপক্ষে ইহাও অনুমান করেন যে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে যেসকল পদ রচনা করেন, তাহাতে প্রেমের গভীরতা ও আবেগের পূর্ণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এগুলি সম্পূর্ণ অনুমান মাত্র। যাঁহাদের জন্মকালই সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাঁহাদের কে কোন্ সময় কোন্ পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও নির্ণয় নাই; আবার কোন্ সনে পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহাও জানা নাই, এইরূপ স্থলে কাহার প্রভাব কাহার উপরে সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তবে বিদ্যাপতির চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা স্বাভাবিক এবং সহজ, কেননা রাজা তাঁহার বন্ধু তিনি রাজকবি, রাজসভায় দূরদূরান্তরের গুণী শিল্পী কবির পরিচয় লোকমুখেই স্বাভাবিকভাবে আনীত হয়; আবার রাজার

বন্ধু বলিয়া রাজার সঙ্গে যেখানে সেখানে যাওয়াও তাঁহার পক্ষে সহজ এবং সম্ভব ; সুতরাং চণ্ডীদাসের নাম শুনিয়া বা পদাবলীর কীর্ত্তি শুনিয়া হয়ত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এই দেখাসাক্ষাৎ স্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। এই দুই রসিক ভক্তকবি সম্মিলিত হইয়া পরস্পরে কি আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পদকল্পতরু ও গীতকল্পতরুর কয়েকটী পদে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আরও বিস্তৃতভাবে জানিবার জন্য অত্যন্ত লোভ জন্মে। দীনেশবাবু বলেন চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন ; সম্প্রতি চণ্ডীদাসের জীবনী-সম্বন্ধে যত আলোচনা হইয়াছে তাহাতে এইমতই প্রামাণ্য ও গ্রাহ্য হইয়াছে। নীলরতন বাবুর সম্পাদিত সাহিত্যপরিষদ হইতে প্রকাশিত পুস্তকেও ইহার অধিক কিছু পাওয়া যায় নাই।

চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহা অপেক্ষা অধিক বংশ কুলের পরিচয় অদ্যাপি কাহারও হস্তগত হয় নাই, তবে ব্রজসুন্দর সান্যাল-মহাশয় তাঁহার "চণ্ডীদাস চরিতে" চণ্ডীদাসের পিতামাতার নাম উল্লেখ করিয়া যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সুধী-সমাজে, এখনও গৃহীত হয় নাই। চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ, ইহা যেমন নিঃসংশয় ; তেমনি তিনি বিশালাক্ষীর পূজক ও রামী ধোপানীর প্রেমে মত্ত ছিলেন, এবিষয়ে কোন তর্ক নাই। আর যাহাই চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যে গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহা নানা কিম্বদন্তীর উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত জনশ্রুতিমূলক। চণ্ডীদাসের পিতামাতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তাঁহার পিতা বিশালাক্ষী দেবীর পূজক ছিলেন। নান্নুর গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বাল্যাবস্থায় চণ্ডীদাসের পিতামাতার মৃত্যু হয় এবং বাল্যকালে তাঁহার লেখাপড়া শিক্ষা করিবার বিশেষ সুযোগ

হয় নাই। উপনয়নের পরেই তিনি বিশালাক্ষীর পূজারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রতিদিন দেবীর পূজা করিতেন, ভোগ রাঁধিতেন এবং প্রসাদ বিতরণ করিতেন। রামী বা রামমণি রজক-কন্যা। কেহ বলেন, রামী দেবী-মন্দির মার্জ্জনা করিত এবং প্রসাদ পাইত। কেহ কেহ বলেন, রামী কাপড় কাচিত, সেই ঘাটেই চণ্ডীদাসের সঙ্গে তার পরিচয় এবং মিলন। হয়ত চণ্ডীদাসের প্রেমে পড়িয়াই সে কাপড় কাচা ছাড়িয়া মন্দির মার্জ্জনা করিত এবং প্রসাদ পাইত। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রামীর যে প্রেম, সে প্রেম ত যে সে প্রেম নয়—তাতে "সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী" না হইয়া থাকা যায় না। এই রজকিনী চণ্ডীদাসের নয়নতারা, গলার হার, কবিত্বের উৎস, সাধনার আশ্রয়, প্রেমের গুরু। নিজেই বলিয়াছেন

"তুমি রজকিনী; আমার রমণী
তুমি হও মাতৃপিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী, হরের ঘরণী
তুমি যে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্ব্বত
তুমি যে নয়নের তারা॥"

বিল্বমঙ্গলের যেমন চিন্তামণি, চণ্ডীদাসের তেমনি রামী বা রামমণি। এই রামমণিকে বাদ দিয়া চণ্ডীদাসকে বুঝিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। নীলরতন মুখোপাধ্যায়-মহাশয় সাহিত্যপরিষদের সাহায্যে যে গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন সেই "চণ্ডীদাসের পদাবলী" গ্রন্থে অনেক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। অনেক অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় পদ সঞ্চিত হইয়াছে, কিন্তু

চণ্ডীদাসের জীবনী ও তাঁহার পদাবলীর সৌন্দর্য্যের কোন বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই। মুখোপাধ্যায়-মহাশয় জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া জাতীয় আত্মাভিমান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য চণ্ডীদাসের রামমণিকে দুই কথায় উড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অন্যান্য অলৌকিক প্রবাদের সঙ্গে এই রামমণির সহিত চণ্ডীদাসের সম্বন্ধকে কিম্বদন্তীর পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। অথচ এই রামমণিই চণ্ডীদাসকে চণ্ডীদাস করিয়াছে। চণ্ডীদাস স্বয়ং প্রেমসাধনায় সিদ্ধ, আত্ম বিসর্জ্জন দিয়া ভাল বাসিয়াছিলেন, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া প্রেম করিয়াছিলেন, তাই তাঁর পদাবলীতে রাধিকার প্রেম, অত সত্য সরল সুন্দর স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামমণি ও চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অন্য যে সকল প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে অর্থাৎ রামমণি বাশুলীর বা নিত্যাদেবীর সহচরী, শাপভ্রষ্টা রজক-কন্যা অথবা চণ্ডীদাস রজকিনীকে ত্যাগ করিয়া সমাজে উঠিবার সময় যখন অন্ন পরিবেশন করিতেছিলেন, তখন রামীকে দেখিয়া অন্য দুই হাত বাহির করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; এই সকল প্রবাদ ঐ ব্রাহ্মণত্বের অভিমান হইতেই উৎপন্ন। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ দ্বিজ চণ্ডীদাসের দ্বিজত্ব বজায় রাখিবার জন্য রামীকে নিত্যা-দেবীর সহচরী বা দেবকন্যা ও চণ্ডীদাসকে অলৌকিক দেবশক্তিসম্পন্ন কল্পনা করিয়া জাতীয় অভিমানের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। চণ্ডীদাস কিন্তু দ্বিজ হইলেন, ভক্ত হইলেন, সাধক হইলেন কবি হইলেন, ঐ রামমণির প্রেমে মজিয়া। আর এই প্রেমের পরশরতন স্পর্শে রাম-মণিও সোণা হইয়াছিল। তাই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে দেখিতে আসিয়া কেবল চণ্ডীদাসকে দেখিয়া ফেরেন নাই, রামমণিকে দেখিয়া যান এবং রামমণির সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া প্রীত হন। আবার বিশালাক্ষী বিষ্ণুপূজার পদ্মফুল পাইয়া শিরে ধারণ করিয়াছিলেন এবং

"শ্রীকৃষ্ণ আমার গুরু" বলিয়াছিলেন এবং চণ্ডীদাসকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়াছিলেন, এই সকল প্রবাদ যেমন পরবর্ত্তী গোঁড়া বৈষ্ণব-দিগের কারি-কুরী, তেমনি পরকীয়া ভজনের নায়িকা বলিয়া রামমণিকে বাশুলী নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন অথবা "বাশুলী-আদেশে, দ্বিজ চণ্ডীদাসে ধোপানী চরণ সার" করিয়াছিলেন, এইগুলি জাত্যাভিমানান্ধ পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের কারিকুরী। স্বাভাবিক সহজভাবে চণ্ডীদাস রাম-মণিতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ অনুরাগে জাত-বিচার লোক অপবাদভয়, কোন্ কালেই বা কার থাকে, চণ্ডীদাসেরও ছিল না। রূপের ঘোরে, যৌবনের মোহে, ইন্দ্রিয়-বিকারে এখনও কত জন এমন করিয়া জাতিকুলমান ভুলিতেছে, তবে যেখানে এই অনুরাগ আসক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া প্রেমে পরিণত হয়, আত্মবিসর্জ্জনে লইয়া যায়, সেখানে এই প্রেম সকল আবিলতা হইতে মুক্ত করিয়া স্বর্গদ্বারে লইয়া উপনীত করে। এই প্রেমেই বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে চিরসুন্দর দেখিতেন, আবার চিন্তামণির প্রেমেই তিনি নিখিল রসামৃত মূর্ত্তি শ্রীভগবান্‌কে প্রেম করিতে শিখিলেন। এই প্রেমোন্মত্ত বিল্বমঙ্গলকে ভক্তচূড়ামণি করিল।

প্রিয়স্বরূপে দয়িত স্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততানরূপে স্ববিলাসরূপে॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়।

ধন্যসায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বানিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্টু সুদুর্গমা॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

চণ্ডীদাসের জীবনেও এই প্রেমের অপূর্ব্ব লীলা দেখা যায়। ক্ষেপা চণ্ডীদাসের জীবন যেমন আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তেমনি কলকণ্ঠে

প্রেমের মহিমা, প্রেমের মধুর সাধন সঙ্গীত, অপূর্ব্ব পদাবলীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তাই চণ্ডীদাসের কথায় বলি :—

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনে মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি, সেও হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি সে নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাই চণ্ডীদাস কহে॥

চণ্ডীদাসের জীবন কাহিনী সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ ও কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহারও কিছু আভাস দিতেছি। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে চণ্ডীদাসের পিতার মৃত্যুর পরে চণ্ডীদাস বাশুলীদেবীর পূজক নিযুক্ত হন। চণ্ডীদাস শিক্ষিত ছিলেন না, ইঁহাই সাধারণ মত। "পাগল চণ্ডী" এই কথাটী এখনও বাঙ্গালাদেশে উদ্দাম প্রকৃতির লোকদিগের প্রতি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। "পাগলচণ্ডী" কথাটা চণ্ডীদাস হইতেই আরম্ভ, এমন প্রেমে পাগল আর ত কেহ হয় নাই। শিক্ষিত না হইলেও প্রেমের মোহন মন্ত্রে, প্রেমসাধনার পরিপূর্ণ সফলতায়, সকল তত্ত্ব তিনি

অতি সহজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেম মানুষী প্রেমের সীমা অতিক্রম করিয়া মর্ম্মস্পর্শী বিশ্বমানবের চিরন্তন প্রেমলীলার সহিত যুক্ত হইয়াছিল, স্বর্গমর্ত্ত্য তাই একাকার হইয়া গিয়াছিল। এই বাশুলী-দেবীর পূজারী থাকিতে থাকিতে রজক-কন্যা রামমণির প্রেমে তিনি পড়েন। এই প্রেম তাঁহার কবিত্বের প্রস্রবণ, প্রেম সাধনার ও মধুর ভজনের সোপান। রজকিনীর প্রেমকলঙ্কহেতু। চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা নকুল তাঁহাকে সমাজে তুলিবার চেষ্টা করেন। যখন নকুলের চেষ্টায় ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন হইয়াছে এবং চণ্ডীদাস ভোজনরত ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশন করিয়া সমাজে সচল হইতেছেন, তখন রামী উন্মাদিনীব ন্যায় ছুটিয়া গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং প্রবাদ আছে চণ্ডীদাসকে ডাকিয়া বলিল 'কিরে চণ্ডে তুই আমাকে ছেড়ে জাতে উঠছিস্ নাকি।" চণ্ডীদাস রামীর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রামীকে আলিঙ্গন করিলেন। কেহ কেহ বলেন, দুই হাত থাল ও ভাতে আটক ছিল আর দুই হাত বাহির করিয়া আলিঙ্গন করেন। যাই হউক "সিতা মিশ্রী" প্রভৃতি বিবিধ সুমিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া যখন ব্রাহ্মণগণ চণ্ডীদাসকে কৃতার্থ করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তখন রামীকে পাইয়া চণ্ডীদাস কৃতার্থ মনে করিলেন।

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

কলঙ্ক ভঞ্জন আর হইল না। বাঙ্গালার সৌভাগ্য, বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য, তাই চণ্ডীদাস কলঙ্কী হইয়াই প্রেমসাধনায়

সিদ্ধিলাভ করিলেন। কবির জীবনী-সম্বন্ধে আর কোন কাহিনী পাওয়া যায় নাই। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা তৃতীয় ভাগ পঞ্চম সংখ্যায় নগেন্দ্র-বাবু চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে কতকগুলি প্রাচীন পদ প্রকাশিত করেন, ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি বা সাহিত্যিক মর্য্যদা-সম্বন্ধে নীলরতন মুখোপাধ্যায়-মহাশয় কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। অথচ এই পদগুলি চিরপ্রচলিত কিম্বদন্তীর অনেক সমর্থন করে। যাহা হউক তাঁহার মৃত্যু-সম্বন্ধেও দুইটী গল্প প্রচলিত আছে। একটী এই যে, কোন কারণে মন্দির পতিত হইলে বিশালাক্ষীদেবীসহ ভগ্ন মন্দিরে সমাহিত হয়েন। বিশালাক্ষী দেবীর বর্ত্তমান মন্দিরের অদূরে একটী ভগ্নস্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই গল্প অপেক্ষা দ্বিতীয় গল্পটি অধিক লোকে গ্রহণ করিয়া থাকে। চণ্ডী-দাস রামীকে সঙ্গে লইয়া নান্নুরের অনতিদূরে কীর্ণাহার গ্রামে কীর্ত্তন করিতে যান। সেখানে কোন দেব মন্দিরে তিনি মধুব পদাবলী কীর্ত্তন করিতেছিলেন,এমন সময়ে কোন কারণে মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়ে। চণ্ডীদাস ও রামী অন্যান্য লোকসহ সেখানে সমাহিত হন। কেহ কেহ মনে করেন, রমণী বাবুও এইরূপ লিখিয়াছেন, চণ্ডীদাস শেষ দশায় শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং সেখানে দেহত্যাগ করেন। রামমণিও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। তবে এই সকল মতের কোনটাই অবিসম্বাদিত-রূপে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, বাশুলীদেবীর পূজারী ছিলেন, আর রামমণির প্রেমে পাগল হইয়াছিলেন। আর রামমণির প্রেমে মজিয়াই তিনি সেই পরম প্রেমের চরম ধনের সন্ধান পাইয়াছিলেন। রামমণি চণ্ডীদাসকে সত্য সফল ও সার্থক করিয়াছে। নিজের মর্ম্মব্যথা ও কলঙ্কের ভিতর দিয়া রাধার সকল ব্যথা, সকল জ্বালা, সকল কলঙ্ক-বেদনা বুঝিয়াছিলেন।

"বঁধুর পীরিতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
অনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুঃখ সুখ করি মানে
আমার দুঃখের দুঃখী।
চণ্ডীদাস কয় বঁধুর পীরিতি
শুনিয়া জগৎ সুখী॥
(আবার) ধরম করম লোক চরচাতে
একথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে॥"

এই রামমণি চণ্ডীদাসের কবিতার গুরু, প্রেম সাধনার অবলম্বন, সাধন-ভজনের আশ্রয় ও রসিকভক্ত কবির সকল অনুপ্রাণনার আধার। চণ্ডীদাসের এই প্রেমের তুলনা নাই। দীনেশ বাবুর মতন বলিতে ইচ্ছা হয়, বিয়াট্রিসের প্রতি দান্তের প্রেম লিওনারার প্রতি ট্যাসোর প্রেম কদাচিৎ চণ্ডীদাসের এই রামীর প্রেমের সহিত তুলনা করা চলে। সকল ছাড়িয়া, কুলমান লোক অপবাদ জাতি ধর্ম্ম তুচ্ছ করিয়া, চণ্ডীদাস রামীকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাই তাঁহার পদাবলী রাধাভাবে পরিপূর্ণ, তাই অমন আত্মবিসর্জ্জনের স্বর্গীয় সঙ্গীত তাঁহার পদাবলীতে ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

তোমা বিনে মোর, সকলই আঁধার
দেখিলে জুড়াই আঁখি।
যেদিন না দেখি ও চাঁদ বদন
মরমে মরিয়া থাকি॥

ও রূপ মাধুরী, পাশরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে মন্ত্র তুমি সে তন্ত্র
তুমি উপাসনা রস॥
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাসে কয়॥

রামীর প্রেম চণ্ডীদাসের জীবনে এমনি সত্য সুন্দর ও প্রবল ছিল বলিয়াই তিনি রাধার ব্যথা অত বুঝিয়াছিলেন, রাধার প্রেমোন্মাদ অমন সুন্দর করিয়া বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন। তিনি নিজে গভীর প্রেমে মজিয়াছিলেন, তন্ময় হইয়াছিলেন, তাই তাঁর রাধা অমন প্রেমে পাগলিনী কৃষ্ণগতপ্রাণা প্রেমে তন্ময়—

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়।
আন পথে ধাই তবু কানু পথে ধায়॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যার নাম নাহি লও লয় তার নাম॥
এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তবুত দারুণ নাশা পায় শ্যাম গন্ধ॥
সেকথা না শুনিব করি অনুমান।
পর সঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক্ বহু এ ছার ইন্দ্রিয় আদি সব।
সদা যে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥

চণ্ডীদাসের পদাবলীর কথা বিশেষভাবে বলিতে পারি, সে সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি, এমন সাধ্য আমার নাই। তবু সেই মধুর পদাবলীর সৌন্দর্য্যের আভাস পরে দিতে চেষ্টা করিব। রামমণির কথা ইহার পরে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইবে না, সুতরাং এখানেই তাহার সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলি। 'চিন্তামণি বেশ্যা, বিল্বমঙ্গল ব্রাহ্মণ হইয়া বেশ্যা গমন করিয়াছিলেন, বেশ্যা অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তত সামাজিক আন্দোলন হয় নাই, কারণ বেশ্যাগমন সমাজ অত হীন ঘৃণার চক্ষে দেখে নাই; আর রামমণি রজককন্যা চণ্ডীদাস সেই রামীর প্রেমে মজিয়া রামীকে বেদমাতা গায়ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন আবার—

এক নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ
শুন রজকিনী রামি।
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি॥

তাই রামীকে লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। রামী প্রেমের পরশমণি স্পর্শ করিয়া, চণ্ডীদাস প্রেমিক কবি ও ভক্ত হইলেন, পরম প্রেমের সন্ধান পাইলেন, আবার রামীও এই প্রেমের পরশমণি-স্পর্শে সোনা হইয়া গেল। দীনেশ বাবু এবং তাঁহার পূর্ব্বে রমণী বাবু পদ-সমুদ্র হইতে রামীর দুইটী পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই দুইটি পদের সরলতা ও সরসতা চণ্ডীদাসের রামীরই সম্পূর্ণ যোগ্য। পদ দুইটি উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এখানে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

(১) কোথা যাও ওহে, প্রাণ বঁধু মোর
দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ ফাটে মোর বুক
ধৈরয ধরিতে নারি॥

বাল্যকাল হতে এ দেহ সঁপিনু
মনে আন নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া মথুরা যাইবে
বল হে সে কথা শুনি।
তোমার সারথী ক্রূর অতিশয়
বোধ বিচার নাই।
বোধ থাকিলে দুঃখ সিন্ধুনীরে
অবলা ভাসাতে নাই॥
পিরীতি জানিয়া যদি বা যাইবা
কবে বা আসিবা নাথ।
রামীর বচন, করহ শ্রবণ
দাসীরে করহ সাথ॥

(২) তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ না দেখিয়া দুঃখ
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ক্রুটী সমকাল মানি সুজঞ্জাল
যুগতুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে মন স্থির নহে
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল কত সুনির্ম্মল,
শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা।
হেরে হয় মনে এই দুই নয়নে
নিমেষ দিয়েছে কেবা॥

যাহে সর্ব্বক্ষণ, তব দরশন
নিবারণ সেহ করে।
ওহে প্রাণাধিক কি কব অধিক,
দোষ দিয়ে বিধাতারে॥
তুমি সে আমার আমি সে তোমার
সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয় চণ্ডীদাস বিনা
জগৎ দেখি আঁধার॥

আদিকবি কে ?

পদাবলী আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বিদ্যাপতিকে আদিকবি বলিব না চণ্ডীদাসকে আদি কবি বলিব—এ বিষয়ে আর একটু আলোচনা আবশ্যক। ইঁহারা উভয়েই আদি বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তা, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই; আর একটু বিশেষত্ব এই যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার প্রভাব ও প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের বা তাঁহার সমসাময়িক ভক্ত মহাজনদিগের মহিমামণ্ডিত দেবচরিত্রের প্রভাব বা তৎকালীন অলৌকিক প্রেমোন্মাদের ও লীলা-রসের সুধাধারার সংস্পর্শে ইহারা কেহই আসেন নাই। ইঁহারা নিজের জীবনে সাধনায় ইহা লাভ করিয়াছিলেন, তাই বৈষ্ণবসাধনায় ইঁহারা অগ্রদূত, ইঁহারা পরবর্ত্তী বিশ্বোজ্জল দিব্যালোকের প্রথম বৈতালিক অথচ পদাবলী সাহিত্যে ইঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পরবর্ত্তী যুগের প্রেমোচ্ছ্বাস ভাব বিশ্বাস ও বৈষ্ণবসাধনার সকল ভাবের ধারা ইহাদের গীতি-কবিতায় মূর্ত্তি ধরিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির জন্মকাল অর্থাৎ জন্মসন এখনও সুনিশ্চিত হয় নাই। ইঁহাদের

জীবনী ও জন্মকাল-সম্বন্ধে নানা আলোচনার ফলে ইহা সুস্থির হইয়াছে যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিম্বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে ইঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। দীনেশ বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিদ্যাপতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একবারে শেষে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে জন্ম গ্রহণ করেন ইহা এক প্রকার সুস্থির হইয়াছে। চণ্ডীদাসের রচিত সাঙ্কেতিক পদ লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু এই সাঙ্কেতিক পদে কিসের পরিচয়সঙ্কেত রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পদটী এই—

বিধুর নিকটে নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥
পরিচয় সংকেত—অঙ্কে নির্জ্জা।
চণ্ডীদাস রস—কৌতুক কির্জ্জা॥

রমণীমোহন-মল্লিক মহাশয় এই পদ হইতে চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল ১৩২৫ শক বলিয়া ধরিয়াছেন। ১৩২৫ শক ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দ। অনেকে ১৩২৫ শকে গীত রচিত হইয়াছিল, এইরূপ ব্যাখ্যাও করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এই জন্মকাল আলোচনা ও বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সম্মিলনের নিদর্শনস্বরূপ পদকল্পতরু ও গীতকল্পতরুর কয়েকটি পদ আলোচনা করিলে যাহা জানা যায় তাহাতেই বুঝা যায়, উভয়েই সমসাময়িক। সমসাময়িক ষোল আনা। কেবল জন্ম ধারণ নহে, কবিত্ব-সাধনায়ও সমসাময়িক। সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে কেহ ২।৪ বৎসর পূর্ব্বে জন্মধারণ বা কেহ ৫।৭।১০ বৎসর পরে দেহত্যাগ করিলেও ইঁহারা সাহিত্যের হিসাবে সম্পূর্ণ সমসাময়িক। সাধারণতঃ বিদ্যাপতিকেই প্রথম পদকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে, কিন্তু অদ্যাপি এমন কিছু পাওয়া যায়

নাই যাহাতে বিদ্যাপতিকে আদি পদকর্ত্তা বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যায়। বিদ্যাপতির পদাবলী খাঁটি বাঙ্গালা নয় বলিয়া আর একটা কথা উঠে, কিন্তু খাঁটী হউক আর নাই হউক বিদ্যাপতির পদ বাঙ্গালীর নিজস্ব সামগ্রী। ঐ ব্রজবুলি মিশ্রিত রূপান্তর-পাঠান্তর-দোষ-দুষ্ট পদাবলীই প্রায় পাঁচ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর প্রাণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালার যুগাবতার মহাপ্রভু হইতে ভক্ত বৈষ্ণব সাধক-সম্প্রদায়ের কত দিনের কত সাধনা, কত প্রেমোন্মাদ, কত ভক্তপ্রাণের আকুল উচ্ছ্বাস এই পদাবলীকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস খাঁটী বাঙ্গালী। তাঁহার উপর কাহারও কোনপ্রকার দাবী নাই। সেইদিক থেকে তাঁহাকে আদি বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদকর্ত্তা বলা যাইতে পারে; কিন্তু তিনিও আদি পদকর্ত্তা, বলিবার মত কোন প্রমাণ নাই। বাহিরের প্রমাণ অথবা সাহিত্যের আভ্যন্তরীন প্রমাণ (External and Internal Evidence) অদ্যাপি কিছু পাওয়া যায় নাই, যাহাতে এই উভয় কবির পৌর্ব্বাপর্য্য নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা যাইতে পারে; বর্ত্তমান সাহিত্য আলোচনার ফলে ইহাই সুনিশ্চিত হইয়াছে যে, উভয়েই জীবিতকাল ও গীতি কবিতা রচনায় সমসাময়িক।

কেহ কেহ বিদ্যাপতি বিহারের কবি বলিয়া, মিথিলার কবি বলিয়া চণ্ডীদাসকে বাঙ্গালার আদি বৈষ্ণব কবি বাঙ্গালার গীতি কবিতার আদি কবি বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মত এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না, বিদ্যাপতি যে রসের রসিক যাহার ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহার গীতি কবিতা প্রভাবান্বিত সেই রসের ধারা তিনি বাঙ্গালী কবি জয়দেবের নিকট পাইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি যেমন শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য ভক্তিসহকারে পাঠ করিতেন, জয়দেবের সুমধুর পদাবলীর সঙ্গেও নিশ্চয়ই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। সেই

দিক থেকে বলিতে গেলে জয়দেবকে বাঙ্গালার আদি বৈষ্ণব কবি ও পরবর্ত্তী ভক্তিধর্ম্মের অগ্রদূত বলিয়া অভিনন্দন করা যায়। জয়দেবের কবিতা সংস্কৃতে রচিত হইলেও তাহা অতি সুললিত ও সহজবোধ্য এবং বিচিত্র ভাবোচ্ছ্বাসে ভরা বলিয়া বৈষ্ণবসাধারণের কেন, বাঙ্গালার জনসাধারণের হৃদয় মন অতি সহজেই অধিকার করিয়াছিল। প্রবাদ আছে জয়দেবের পদাবলী শ্রবণ করিবার জন্য জগন্নাথ উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন। শ্রীচৈতন্য জয়দেবের পদ শ্রবণ করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। যাহা হউক,ইহা হইতেও আদি প্রশ্নের মীমাংসা হইল না, কারণ মিথিলার কবি বলিয়া বিদ্যাপতিকে আমরা ফেলিতে পারি না। বাঙ্গালা বৈষ্ণব গীতি কবিতার আদিকবি কে, তাহার নির্ণয় হইল না। এখনকার মত স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত-মহাশয়ের ভাষায় ইহাই বলিতে পারি "মধুবর্ষী বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস তোমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনের সমুজ্জ্বল প্রথম নক্ষত্রদ্বয়; যুগযুগান্ত পর্য্যন্ত তোমাদের পদাবলী বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে সমাদৃত ও গীত হইবে।"

দীনেশ বাবু The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal" নামক গ্রন্থে কবি উমাপতি ধরের তিনটি পদ উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে আদি বৈষ্ণব কবি বলিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। পণ্ডিত গ্রিয়ারসন্ এবিষয়ে কোন বিশেষ আলোচনা না করিয়াই উমাপতিকে মৈথিল কবি এবং বিদ্যাপতির সমসাময়িক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। উমাপতি মিথিলার কবি ও বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি হইবার প্রমাণ বিদ্যাপতির কয়েকটীর পদের ভনিতার উপর নির্ভর করিতেছে। নগেন্দ্র-বাবুর বিদ্যাপতির ভূমিকার ৫৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে—

ভণ বিদ্যাপতি শুনু উমাপতি সকল গুণ নিধান।
যেই পদক অর্থ লগাবথি সে জন বড় সেয়ান॥

এই ভনিতার উপরে নিভর করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রামাণ্য নহে, কারণ সমসাময়িক না হইয়াও গোবিন্দ দাস ও বিদ্যাপতির নাম একত্রে বহুপদে পাওয়া যায়। আবার জয়দেবের গীতগোবিন্দে প্রথম সর্গের চতুর্থ শ্লোকে উমাপতি, জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধন ও কবিরাজ ধোয়ী— এই পাঁচটী নামেরই উল্লেখ আছে। ইঁহারা লক্ষ্মণ সেনের সভায় ছিলেন বলিয়া সনাতন গোস্বামী মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সতীশ-বাবুর সঙ্কলিত জয়দেবের ভূমিকায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। উমাপতির রচিত শ্লোক-সম্বলিত প্রস্তর ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। দীনেশ-বাবু বলেন, এই প্রস্তর ফলক কোন সময়ে বিজয় সেনের প্রাসাদদ্বার শোভিত করিয়াছিল। বিজয় সেন লক্ষ্মণ সেনের পিতামহ। অথচ উমাপতি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় ছিলেন, তাহার অনেকগুলি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম গোবর্দ্ধন ও উমাপতির রচনা হইতে ইহা অনুমিত হয়, দ্বিতীয়তঃ কবিরাজ ধোয়ী তাহার "পবন দূত" কাব্যে লক্ষ্মণ সেনকে নায়ক করিয়াছেন। উমাপতির যে পল্লবিত বাক্যের দ্বারা বর্ণনা তাহাতে কোন রাজা বিশেষের পরিচয় পাওয়া যায় না। সেনরাজগণের দিগন্ত-প্রসারী রাজ্য, অপ্রতিহত প্রভাব ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতাপের রাজসভাসদ-সুলভ অতিশয়োক্তিমূলক বর্ণনা আছে। উমাপতি তাঁহার প্রিয় প্রতি-পালক ভূপতিকে "সকল নৃপতিপতি","সকল ত্রিপতিপতি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা হইতেই দীনেশ-বাবু বিজয় সেনকে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিশেষণগুলিই যথেষ্ট প্রমাণ নহে, বিশেষতঃ উমাপতির পক্ষে; কারণ উমাপতিকে জয়দেব বলিয়াছেন,

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতি ধরঃ।"

আর তখনকার দিনে অতিশয়োক্তি রাজাদিগের গুণকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে

সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইত। সুতরাং অন্যান্য প্রমাণ ও কিম্বদন্তী হইতে উমাপতিকে জয়দেবের সমসাময়িক ও লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত মনে করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। দীনেশ-বাবু যে উমাপতির পদগুলি উদ্ধার করিয়াছেন, সেই উমাপতি আর জয়দেবের উমাপতি এক কিনা তাহাও বলা যায় না। আবার মৈথিল কবি বলিয়া যে উমাপতি পণ্ডিত গ্রিয়ারসন্ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছেন, সে উমাপতি ভিন্ন ব্যক্তি কিনা তাহারও স্থির সিদ্ধান্ত অদ্যাপি হয় নাই। তবে বিদ্যাপতির পদের উল্লিখিত উমাপতি, যদি জয়দেবের পরবর্ত্তী ও বিদ্যাপতির সমসাময়িক হইয়া থাকেন এবং তিনিই যদি দীনেশবাবুর সংগৃহীত পদের পদকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়েন, তাহা হইলে এই উমাপতিকে আদি পদকর্ত্তা বলিবার কোন কারণ নাই। আর দীনেশ-বাবুর সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী এই উমাপতি যদি বিজয় সেনের সভাপণ্ডিত হয়েন, অথবা সাধারণতঃ যে উমাপতিকে জয়দেবের সমসাময়িক ও লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত বলা হইয়া থাকে, সেই উমাপতি যদি এই পদগুলির রচয়িতা হয়েন, তাহা হইলে নিঃসংশয়ে উমাপতিকে আদি বৈষ্ণব কবি ও প্রথম পদকর্ত্তা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু এই পদগুলির রচয়িতা উমাপতির কাল নির্ণয় এখনও সুস্থির হয় নাই। সতীশ বাবু অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর সুলিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকায় এই প্রসঙ্গের কোন আলোচনা করেন নাই, দীনেশ-বাবুও এবিষয়ে কোন সুস্থির মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই; কাজেই সম্প্রতি এই উমাপতিকে আদি বৈষ্ণব পদকর্ত্তা বলিয়া অভিনন্দন করা গেল না। দীনেশবাবু তাঁহার আর কোন গ্রন্থে এই উমাপতির কোন উল্লেখ করেন নাই। বিখ্যাত কবিদিগের নামে স্বরচিত পদ চালানো তখন অনেকের একটা রোগ ছিল, কাজেই ইহা অনুমান করিলে কখনই অসঙ্গত হইবে না যে, পরবর্ত্তী কোন পদ-

কর্ত্তা এই পদকয়টী উমাপতির নামে চালাইয়াছেন। যাহা হউক আপাততঃ এ বিষয়ের প্রসঙ্গে ক্ষান্ত দিয়া দীনেশ-বাবুর সংগৃহীত উমাপতির একটী পদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। এই পদের কবিত্ব রাজকবির যোগ্য এবং জয়দেবের উল্লিখিত উমাপতিরও অনুপযুক্ত নহে।

গগনে মগন ভেল চন্দা।
মুদি গেলি কুমুদিনী, তইও তোহর ধনি,
মুদল মুখ অরবিন্দা॥
কমল বদন, কুবলয় দুহু লোচন
অধরে মধুরি নিরমানে।
সকল সরীর, কুসুম তুঅ সিরজিল
কিঅ তুঅ হৃদয় পথানে॥
অসকতি কর, কঙ্কন নহি পরিহসি
হৃদয় হার ভেল ভারে।
গিরি-সম গরুঅ মান নহি মুঞ্চসি
অপরুব তুঅ ব্যবহারে॥
অবগুণ্ঠন পরিহরি, হরখি হেরু ধনি
মানক অবধি বিহানে।
সুমতি উমাপতি, সকল ত্রিপতি পতি
হিন্দুপতি রস জানে॥

বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা ও পাঠ নির্ণয়।

পদাবলীর ভাষা নানা ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। পাঁচশত বৎসর ধরিয়া এই সকল পদ কীর্ত্তনিয়াদিগের মুখে চলিয়া আসিতেছে আবার কোন কোন পদ সংগ্রহ পুঁথিতে লিপিবদ্ধ ছিল। পশ্চিমের মিথিলা হইতে পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত ও সুদূর উত্তরবঙ্গ হইতে উৎকল পর্য্যন্ত নানা দেশের কীর্ত্তনিয়াদিগের কথ্যভাষার প্রভাব ও গায়ক ও লিপিকর দিগের ইচ্ছানুযায়ী রূপান্তর এই পদাবলীকে বিকৃত করিয়াছে। মিশ্র মৈথিলী বা ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা এই দুই ভাষায় পদাবলীর ভাষাকে বিভাগ করা যায়। মিশ্রমৈথিলী বা ব্রজবুলি বিদ্যাপতি হইতে সূচনা হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী-মহাশয় বলেন ব্রিজি বা লিচ্ছবী নামে এক পরাক্রান্ত জাতি মিথিলায় বাস করিত। ইহাদের ভাষা বলিয়া মিথিলার ভাষাকে ব্রজবুলি বলে। দীনেশ-বাবু একস্থলে বলিয়াছেন, বৃজ্জি নামক ক্ষত্রিয় বংশের ভাষা ব্রজবুলি বলিযা পরিচিত হইয়াছে। আবার স্থানান্তরে তিনিই লিখিয়াছেন যে, ব্রজবুলি মৈথিল ভাষা ও বাঙ্গালার মিশ্রণে এক নূতন সৃষ্ট ভাষা—উহা মনুষ্যের উক্তি নহে লেখনীর উক্তি। এই শেষ মতই সমীচিন বলিয়া বোধ হয়। অনেকের ধারণা ব্রজবুলি ব্রজের ভাষা, বৃন্দাবন বাসীদের ভাষা, ব্রজ-রমণীরা এই ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন বা বলিতেন তাই রাধা-কৃষ্ণের কথাবার্ত্তায় সখীসম্বাদে ব্রজবুলির অবতারণা স্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ব্রজবুলি বলিয়া যাহা আমাদের নিকট পরিচিত তাহা পরিষ্কার মৈথিলী ভাষাও নহে, বেহারের হিন্দিও নহে, আসল

ব্রজের ভাষাও নহে। ইহা মৈথিল ভাষার অপূর্ব্ব রূপান্তর, মৈথিল ও বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব্ব মিশ্রণ, বাঙ্গালা ও প্রাচীন মৈথিলভাষার মাঝামাঝি, তাই বিহারের সকল হিন্দুর ও বাঙ্গালার জনসাধারণের বোধগম্য। এই ব্রজবুলির স্বাভাবিক লালিত্য ইহাকে সকলের প্রিয় করিয়াছে।

বিদ্যাপতির প্রচলিত পদাবলী দেখিয়া বিদ্যাপতির আসল ভাষা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে তিনি যে তৎকালীন মৈথিল ভাষায় পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৮৮২ সালে পণ্ডিত গ্রিয়ারসন্ বিদ্যাপতি-রচিত ৮২টী পদ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীর এক সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে বিদ্যাপতির ভাষা-সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়; এবং এই পদগুলি আসল বিদ্যাপতির পদ আর অবশিষ্ট বঙ্গদেশে প্রচলিত পদগুলি জাল বিদ্যাপতির পদ বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন। (Spurious songs of Vidyapati) তাঁহার এই মত যে সুপ্রতিষ্ঠিত নয় পরে তিনি বুঝিতে পারেন এবং ১৮৯৩ সালে এই মতের পরিবর্ত্তন করিয়া বঙ্গদেশের প্রচলিত পদগুলি যে বিদ্যাপতির রচিত পদাবলীর পাচশত বৎসরের নানা প্রদেশের গায়কদিগের রূপান্তর, পাঠবিকৃতির ফল তাহা স্বীকার করেন। পণ্ডিত গ্রিয়ারসন্ বিদ্যাপতির পদের সঙ্কলন, সানুবাদ প্রকাশ ও ভাষাতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া আমাদের চির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-মহাশয় বঙ্গদর্শনে বিদ্যাপতি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা ও আলোচনা করিয়া কবি-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণে যুগান্তর উপস্থিত করেন। জগবন্ধু ভদ্র, অক্ষয়কুমার সরকার সারদাচরণ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ—বিদ্যাপতির পাঠনির্ণয়ে ও পদাবলীসংগ্রহে বিশেষ পরিশ্রম

করিয়াছেন। সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-মহাশয়ের সম্পাদিত বিদ্যাপতির সুবৃহৎ সংস্করণ সম্প্রতি এবিষয়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তবে এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, সতীশ-চন্দ্র রায় মহাশয় প্রায় ৩৩।৩৪ বৎসর ধরিয়া অতি পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত পদাবলী-সাহিত্য আলোচনা করিতেছেন, এবিষয়ের ঐতিহাসিক আলোচনা ও নানা অপ্রকাশিত পদসংগ্রহ ও পাঠনির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু বিদ্যাপতির একখানি তালপত্রের পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই পুঁথির সাহায্যে বিদ্যাপতির পদের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। এই তালপত্রের পুঁথিতে এদেশে প্রচলিত ও মিথিলায় প্রচলিত উভয়বিধ ৩৫০ পদ আছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মহাশয় নেপাল হইতে একখানি বিদ্যাপতির তালপত্রের পুঁথি লইয়া আসিয়াছেন। এই পুঁথিতে প্রায় ৩০০ পদ আছে। এই পদের কতকগুলি পূর্ব্বোক্ত মিথিলার পুঁথিতেও পাওয়া যায়, আবার অনেকগুলি নূতন। এই পুঁথির প্রাচীনত্ব বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তবে পুঁথিতে রক্ষিত বলিয়া পদগুলি অধিক রূপান্তরিত হয় নাই। কিন্তু লিপিকর প্রমাদ অনেক আছে। মিথিলার তালপত্রের পুঁথিকে অবলম্বন করিয়া নগেন্দ্রবাবু বিদ্যাপতির পদাবলী শুদ্ধ ও সংস্কৃত করিয়াছেন। ইহার ফলে অনেক আজন্মপরিচিত বাঙ্গালীর নিজস্ব পদ বিদেশীর কথা, পরের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাই হউক, বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদগুলির ভাষা এই মিথিলার তালপত্রের পুঁথির পদাবলীর ভাষার অনুরূপ ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে পাঠনির্ণয়ের এখনও সময় আসে নাই।

এখন পদাবলী সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়াই একান্ত

প্রয়োজন, পরে পাঠোদ্ধার ও পদবিচারের সময় আসিবে। নগেন্দ্র-বাবুর সম্পাদিত পুস্তকে বিদ্যাপতির ৮৪০ পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে; তিনি নেপালের পুঁথি হইতেও কোন কোন পদ গ্রহণ করিয়াছেন। সতীশ-বাবু নগেন্দ্রবাবুর সংগৃহীত কোন কোন পদ বিদ্যাপতির নয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আবার তাঁহার অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে বিদ্যা-পতির ৩১টী পদ প্রকাশ করিয়াছেন। মিথিলার পুঁথি ও নেপালের পুঁথিতেও বিদ্যাপতির সমস্ত পদ নাই। মিথিলার পুঁথির অনেক পত্রাংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছে, আবার পুঁথির সব পত্রগুলিও নাই। পুঁথি অসম্পূর্ণ। নেপালের পুঁথিতেও অনেকগুলি পদ অসম্পূর্ণ। কত পদ যে লুপ্ত হইয়াছে অথবা কত পদ যে ভবিষ্যৎ সাহিত্যসেবীর অধ্যবসায়-পূর্ণ শ্রমসাধনার অপেক্ষা করিতেছে তাহার কে নির্ণয় করিবে? বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ও অসামান্য প্রতিভাশালী ও শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন; তাঁহার পদাবলী সংখ্যায় অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। হয়ত ভবিষ্যতে আরও পদ আমাদের হস্তগত হইবে এবং সম্প্রতি সংগৃহীত পদের মধ্যে যেগুলি অন্য পদকর্ত্তার তাহাও বিশ্লিষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইবে।

বিদ্যাপতি-প্রচলিত মৈথিল ভাষাতেই তাহার পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালার প্রচলিত পদগুলি বাঙ্গালার সংমিশ্রণে ব্রজবুলির অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা ব্রজের কোনকালেরই ভাষা নহে। ইহা বিদ্যাপতির অনুকরণে বৈষ্ণব কবিদিগের সৃষ্ট পদাবলীর বিশেষ ভাষা। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাগণ এই ব্রজবুলিকে মৈথিলের সংস্পর্শ হইতে অধিকতর মুক্ত করিয়া যে পদাবলীর ভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা মৈথিলভাষা হইতে যেমন সহস্রযোজন দূরে চলিয়া গিয়াছে, তেমনি বাঙ্গালারও খুব সন্নিকটে নহে। তবে সংস্কৃতশব্দবাহুল্যে ও বাঙ্গালা শব্দের মিশ্রণে এমন

মধুর করিয়াছে যে অনেক সাহিত্যরসিক ভক্তকবিকে এই পদকর্ত্তার লেখনীর মুখে রচিত ও কীর্ত্তনিয়ার গানে পরিপুষ্ট ব্রজবুলির ভাষাকে অতি অপরূপ মনোরম লালিত্যভরা ও গীতিকবিতার পরম উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। অনেক কবি গীতিকবিতা রচনায় ইহার উপযোগিতা ও সার্থকতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও এই ভাষার লালিত্যে মুগ্ধ হইয়া ভানুসিংহের পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এই তথাকথিত ব্রজবুলির ভাষা যেমন বাঙ্গালীর প্রাণ স্পর্শ করে এমন আর কিছুতে করে না। বহুবৎসরের বৈষ্ণবকবিদিগের প্রাণের গাথা, ভক্তি সাধনার উচ্ছ্বাস, প্রেমবিলাসের নিবেদন এই ভাষার সাহায্যে উদ্গীত হইয়াছে কাজেই এই ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালী নরনারীর এমন প্রাণের যোগ রহিয়া গিয়াছে। তাই বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠবিকৃতি ও লিপিকরপ্রমাদে দোষযুক্ত হইয়াও বাঙ্গালার পরিবর্ত্তিত আকারেই বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় হইয়া রহিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে বলিতে গেলে ব্রজবুলি বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষার অপভ্রংশমাত্র এবং তৎপরবর্ত্তী কবিদিগের কল্পনায় সৃষ্ট। কিন্তু এমন অপভ্রংশ ও কল্পিত ভাষা পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে আর কোথায়ও এমন উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। অন্যান্য দেশে পাঠবিকৃতি ও ভ্রমপ্রমাদ দূর করিয়া শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করিয়া প্রাচীন কবিতার উজ্জ্বলতা বজায় করা হইয়াছে, আর এই ব্রজবুলি এমন পাগলকরা মিষ্টতায় ভরা সঙ্গীতমুখর ভাষা যে এই মিশ্রভাষা একযুগের জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যের উপাদান হইয়া রহিয়াছে।

এদেশের প্রচলিত সমুদায় পদ চেষ্টা করিলে মিথিলায় পাওয়া যায় নগেন্দ্রবাবু এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু গ্রিয়ারসন্ ইহার কোন সন্ধান পাইলেন না কেন অর্থাৎ বঙ্গদেশের প্রচলিত পদের পাঠান্তর তাঁহার

সংগৃহীত পদাবলীতে স্থান পাইল না কেন এ কথা ভাবিবার বিষয়। বিশেষতঃ নগেন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় স্থানান্তরে বলিয়াছেন, মিথিলায় সর্ব্বত্র বিদ্যাপতির রচিত শিব ও গৌরীর গান শুনিতে পাওয়া যায়, রাধাকৃষ্ণের গীত বড় শোনা যায় না! অথচ বিদ্যাপতির এই বৈষ্ণব-পদাবলী বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আদৃত ও পথের ভিখারীর মুখেও শোনা যায়। সুতরাং মিথিলা যাহা ত্যাগ করিয়াছে এখন সাহিত্যিক প্রত্ন-তত্ত্বের গবেষণার সাহায্যে আবার সেই পদগুলিকে মিথিলার সামগ্রীতে পরিণত করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকটা নিষ্প্রয়োজন। যেখানে পাঠবিকৃতিতে বা লিপিকরভ্রমপ্রমাদে মূলপদের সৌন্দর্য্য ও ভাবের অঙ্গহানি হয় নাই, সেখানে বহু পরিশ্রমে সেই চিরপরিচিত বহুদিনের আদৃত পদকে মৈথিল ভাষার মৈথিল ও রীতির বিশুদ্ধ নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া,প্রাচীন মৈথিল কুলগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। তবে যেখানে পাঠবিকৃতিতে পদের পাঠ সঙ্গত ও সদর্থযুক্ত হইতে পারে নাই সেখানে সে দোষের খণ্ডন অতি প্রয়োজন। অনেক স্থলে পাঠের দোষ অতি সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য দোষের ফলে অতি গুরুতর অর্থের দোষ অথবা অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। আবার লিপিকর-প্রমাদে অনেকস্থলে ছন্দের দোষ ঘটিয়াছে। পাঠ নিরূপণের পূর্ব্বে পদগুলির সংগ্রহ ও প্রকাশ প্রয়োজন, পরে রচনারীতির সাহায্যে ও পুঁথির কালনির্ণয় অনুসারে, পাঠনির্ণয় ও বিভিন্ন পদাবলী গ্রন্থের ও তালপত্রের পুঁথির পাঠান্তর সমন্বয় করিয়া মূল পাঠোদ্ধার করিবার চেষ্টা আবশ্যক। বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় হইলে টীকার আবশ্যক হইবে যাহাতে সাধারণে পদাবলীর সৌন্দর্য্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

বিদ্যাপতির বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় হইলে অর্থনির্ণয়ের জন্য টীকা-সম্বলিত সংস্করণ আবশ্যক হইবে। বিকৃত পাঠের মান বজায় রাখিতে

গিয়া অনেক টীকাকার কোনপ্রকারে জোড়াতালি দিয়া অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। বিদ্যাপতির লিপিপ্রণালী পরবর্ত্তী সঙ্কলনকর্ত্তারা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনামত সংশোধন করিয়াছেন, তাহাতে ছন্দের ও অর্থের দোষ ঘটিয়াছে আবার কোন কোন স্থলে পরবর্ত্তী ব্রজবুলির রীতিঅনুযায়ী অনেকগুলি শব্দ বিদ্যাপতির পদে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে ইহাতেও পাঠবিভ্রাট ঘটিয়াছে। অনেক অধ্যবসায় ও শ্রমসহকারে এই পাঠ নির্ণয় করিতে হইবে। "সৌখীন সাহিত্য-চর্চ্চা"র দ্বারা এই আয়াসসাধ্য বহু শ্রমসাপেক্ষ কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে না। অনেক ধৈর্য্য অধ্যবসায় ও শ্রমের সহিত, পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতা লইয়া, এই রত্নোদ্ধার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। সকল কবিরই একটী নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। গভীরভাবে আলোচনা করিলে কবির এই বিশেষত্বের সহিত সুপরিচিত হওয়া যায়। আবার অন্যদিকে একথাও সত্য যে যাঁহারা বহু পদ রচনা করেন তাঁহারা সর্ব্বত্র নিজের বিশেষত্ব অথবা বিশেষ সাহিত্যিক উৎকর্ষ রক্ষা করিতে নাও পারেন। আবার পরবর্ত্তী সক্ষম অনুকরণকারীদিগের মধ্যে এমন শক্তিশালী কবি থাকিতে পারেন, যাহার রচিত পদ মৌলিক পদের সহিত সৌন্দর্য্যে লালিত্যে সমান হইতে পারে। আবার কেবলমাত্র ভনিতায় নাম দেখিয়া বা নামের অভাব দেখিয়া পাঠনির্ণয় করাও চলে না। বিদ্যাপতির ভনিতাযুক্ত এমন কয়েকটি প্রচলিত পদ আছে, যাহা বিদ্যাপতির রচিত হইতে পারে না। পরবর্ত্তী কোন পদকর্ত্তা বিদ্যাপতির নামে চালাইয়াছেন। সাধারণতঃ বিদ্যাপতির অনেক পদে, নগেন্দ্র-বাবুর সংশোধিত সংস্করণের অনেক পদেও বাঙ্গালা ভাষার প্রচুর প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। যথা, "শুনহ নাগর কান। রাজকুমারী রাধিকার নাম॥" "আবার শুন শুন গুণবতী রাধে। মাধব বধি কি

সাধবি সাধে॥" আবার অন্যত্র "শুন শুন গুণবতি রাধে। পরিচয় পরিহর কোন্ অপরাধে॥" ইত্যাদি। এমন কি তালপত্রের পুঁথি ও নেপালের পুঁথির পদেও বাঙ্গালার ঝাঁজ আছে। যথা,—

"বদন চাঁদ তোর, নয়ন চকোর মোর
রূপ অমিয় রস পীবে।"

"আদরে অধিক কাজ নহি বন্ধ
মাধব বুঝল তোহার অনুবন্ধ॥" ৩৪৪ সংখ্যক পদ

"কহ কহ সুন্দরি না কর বেয়াজ।
দেখিঅ আজে অপূরব সবে সাজ॥" ২৭৯ সংখ্যক পদ

সুতরাং নগেন্দ্রবাবু যে পাঠ বিশুদ্ধির জন্য তালপত্রের পুঁথিকে চরম অবলম্বন মনে করিয়াছেন কেবল মাত্র সেই পুঁথির পাঠ নগেন্দ্রবাবুর অভিপ্রেত বিশুদ্ধ মৈথিল পাঠে পৌছিয়া দেয় না। আর এই অতি সুলভ চালুনীর দ্বারা বিদ্যাপতির খাঁটিপদ নির্ব্বাচন করাও চলে না। বিদ্যাপতি যে খাঁটি মৈথিল ভাষায় তাঁহার বৈষ্ণবপদাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। নগেন্দ্রবাবু বলেন, "মিথিলার চন্দ্র কবি তাঁহাকে বলিয়াছেন যে বিদ্যাপতির ভাষার আকার নানা, কোথায়ও প্রাকৃতের মত, অথচ কোন্ প্রাকৃত তাহা নির্ণয় করা যায়-না আবার বিদ্যাপতির গীতে নেপালের তরাইতে সে কালে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই দেশের ভাষাও মিশ্রিত ছিল। ইহা ছাড়া বিদ্যাপতি গৌড় ভাষা কিছু ব্যবহার করিতেন।" তাহা হইলে তিনি তাঁহার পদাবলীতে স্বয়ং বাঙ্গালা ভাষাও কিছু ব্যবহার করিয়াছেন একথা সিদ্ধান্ত করিলে নিতান্ত অন্যায় সিদ্ধান্ত হইবে না; এবং পরবর্ত্তী কীর্ত্তনীয়ারা ও সংকলনকারীগণ বাঙ্গালী বলিয়া যেখানে একটু খটমট মনে করিয়াছেন, একটু দুরধিগম্য ভাবিয়াছেন, সেখানেই শ্রুতি-

মধুর ব্রজবুলির দ্বারা সংশোধন করিয়া লইয়াছেন একথা অনুমান করাও নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। যাহারা পাঠোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইবেন, সর্ব্ব-প্রথমে তাহাদের নিজের পূর্ব্বে স্থিরীকৃত বিশ্বাস ও মত(preconceived ideas and opinions) পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত যাবদীয় সম্ভাবনাগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তবে পরবর্ত্তী পদসঙ্কলনকর্ত্তারা অতি নির্লজ্জভাবে বিদ্যা-পতির নামে যে সকল হাস্যজনক পদ চালাইয়াছেন তাহা সহজেই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। পদকল্পতরুর অনেক সংস্করণে একটী পদ আছে—

রাই জাগ রাই জাগ শুক সারী বলে।
কত নিদ্রা যাও কালমাণিকের কোলে॥

এই পদের ভনিতায়—

বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁই।
অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই॥

আবার আর একটী পদ আছে যাহা কাব্যবিশারদের পুস্তকেও দেখা যায়—

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি॥
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি।
এ কাজ করিলি কি॥

এই পদের ভনিতায়—

বিদ্যাপতি কহ শুনহ সুন্দরি।
কানু জিয়াবে কি করি॥

এই জাতীয় পদগুলি কোন বালকেও বিদ্যাপতির রচিত মনে করিবে না। আবার সেই সুপ্রসিদ্ধ পদ যাহা বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া দীনেশ-বাবু তাঁহার গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন এবং কাব্যবিশারদ মহাশয়ের বিদ্যাপতিতেও স্থান পাইয়াছে, সেই পদটী নগেন্দ্র-বাবু তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতিতে স্থান দেন নাই।

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণ নিধি কারে দিয়ে যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মাঝু সঙ্গে।
মরণ কালে কৃষ্ণ নাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কানে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥
সেইত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে॥
পুন যদি চাঁদ মুখ দেখনে না পাব।
বিরহ অনল মাহ তনু তেয়াগিব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

এই পদটীও হয়ত কোন ভাবুক বাঙ্গালী কবি দুই একটী ব্রজবুলির প্রক্ষেপ দিয়া বিদ্যাপতির নামে চালাইয়াছেন অথবা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের ফলে এই আকার দাঁড়াইয়াছে। অথচ এই জাতীয় পদগুলি খাঁটি

বিদ্যাপতির নয় বলিয়াই ফেলিবার জিনিসও নহে। কাজেই পাঠ নির্ণয় ও পদনির্ব্বাচন কঠোরশ্রম সাপেক্ষ—সখের সাহিত্যচর্চ্চায় সম্ভব হইবে না। গ্রিয়ারসনের একতাড়ায় অথবা মিথিলার কোন সাহিত্যি-কের কথায় বিদ্যাপতির নামে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত সুমধুর পদাবলী জাল বলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিব না; আর অনেক পদই যে বাঙ্গালা-মিশ্রিত মৈথিল ভাষায় বিদ্যাপতি রচনা করিয়াছিলেন যাহাতে প্রাকৃত নেপালের ভাষাও গৌড়ের ভাষা-মিশ্রিত ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে নিতান্ত অমূলক বা অসঙ্গত হইবে না।

বিদ্যাপতির ধর্ম্ম।

বিদ্যাপতি এ দেশে বৈষ্ণব কবি বলিয়া পরিচিত কিন্তু তিনি শৈব ছিলেন এবং নিজের দেশে শৈব কবি বলিয়াই বিখ্যাত। তবে শৈব হইলেও ভক্তিধর্ম্ম তাঁহাকে এরূপস্থানে লইয়া গিয়াছিল যেখান হইতে মধুর রস আস্বাদন স্বাভাবিক হইয়াছিল এবং হরিহরেও পার্থক্য ছিল না।

"এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনে কৈলাস॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী।
ও নারায়ণ ও শূলপাণী"॥
"হস শিবশঙ্কর ও মুরারি।
তুহু জনিকে ভল হোইছ রারি॥
ভন জয়দেব হরি হরক দাস।
নীলকণ্ঠ হরি পুরথু আস॥

এই জাতীয় পদ হইতে বেশ বোঝা যায়—শৈব হইলেও তিনি পরম ভক্ত ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িকতা-শূন্য ছিলেন। বিদ্যাপতির স্বহস্তে লিখিত একখানি ভাগবত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিশাস্ত্র ভাগবতেও পণ্ডিত ছিলেন। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ যে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন এবং জয়দেবের প্রভাব যে তাঁহার বৈষ্ণবপদাবলীতে সুস্পষ্ট—তাহা অল্প অনুসন্ধানেই পরিলক্ষিত হইবে।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহুঁ শঙ্কর হউ বর নারী॥
নহ জটাজুট, বেণী বিভঙ্গ।
মালতী মাল শিরে, নহে গঙ্গ॥
মোতিম বদ্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ, সিন্দূর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর, নহ বাঘ ছাল।
কেলিকমল ইহ, না হয় কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহে, মলয়জপঙ্ক॥

বিদ্যাপতির এই পদ গীতগোবিন্দ তৃতীয় সর্গের নিম্নলিখিত পদের অনুবাদ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

হৃদি বিস লতা হারো নায়ং ভুজঙ্গম নায়কঃ
কুবলয় দল শ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরল দ্যুতিঃ।
মলয়জ রজো নেদং ভস্ম প্রিয়া রহিতে ময়ি
প্রহর ন হর ভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি॥

আবার বিদ্যাপতির এই পদের নিম্নোদ্ধৃত অংশে

ইন্দু বদনি ধনি নয়ন বিশালা।
কমল কলিত জনি মধুকর মালা॥
দেখলি কলাবতি অপরূপ রমণী।
জনি আইলি সুরপুর গজ গামিনী॥
বেণী বিমল বিরাজ তনু বন কুসুমাবলি হার।
শ্যাম ভুজঙ্গম দেখি কহু কিয়ে৷ কাম পরহার॥

গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গের

ভ্রূ চাপে নিহিতঃ কটাক্ষ বিশিখো নির্ম্মাতু মর্ম্মব্যথাং।
শ্যামাত্মা কুটিলঃ করোতু কবরী ভারোঽপি মারোদ্যমম্॥

এই শ্লোকের ছায়া পড়িয়াছে। আবার বিদ্যাপতির ২৮৫ সংখ্যক পদের—

ভালে ভুজগ সিরে করে অভিনয় করে
ঝাঁপল ফণিমণি দীপে।
জানি সজল ঘন সে দেই চুম্বন
তেঁ তুয় মিলন সমীপে॥

এই অংশ গীতগোবিন্দের ষষ্ঠ সর্গের—

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধর কল্পম্।
হরি রূপগত ইতি তিমিরমনল্পম্॥

এই শ্লোকের ছায়া কেন, ইহাকে অনুবাদ বলিলেও চলিতে পারে।

গীতগোবিন্দের সপ্তম সর্গের

কথিত সময়েঽপি হরি রহহ ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদ মমলমপি রূপ যৌবনম্॥

এই শ্লোকের ছায়া বিদ্যাপতির ৩০৫ পদের

এত কএ অইলিহুঁ জীব উপেখি।
তইঅও ন ভেলে মোহি মাধব দেখি॥

এই অংশে পড়িয়াছে।

অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মধাই।
ও নিজ ভাব সোভাব হি বিসরল
আপন গুণ লুবধাই॥
মাধব অপরূপ তোহর সিনেহ।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর
জিবইতে ভেলি সন্দেহ॥
ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখণ রাধা রাধা রটতহি
আধা আধা কহু বাণী॥
রাধা সঞে যব পুনতহি মাধব
মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা॥

বিদ্যাপতির এই পদে গীত গোবিন্দের ষষ্ঠ সর্গের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের সুস্পষ্ট ছায়া রহিয়াছে।

"মুহু রবলোকিত মণ্ডন লীলা।
মধু রিপু রহমিতি ভাবনশীলা॥"

নগেন্দ্র-বাবু এই পদের টীকায় শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলানুকরণ-মূলক—

গতিস্মিত প্রেক্ষণ ভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ় মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহং ত্বিত্যবলা স্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণ বিহার বিভ্রমাঃ॥

এই শ্লোকের সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রূপবর্ণনার অনেক পদেও গীতগোবিন্দের শ্লোকের ছায়া আছে। রূপবর্ণনার রূপকে ও উপমায় বিদ্যাপতি সিদ্ধহস্ত এবং অদ্বিতীয়। পরবর্ত্তী যুগে ভারতচন্দ্র ভিন্ন আর এবিষয়ে কেহ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন নাই।

বিদ্যাপতির রচিত শিবগীতেও মধুররসের পদ আছে। মধুর-রসের সাধনা যে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ তাহার সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর ভাষায় বলিতে পারি—"তিনি যে রসের রসিক ছিলেন সেরস তিনি বাঙ্গালী জয়দেবের নিকট পাইয়াছিলেন এবং সেরস শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তদিগের সময়ে মূর্ত্তিমান হইয়া বাঙ্গালা প্লাবিত করিয়াছিল।"

চণ্ডীদাসের পাঠোদ্ধার ও পদ-নির্ব্বাচন।

চণ্ডীদাস খাঁটী বাঙ্গালায় পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পদাবলী লিপিবদ্ধ করিবার সময় যে যেমন বুঝিয়াছেন তেমনি লিখিয়াছেন। আবার তাঁহাদের নিজেদের ভ্রান্তি অক্ষমতাও এ বিষয়ে কম ক্ষতি করে নাই। আবার বানান নানা পুঁথিতে নানা রকম। বানান-

বিষয়ে প্রাচীনকালের শিক্ষিত লোকেরা সম্পূর্ণ বেপরোয়া ছিলেন। এখনই যে আজকালকার শিক্ষিতেরা বানান-বিষয়ে যথেচ্ছাচার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন তাহাও নহে। বরং অনেকে বানান বিষয়ে স্বেচ্ছাচার দেখাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক (up-to-date) হইতে চাহেন। যখন যে লিপিকার যেমন সুবিধাজনক বিবেচনা করিয়াছেন, সেইরূপ বানানই লিখিয়াছেন। কেহ য়ামি লিখিয়াছেন কেহ আমী লিখিয়াছেন, আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী যখন যাহা মনে হইয়াছে তাহাই করিয়াছেন। কোন শব্দ শুনিতে বা বুঝিতে ভ্রম হইলে, নিজেরা শব্দ রচনা করিয়া পদ পূরণ করিয়াছেন। আজকাল যেমন বাংলা বাঙলা বাঙ্গালা প্রভৃতি নানা রকম বানান দেখা যায়—(Phonetic spelling) উচ্চারাণানুযায়ী বানান চালানো একটা (Fashion) রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কোন কোন পত্রিকার ভাষা বানানের স্বেচ্ছাচারিতা-সম্বন্ধে আদর্শ স্থল হইয়া উঠিতেছে, তেমনি সেকালেও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যাহার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ বানান চালাইয়া গিয়াছেন। এখন বানানে যে স্বেচ্ছাচার প্রচলিত হইতে চলিল এবং পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে যে বেপরোয়া ভাব ছিল, তাহাতে বানানের জন্য কোন ছাত্রের আর বেত্রাঘাতের সম্ভাবনা নাই, মাঝ থেকে আমরা বৃদ্ধেরা পাঠশালায় এই বানানের জন্য অকারণ কর্ণ মর্দ্দন, চপেটাঘাত, বেত্রাঘাত প্রভৃতি ভোগ করিয়া মরিয়াছি। কেহ কেহ বলেন এবং মনেও করেন যে পুঁথিতে যে বানান আছে, তাহাই রক্ষা করা উচিত। কেহ কেহ এই অশুদ্ধ বানানকে প্রাচীনতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন। অবশ্য স্বয়ং পদকর্ত্তার স্বহস্তে লিখিত কোন পুঁথি পাওয়া গেলে, সেই পদকর্ত্তার পদ-সংগ্রহে উল্লিখিত বানান বজায় রাখার কিছু তাৎপর্য্য এবং সঙ্গতিও আছে, কিন্তু পরবর্ত্তী লিপিকারের হেলার ভ্রমপ্রমাদকে সযত্নে রক্ষা

করিয়া সখের সাহিত্যিক প্রত্নতত্ত্ব আলোচনাকে ঘোরালো করিয়া তুলিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বিদ্যাপতির পাঠোদ্ধারের বেলায়ও এই কথা সম্পূর্ণ খাটে। তালপত্রের পুঁথি বলিয়া বিদ্যাপতির পদাবলীর যে পুঁথিকে মৌলিক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, সেপুঁথি বিদ্যাপতির লেখা নহে। নগেন্দ্রবাবু বলেন তাঁহার প্রপ্রৌত্রের লেখা অর্থাৎ প্রায় একশত বৎসরের পরের লেখা! আবার এই প্রপ্রৌত্র স্বয়ং এই পুঁথিখানি আদ্যোপান্ত লিখিয়াছেন কিনা তাহাও বলা যায় না। যে আকারে এই পদগুলি এই পুঁথিতে আছে, যে বানানে আছে, তাহাই শুদ্ধ ইহা সিদ্ধান্ত করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। তাল-পত্রেব পুঁথির ভিন্ন ভিন্ন পদের একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বানান আছে, ইহা লিপিকারের হেলায় স্বেচ্ছাকৃত লিপি-প্রমাদ ভিন্ন আর কিছু নহে। হ্রস্ব দীর্ঘ অনেক সময় ছন্দ ও সুর রক্ষার জন্য আবশ্যক হইত এবং হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের ভেদ তখন বেশ সুস্পষ্ট ছিল, কাজেই হ্রস্ব দীর্ঘ সম্বন্ধে বেশী সতর্কতা আবশ্যক।

চণ্ডীদাসেব পদাবলীর যে নানা সংগ্রহ আছে, তাহার বানান বজায় রাখিতে গেলে, নীলরতন বাবুর মত বলিতে হয়—মুদ্রিত পুস্তক কি বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিত। অনেক সময় নকল করিতে করিতে আর বানানের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে এক একটী এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যাহার কোন অর্থই হয় না। আবার ভনিতা দেখিয়াও পদ-নির্ব্বাচন করা চলে না, বিদ্যাপতির ৬।৭টা উপাধি ছিল; এই সব উপাধি নামের মত করিয়া তিনি ভনিতায় ব্যবহার করিয়াছেন, আবার উপাধির মত নামযুক্ত অন্য পদকর্ত্তাও ছিলেন, তাহাতে গোলযোগ কিছু পাকিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের সে উপাধির বালাই না থাকিলেও তাঁহার পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাগণ কেহ কেহ তাঁহার অনুকরণ করিয়া তাঁহার নামেই

বহু পদ চালাইয়াছেন, আবার ইচ্ছামত সংশোধনের ফলে বহু পদের অঙ্গহানি হইয়াছে। খাঁটি বাঙ্গালায় রচিত বলিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সহজে অনেকেই কারিকুরি করিতে পারিয়াছেন। আবার চণ্ডীদাসের বিশেষত্ব যে চণ্ডীদাসের সকল পদেই সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যাইবে তাহাও আশা করা যায় না, কারণ কোন বড় কবির সকল কবিতা সমান হয় না। সকল সময়েই কোন বড় কবি উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতে পারেন না। সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাসে ৮৩০টী পদ আছে। নীলরতন-বাবু নিজেই বলিয়াছেন, চণ্ডীদাসের নামের ছাপ দেখিয়াই তিনি পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, কোন্‌টী আসল, কোন্‌টী নকল তাহা বিচার করিয়া, কোন্ পদগুলি চণ্ডীদাসের তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। বিচার করিয়া ত্যাগ করিবার সময় এখনও আসে নাই। তিনি লিখিয়াছেন অতি সুদক্ষ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন জহুরী ভিন্ন এই নির্ব্বাচন-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। তাঁহার এই মন্তব্য অতি সমীচীন বলিয়া মনে করি। নীল-রতন-বাবু যে পুঁথি পাইয়াছিলেন তাহার ৮টী পাতা নাই। কমপক্ষে সেই ৮ পাতায় ৪০টী পদ ছিল। এই ৪০টী পদের মত আরও কত পদ কোথায়ও কোন কীর্ত্তনিয়ার ঘরে বা বৈরাগীর আখড়ায় পড়িয়া রহিয়াছে। যখন সমুদায় পদ সংগৃহীত হইবে তখন সুদক্ষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি-নিপুণ সাহিত্যিকের উপর পাঠোদ্ধার ও পদ-নির্ব্বাচনের ভার পড়িবে।

চণ্ডীদাসের শিক্ষা ও ধর্ম্ম।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন চণ্ডীদাস লেখা-পড়া জানিতেন না। রামীকে ভাল বাসিয়াই অপূর্ব্ব প্রেমের সুমধুর গীতিকবিতা রচনার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদাবলী মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে,তিনি ভাগবত গ্রন্থের সহিত সুপরিচিত ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষাতেও অনভিজ্ঞ ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পদগুলিতে যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে বিদ্যাপতির মত অত শব্দছটা ও উপমাবাহুল্য না থাকিলেও, সৌন্দর্য্য ও পদলালিত্য জয়-দেবের কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। আবার যুগলরূপ বর্ণনা ও কুঞ্জর মিলন প্রভৃতির পদে যে অপরূপ শব্দবিন্যাস দেখা যায়, তাহা সংস্কৃতে পার-দর্শিতাই সূচনা করে। রাসলীলার বর্ণনায় ভাগবতের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। পাগল চণ্ডীদাস বা পাগলাচণ্ডী হইতে, হয়ত পরে চণ্ডী-দাসকে লোকে মূর্খ কল্পনা করিয়াছে। নিমাই যখন প্রেমে বিভোর হইয়া মধুর সাধনার কথা প্রচার করিলেন তখন নিমাইকেও লোকে পাগ্‌লানিমাই ঠাওরাইয়াছিল। মানুষের চির-পরিচিত সনাতনের পথ ছাড়িয়া যখনি যে অকুতোভয়ে জ্ঞানের—প্রেমের—সাধনার—নব নব ভাবোচ্ছ্বাসের মহিমা কীর্ত্তন করে তখনই সে পাগল হইয়া দাঁড়ায়। চণ্ডীদাস যখন রামীর প্রেমে মজিয়া প্রেমময়ের প্রেমের সন্ধান পাইলেন তখন বলিয়া উঠিলেন—

পীরীতি বলিয়া একটি কমল
রসের সায়র মাঝে।
প্রেম পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধাওল আপন কাজে॥

ভ্রমর জানয়ে কমল মাধুরী
তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে করে অপযশ॥

* * *

ধরম করম লোকচরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর, যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে॥

চণ্ডীদাসের এই পাগল-করা কথায় লোকে চণ্ডীদাসকে পাগলাচণ্ডী ও মূর্খ বলিয়া মনে করিল। চণ্ডীদাস রামীর প্রেমে মজিয়াছিলেন বলিয়াই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমেও একেবারে বিভোর হইয়াছিলেন। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন "মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।"

চণ্ডীদাস বাশুলীদেবীর পূজক ছিলেন, সুতরাং প্রথমে হয়ত শাক্ত ছিলেন; প্রবাদ এই যে বাশুলীর আদেশে তিনি রাধা কৃষ্ণের উপাসক হয়েন এবং মধুর পদাবলী রচনা করেন। বাশুলীর পূজারী থাকিতে থাকিতে রামমণির প্রেমে তিনি পড়েন এবং রামমণির প্রেমই রাধা-কৃষ্ণের পরমপ্রেম-মন্দিরে তাঁহাকে লইয়া যায়। অনেক পদের ভনিতায়—"কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে" এইরূপ ভনিতা আছে তাহা হইতে কতকটা পূর্ব্বোলিখিত প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে চণ্ডীদাসের মত এমন করে বিভোর হয়ে আর কেহ পদাবলী রচনা করেন নাই। আপনার জীবনের প্রেমসাধনার প্রত্যক্ষ-অনুভূতি-লব্ধ-তন্ময়তা বলিয়াই চণ্ডীদাস রাধাকে দিয়া বলিতে পারিয়াছেন—

তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেক
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে।

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
তোমা হেন ধন, অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি॥
তুমি বিদগধ গুণের সাগর
রূপের নাহিক সীমা।
গুণে গুণবতী বেন্ধেছ পীরীতি
অখল ব্রজের রামা॥
জাতি কুল দিয়া আপনা নিছিয়া
শরণ লইয়াছি।
যে কর সে কর তোমার বড়াই
এ দেহ সঁপিয়াছি॥
আনের অনেক, আছে কত জন
রাধার কেবল তুমি।
ও দুটী চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইণু আমি॥

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সময়ে দেশের ধর্ম্মমত।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির যুগে বাঙ্গালা দেশের সামাজিক অবস্থা ও প্রচলিত ধর্ম্মের কাহিনী কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না, কারণ পদাবলী ভিন্ন ঠিক সেই যুগের আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয় নাই। চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতিতে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা প্রায় এক শতাব্দীর পরের অবস্থার কথা। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সময়ে বঙ্গ দেশে সেন রাজগণের চেষ্টায় আবার বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতেছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মতবাদ বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদের উপর যেমন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিল, তেমনি বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্য উপাসনা আর জনসাধারণের প্রাণ পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছিল না। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতার মানবীয়গুণমণ্ডিত অথচ দৈবী শক্তিসম্পন্ন প্রাণ জুড়ানো দেবতার পূজার জন্য সাধারণের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। কাজেই শৈব ধর্ম্ম অতি সহজে জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করিল। পৌরাণিক শিব—আশুতোষ, পরম যোগী অথচ ভক্তবৎসল দীনহীনের বন্ধু আবার সতীপতি। একান্ত পতিব্রতা ভগবতী তাঁহার গৃহলক্ষ্মী, কুবের তাঁহার ভাণ্ডারী, অথচ কোন ঐশ্বর্য্য সম্পদের ধার ধারেন না। এই আদর্শগৃহী পত্নী, অনুরাগী যোগী আশুতোষ দীনবন্ধু দেবতা অতি সহজে গৃহধর্ম্মশীল বাঙ্গালীর প্রাণে সিংহাসন স্থাপন করিতে পারিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ দশায় যে মহাযানের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেখানেও ভক্তির উপাসনার সূত্রপাত হইতেছিল। কিন্তু এই সময়ে

নাস্তিক্যবাদ সংশয়বাদও স্বৈরাচার সমাজের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। কর্ম্ম হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যে কর্ম্মহীনতা, বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যে সকলবন্ধনশূন্যতা, জনসাধারণকে যেখানে লইয়া যাইতেছিল, মানুষ সেখানে ধরিবার কিছু পাইতেছিল না, অথচ ইহার অভ্যন্তরে যে স্বৈরাচার বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাও জনসাধারণকে পীড়া দিতেছিল। হিন্দু পুনরুত্থানযুগের প্রারম্ভে (Age of Hindu Renaissance) বুদ্ধদেব ধর্ম্মদেবতা বা ধর্ম্মঠাকুরে পরিণত হইয়াছিলেন। বুদ্ধজীবনের শুভ্রজ্যোতি সাধারণের মানস চক্ষু হইতে অপসারিত হইয়াছিল। বৌদ্ধাচার্য্যগণপ্রতিষ্ঠিত মঠ, বিহারগুলি ব্যাভিচারের কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িতেছিল। সাধারণের অনুষ্ঠেয় প্রাণমাতানো ক্রিয়াকর্ম্মের অভাবে শূন্যবাদ মহাশূন্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। সংসার ত্যাগ করিয়া, ক্রিয়াকর্ম্মের বন্ধন, গৃহপরিবারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, যে মহাশূন্যের দিকে তৎকালীন বৌদ্ধধর্ম্ম লইয়া যাইতে চাহিতেছিল, তাহা সাধারণের প্রাণ মন একেবারেই স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। এদিকে মহাযোগী পতিব্রতা সতীপতি আশুতোষ সর্ব্বত্যাগী মহাদেব সহজেই সাধারণের প্রিয় দেবতা আশ্রয় স্থান হইয়া উঠিতেছিলেন। সতী শুধু সতী নন, পতিনিন্দায় প্রাণ ত্যাগ করেন, রাজকুমারী হইয়াও শ্মশানবাসী শিবের সেবা করিতে, ভিখারীর অন্ন রাঁধিয়া দিতে সদা আনন্দিত, আবার এই ভিক্ষার অন্ন নিজ হাতে রাঁধিয়া যেমন স্বামীপুত্রকে দেন তেমনি অন্নপূর্ণারূপে জগতের ক্ষুধার্ত্ত নরনারীকে অন্ন বিতরণ করেন। এই দুঃখের ঘরকন্না করিয়াই মা আমার চির আনন্দময়ী। আবার সতীই যে পতির নিন্দায় প্রাণত্যাগ করেন তাহা নহে, পতি মহাদেব সতীর দেহত্যাগে পাগল হইয়া সেই দেহ শিরে ধরিয়া বিশ্ব ভুবন পরিভ্রমণ করিলেন।

আবার সেই দেহের খণ্ড খণ্ড ছেদনে অবসানে যোগাসনে বসিয়া সতীর জন্য মহাধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিলেন। এই পতিপ্রাণা সতী ও সতীপ্রাণ মহাদেব সহজেই গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুরাগী বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিলেন। এই সতী আশুতোষকে লইয়া বাঙ্গালী নরনারীর কত কল্পনা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত সাধনা, কত কামনা বেদনা, স্তোত্রে কাব্যে গাথায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। আবার নিয়মে ও অনুশাসনে কঠোর সংযমের ব্যবস্থা থাকিলেও, যখন বৌদ্ধমঠে প্রকৃত সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত হইতেছিল না এবং সাধারণে অনুশাসনের পীড়নে পীড়িত হইয়া উদ্দাম স্বেচ্ছাচারে ফিরিতে উন্মুখ হইয়াছিল, তখন তন্ত্রোক্ত মতবাদ সহজেই লোকের নিকট প্রিয় হইয়া দাঁড়াইল। এই অবস্থা-বিপর্য্যয় কিছু একদিনে আসে নাই। সেন-রাজগণের রাজত্ব কালেই বঙ্গদেশে এই হিন্দু পুনরুত্থান প্রবল-বেগে চলিতে থাকে। সেই সময়েই বৌদ্ধমঠ, বিহার হিন্দু দেবালয়ে পরিণত হইল এবং কান্যকুব্জ হইতে আনীত ব্রাহ্মণের দ্বারা বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের যেমন প্রতিষ্ঠা হইল, তেমনি তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের প্রচলনে মদ্য মাংস ও ব্যভিচারের স্রোতও প্রবাহিত হইল। এই সময়ে বৌদ্ধ মতবাদে যাহাই থাকুক, মঠ ও বিহারে নানা প্রকার স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচার প্রচলিত হইয়াছিল। অনুশাসনের পীড়নকে ছিন্নভিন্ন করিয়া সমাজানুমোদিত ধর্ম্মমতের সাহায্যে স্বৈরাচার অসংযমকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়া যেন জনসাধারণ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিন্তু মানুষের প্রাণের স্বাভাবিক ভক্তি-প্রবণতা ও মর্ম্মবেদনা নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা, ইহাতে পরিপূর্ণরূপে তৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। তাই জয়দেব অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ছন্দে সুমধুর রাধা-কৃষ্ণ-লীলার গীতগোবিন্দ গাহিয়া উঠিলেন। সে অতুলনীয় গান, সে সুধাধারা তখন বাঙ্গালীর প্রাণ ভাল করিয়া স্পর্শ করিল না। আবার পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই

সুমধুর রাধা-কৃষ্ণ-লীলা নানা ছন্দে, অপূর্ব্ব লালিত্য মাধুর্য্য ও স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যপূর্ণ হইয়া, শৈব বিদ্যাপতি ও শাক্ত চণ্ডীদাসের কণ্ঠে গীত হইল। মধুর রস সাধনার যে ইঙ্গিত ভাগবতে আবদ্ধ ছিল, জয়দেব তাঁহার প্রাণ মাতানো মন ভোলানো গীতিকবিতায় তাহা জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিলেন। আবার সেই গীতির ধারা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে—আরও পরিপূর্ণ ও বিকশিত হইয়া উঠিল। যে আত্ম-নিবেদন, আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য সাধারণের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পথ ও আশ্রয় খুঁজিতেছিল, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি রাধা-কৃষ্ণের লীলাগীতে তাহার সুস্পষ্ট পথ নির্দ্দেশ করিলেন। আর অপরাধ, অযোগ্যতা, অক্ষমতার ভারে পীড়িত হইয়া আত্ম-নিবেদনে যে সাহস ভরসা পাইতেছিল না, সে এই মধুর পদের ভিতর পরম দেবতার চরম আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইল। কিন্তু শুনিল কি? পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বাঙ্গালী এই তত্ত্ববস্তুকে ধরিতে পারিল না। এই সুমধুর গীতিমালা শুধু গীতেই রহিয়া গেল। আরও অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যদেব, জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গীতের ভিতর দিয়া নিজের জীবনের প্রত্যক্ষলব্ধ তত্ত্ববস্তু জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিলেন। শ্রীচৈতন্যের মহিমাময় জীবন ও অপূর্ব্ব সাধনা, এই অপরূপ রাধাকৃষ্ণ-লীলার মধুর পদাবলীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল—জনসাধারণের নিকটে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল। যাহা কেবল সুমধুর শব্দে, পদ লালিত্যে, উপমা সৌন্দর্য্যে কেবল সুমধুর গানের কথা ছিল, তাহাই শ্রীচৈতন্যের সাধনায় মানবের চিরদিনের প্রাণের কথায় পরিণত হইল।

বিদ্যাপতির পদাবলী।

উজ্জয়িনীর রাজসভায় এক দিন কবি কালিদাস যেমন নানা ছন্দে নানা ভাবে অপূর্ব্ব শব্দলালিত্য উপমাচাতুর্য্য ও ভাববিন্যাস লইয়া পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া পরম রমণীয়, চিরস্মরণীয়, নিখিলজন মনোহরণ বিশ্বসাহিত্যের চিরবরেণ্য শ্রেষ্ঠকাব্যকুসুমাঞ্জলি ভারতীর চরণকমলে অর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি মিথিলার সভাপণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি মধুর রসের আবেগময়ী রাগিণীতে শ্রুতিমধুর প্রাণস্পর্শী ভাবোচ্ছ্বাসভরা বৈষ্ণব পদাবলী গাহিয়া ছিলেন। উজ্জয়িনী কোন্ কালের গর্ভে, সেরাজসভার গৌরব ঐশ্বর্য্য প্রভাবপ্রতিপত্তি কেই বা স্মরণ করে? রাজা শিব সিংহ কবিতার ভনিতায় স্থায়ী স্থান লাভ করিলেও মানবের গণনা ও স্মৃতি তাহা রক্ষা করিবে না কিন্তু বিদ্যাপতি ঐ বিশ্বকবি কালিদাসের মত যুগযুগান্তর ধরিয়া বিশ্ব-মানবের প্রাণ অধিকার করিয়া থাকিবে। জয়দেবের সুমধুর গীত-গোবিন্দে যাহা অর্দ্ধস্ফুট আভাস মাত্র ছিল, বিদ্যাপতির কবিতায় তাহাই পরিস্ফুট ও বিকশিত হইয়া উঠিল। বিদ্যাপতির পদাবলীর এখনও পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় হয় নাই। সম্প্রতি নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণকে অবলম্বন করিয়াই আলোচনা করা সঙ্গত হইবে, কিন্তু অনেক প্রচলিত পদ তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন এমন কি ফুটনোটে বা পরিশিষ্টে স্থান দেন নাই। বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগের ও বয়ঃসন্ধির পদগুলি এক একটী সুচিত্রিত চিত্রপট। উপমা ও শব্দবিন্যাস-কৌশলে নায়িকার

চিত্রপট যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুন্দরী কিশোরীর নানা ভঙ্গীর ছবি শব্দতুলিকায় অঙ্কিত হইয়া সুচিত্রিত সুরঞ্জিত মনোরম আলেখ্য-রূপে উপস্থিত হইয়াছে।

(১) গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম সায়ক
কুহকী ভেলি বর নারি॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
তত হি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥

* * *

(২) কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে
মুখভরে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল
গতি ভয়ে গজ বনবাসে॥

* * *

(৩) সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু
সাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥

* * *

(৪) শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন নেল॥

বচনক চাতুরী লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকা।॥

*　*　*

(৫)　খনে খনে নয়ন কোন অনুসরই।
খনে খনে বসন ধূলি তনু ভরই॥
খনে খনে দশন ছটাছট হাস।
খনে খনে অধর আগে করুবাস॥

*　*　*

(৬)　যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই॥
যাহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাহা বিজুরি তরঙ্গ॥

*　*　*

(৭)　সুধামুখি কে বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ　　মনোভব মঙ্গল
ত্রিভুবন বিজয়ী মালা॥
সুন্দর বদন　　চারু অরুলোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক কমল মাঝে　　কাল ভুজঙ্গিনি
শিরিযুত খঞ্জন খেলা॥

*　*　*

(৮)　স্বজনি ভাল করি　　পেখন না ভেল।
মেঘ মালা সঞে　　তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥

আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি, আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি, তবধরি দগধে অনঙ্গ॥

দশন মুকুতা পাতি, অধর মিলায়ত, মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।

বিদ্যাপতি কহ, অতএ সে দুখ রহ, হেরি হেরি না পূরল আশা॥

এই সকল পদের প্রত্যেকটি রূপবর্ণনার অপূর্ব্ব উজ্জ্বল চিত্র।

আবার "অলখিতে হামে হেরি বিহসসি থোরি।
জনু রজনী ভেল চান্দ উজোরি॥"

"সজনি অপরূপ পেখল রামা।
কনক-লতা অবলম্বন উয়ল
হরিণ হীন হিম ধামা॥"

"আজ মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনি পেখন সিনানক বেলা॥"

এই সকল পদে রূপ ও নবযৌবনের অপূর্ব্ব চিত্র চিত্রিত হইয়াছে; নবযৌবনা রাধিকার রূপ-লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে। কত হাব-ভাব, কত অঙ্গ বিলাসের নিপুণ বর্ণনা এই সকল পদে অতি আশ্চর্য্য কৌশলে অঙ্কিত হইয়াছে। "একলি আছিনু ঘরে হীন পরিধান" প্রভৃতি পদে লজ্জার ছবি আঁকিতে গিয়া কি কৌশল কি নিপুণতার সহিত যৌবন বর্ণনা হইয়াছে। সৌন্দর্য্য বর্ণনায়, উপমা প্রয়োগে, শব্দ-কৌশলে, চিত্র-অঙ্কনে বিদ্যাপতি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়, অতুলনীয়; জগতের সাহিত্যেও শীর্ষস্থানীয়। বিদ্যাপতির উপমা যেমন সুন্দর ও মনোরম, তেমনি উজ্জ্বল ও সার্থক। এই উপমায় তিনি অতুলনীয়, কালিদাসের মত সিদ্ধহস্ত। সৌন্দর্য্যের এক একটী পরিপূর্ণ পরিষ্কার চিত্র তাঁহার শব্দতুলিকাস্পর্শে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধিকার রূপবর্ণনা, পূর্ব্বরাগ, বয়ঃসন্ধির চিত্রপটে এই অতুলনীয় ক্ষমতা প্রতিভাসিত হইয়াছে। রূপবর্ণনায় তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদিগের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতীচ্য কবিরাও তাঁহাকে

এই ললিত-শব্দ-তুলিকা-চিত্রিত চির-মনোরম সহজ স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ জীবন্ত চিত্র-পট অঙ্কনে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বিরহান্তমিলন ও ভাবোল্লাসের সুমধুর পদগুলির চণ্ডীদাসের পদের সহিত পরে তুলনায় আলোচনা করা যাইবে।

চণ্ডীদাসের পদাবলী।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পূজারী ব্রাহ্মণ যেমন উদার বিশ্ব-জনীন ধর্ম্মের এবং সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের ও নর-সেবার অপূর্ব্ব তত্ত্ব প্রচার করিয়া বঙ্গদেশকে ধন্য বরেণ্য ও জগৎকে বিস্মিত করিয়াছেন, তেমনি পঞ্চদশ শতাব্দীর পূজারী ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাসও রাধা-কৃষ্ণের সুমধুর লীলা বর্ণনা করিয়া অপূর্ব্ব সুধাবর্ষী গীতি-রত্নমালা বিশ্ব-ভারতীর চরণ-কমলে অর্পণ করিয়া জগতের সাহিত্যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই পূজারীর বীণাঝঙ্কার বাঙ্গালীর চির আদরের ধন হইয়া বাঙ্গালী নর-নারীর প্রাণ মন অধিকার করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে চিরগৌরবান্বিত করিবে। তাঁহার প্রেম-গীতি স্বর্গীয় প্রেম-রাগিণী যোগে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক সুরে ভক্ত সাধকের চরম আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হইয়াছে, পৃথিবীর ফুলে স্বর্গের পারিজাত শোভা সৌরভ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। জগতের গীতিকবিতায় প্রেম-সাহিত্যে এইরূপ মর্ম্মস্পর্শী দিব্য প্রেমমণ্ডিত চরমোপলব্ধি-পূর্ণ গীতি-কবিতা অতি বিরল। এমন সহজ সুন্দর সরল ভাষায় তিনি মর্ম্মস্পর্শী করিয়া প্রেমের চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন যে, এমন হৃদয়-হীন কঠোর শুষ্ক প্রাণ কেহ থাকিতে পারে না, যাহার প্রাণ ইহাতে মুগ্ধ, বিগলিত না হয়।

পূর্ব্বরাগের পদে সৌন্দর্য্যবর্ণনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে অথচ ভাবোচ্ছ্বাসের সূচনাও রহিয়াছে।

(১) বেলি অসকালে, দেখিনু ভালে, পথেতে যাইতে সে।
জুড়াল কেবল, নয়ন যুগল, চিনিতে নারিনু কে॥
সই সেরূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা, বসন শোভা, পাসরিতে নারি তারে॥

* * *

(২) তড়িৎ বরণী হরিণী নয়নী দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা সে দিয়া অমিয়া ছানিয়া গড়িল কোন বা রাজে॥

* * *

(৩) স্বজনি ও ধনী কে কহ বটে।
গোরচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥

* * *

আবার রাধার পূর্ব্ব রাগের পদ আরও সুন্দর হইয়াছে। এ যেন নায়িকার কথা নহে ভক্তচিত্তের অপূর্ব্ব আত্মনিবেদন।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

* * *

এই পদটী নায়িকার উক্তি অপেক্ষা ভক্তের আকুল প্রার্থনা, মধুর উপলব্ধি বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। এইরূপ পদ বিশ্ব-সাহিত্য

ভাণ্ডারের অমূল্য সঞ্চয়। নায়িকা ভক্ত সাধকের মত 'নাম জপ করিতে করিতে অবশ হইতেছেন। শ্যাম নামে কত মধু, নাম যে ছাড়া যায় না। আবার "যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়"।

সুধা ছানিয়া, কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো, তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া, কেবা খঞ্জন আনিলরে, চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥
থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা, মুখানি বনাল রে, জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্ব ফল জিনি কেবা, ওষ্ঠ গড়ল রে, ভুজ জিনিয়া করি শুণ্ড॥
কম্বু জিনিয়া কেবা, কণ্ঠ বনাইল রে, কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা, সারদ্র বনাইল রে, ঐছন দেখি পীতাম্বর॥

* * *

রাধিকার পূর্ব্ব রাগের এই পদ বিদ্যাপতির রাধার অনুরাগের নিম্নোদ্ধৃত পদের সহিত তুলনা করা চলে।

এ সখি কি পেখল অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপন সরূপ॥
কমলযুগল পর চাঁদক মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেঢ়ল বিজুরি লতা।
কালিন্দিতীর ধীর চলি যাতা॥
শাখা শিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহি নব পলব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাস।
তাপর কীর থীর করুবাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোড়।
তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোড়॥

এ সখি রঙ্গিনি কহল নিশান।
পুন হেরইতে হমে হরল গেয়ান ॥
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস ভান।
সুপুরুখ মরম তুহু ভাল জান ॥

প্রেমের গভীরতায় ও বিহ্বলতায় চণ্ডীদাসের পদ অতুলনীয়।

একে কুলবতী নারী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা ॥
অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায় ॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি ॥
চণ্ডী দাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সেকালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া ॥

(২) সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডী দাস, পাপ পুণ্যমম, তোমার চরণ খানি ॥

(৩) এমন পীরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি ॥
দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥

* * *

(৪) আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে হয় তাহার চিতে স্বতন্তরী নই ॥

তাহার গলার ফুলের মালা আমার গলায় দিল।
তার মত মোরে করি সে মোর মত হইল॥

* * *

(৫) সই কি আর বলিব তোরে।
অনেক পুণ্য ফলে, সে হেন বঁধুয়া, আসিয়া মিলল মোরে।
এ ঘোর রজনী, মেঘ ঘটা বঁধু, কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে, বঁধুয়া তিতিছে, দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ, বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া, কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পীরিতি, আরতি দেখিয়া, মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া, আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুঃখ, সুখ করি মানে, আমার দুখেতে দুখী।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পীরিতি, শুনিয়া জগৎ সুখী॥

চণ্ডীদাসের প্রেমগীতিতে বৈষ্ণব সাধনার "রাধা ভাবে"র চরমোৎকর্ষ ও পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পদাবলী-সাহিত্যের সর্ব্বত্র এই আধ্যাত্মিক ভাব পরিস্ফুট হয় নাই। অনেক স্থলে নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ বিরহ মান সম্ভোগ মিলন প্রভৃতি যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমন আসল তত্ত্ববস্তু ভক্ত ও ভগবানের নিত্য সম্বন্ধ ও নিত্য লীলার ভাব তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। চণ্ডীদাসের রূপবর্ণনার পদে, পূর্ব্বরাগের পদে, সম্ভোগ-মিলনের পদেও দেহের রূপ, দেহের সম্বন্ধ, দেহের মিলন অপেক্ষা ভাববিহ্বল প্রাণের প্রাণারামের রূপ দর্শন ও মিলনই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাই সম্ভোগ স্মৃতির পদেও দেখি।

(১) এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি :
নিমিখে মানয়ে যুগ কোড়ে দূরমানি॥

(২) পদ আধ যায় পিয়া চাহে উলটিয়া
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া ॥

* * *

সম্ভোগ মিলন প্রভৃতি অধ্যায়েও "পরশে অবশ" "ভাবে ভরল মন" প্রভৃতি বর্ণনা দ্বারা চণ্ডীদাস দেহের মিলনকে যথাসম্ভব উচ্চ স্তরে লইয়া গিয়াছেন। শরীরের অঙ্গবিশেষের সৌন্দর্য্য বর্ণনায় নিপুণতা আমাদের দেশের সাহিত্যে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অন্য দেশের সাহিত্যে ইহা অতি সামান্য। তবে এই নিপুণতা যেখানে অতি অসতর্কভাবে সৌন্দর্য্যপ্রকাশকে অতিক্রম করিয়া, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপভোগকে প্রতিভাসিদ্ধ করে এবং খণ্ড খণ্ড ভাবে কেবল নগ্ন দৈহিক সৌন্দর্য্যকে উপস্থিত যেন ভূমেতে সাহিত্যে শ্লীলতা ও সুরুচির সীমারেখা অযথা অতিক্রম করা গা ছল ছল তাঁহার পদে কোথায়ও এই শ্লীলতাকে অকারণ আঘাত কল্যোম কহ দেহবর্ণনার পদে যে ভাবোচ্ছ্বাসের সূচনা আছে, তাহা পূর্ব্বে কিসের হইয়াছে। খণ্ড নগ্ন সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সমগ্রের সৌন্দর্য্য চিত্রপটের মত প্রকাশিত হইয়াছে—

সিনিয়া উঠিতে, নিতম্ব তটিতে, পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার শরণ লইল আসি ॥
কিবা সে ভুগুলি, শঙ্খ ঝলমলি, সরু সরু শশী কলা।
সাঁজেতে উদয়, শুধু সুধাময়, দেখিয়ে হইনু ভোলা ॥

চণ্ডীদাসের পদে আত্ম-বিসর্জ্জন, স্বাধিকারবিলোপ, আত্ম-সমর্পণ এবং তন্ময়তা অতি আশ্চর্য্যভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে—

সই পীরিতি আখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি, না জানি রাতি কি দিন ॥
পীরিতি পীরিতি, সব জনা কহে, পীরিতি কেমন রীত।
রসের পীরিতি, রসের স্বরূপ, কে না করে পরতীত ॥

*　　　　*　　　　*

সেরূপ সায়রে, নয়ান ডুবিল, সে গুণে বাঁধিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবিল যে চিতে, নিবারিব কিবা দিয়া॥
খাইতে খাইছি, শুইতে শুইছি, আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে, ঈঙ্গিত পাইলে, আগুন ভেজায় ঘরে॥

(২) তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পর সঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হই যে বিকল॥
নিশিদিশি বঁধু তোমায় পাশরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়া রাখ স্থির করি॥

*　　　　*　　　　*

(৩) এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে, সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই।
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥

চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পীরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক ॥

কি আকুল উচ্ছ্বাস, কি মর্ম্ম বেদনা নিম্নের পদগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে—

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ পীরিতির কথা ॥
সই কে বলে পীরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া কাঁদিতে জনম গেল ॥

* * *

(২) সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল ॥
সখিরে কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাইতে, দারিদ্র বাড়ল, মানিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালেম, সাগর ছেঁচিলাম, মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল, অভাগী করম দোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস শ্যামের পীরিতি মরমে রহল শেল ॥

* * *

(৩) কালা হৈল ঘর, আন কৈল পর, কালা সে করিল সারা।
কালার ধেয়ান, আর নাহি মন, কালিয়া আঁখির তারা ॥
পরাণ অধিক, হিয়ার মানস, কালিয়া স্বপনে দেখি।
গমনে কালিয়া, জপেতে কালিয়া, নয়নে কালিয়া দেখি ॥

গগনে চাহিতে সেখানে কালিয়া ভোজনে কালিয়া কানু।
নয়ন মুদিলে সেখানে কালিয়া কালিয়া হইল তনু॥

* * *

এই তন্ময় প্রেমভিখারিণী রাধা মান করিতেও জানে না, অভিমান করিতেও পারে না।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়॥
আন পথে ধাই তবু কানু পথে ধায়॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যার নাম নাহি লব লয় তাঁর নাম॥

* * *

ধিক রহু এছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥

আবার মান করিয়াও থাকা চলে না। জয়দেবের রাধা কৃষ্ণকে "মম শিরসি মণ্ডনং দেহিপদপল্লব মুদারং" বলিতে বাধ্য করিয়াছেন বিদ্যাপতির রাধার জন্য কৃষ্ণকে বলিতে হইয়াছে

(১) কর কমলে, পরশইত চাহি, বিহি নহে যদি বামা।
তোঁহার চরণে, শরণ লইনু, সদয় হোয়ব রামা॥

(২) পরশইতে চরণ সাহস না হোয়।
করযোড়ি ঠাড়ি বদন পুন জোয়॥

আর চণ্ডীদাসের রাধার মান করা চলে না। রাধা বলিতেছেন

(১) আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিনু, কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর, নটবর শেখর, কাঁহা সখি করল পয়ান॥
তপবরত কত, করি দিনযামিনী, যো কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল্যধন, মঝু পদে গড়ায়ল, কোপে মুঁই ঠেলিনু পায়॥

(২) ছি ছি দারুণ মানের লাগিয়া বঁধুরে হারায়ে ছিলাম।
শ্যাম সুন্দর রূপ মনোহর দেখিয়ে পরাণ পেলাম॥
সই জুড়াইল মোর হিয়া।
শ্যাম অঙ্গের শীতল পবন তাহার পরশ পাইয়া॥
তোরা সখীগণ করহ সিনান আনিয়া যমুনা নীরে।
আমার বঁধুর যত অমঙ্গল সকল যাউক দূরে॥

*　　*　　*

অতি সরল ভাষায় চণ্ডীদাস যে দুঃখের গীত রচনা করিয়াছেন তাহা যেন বিশ্বমানবের মর্ম্মের কথা, সকলের প্রাণকে অন্তরের মর্ম্ম-স্থলকে অতি আশ্চর্য্যভাবে স্পর্শ করে। বিশ্ববীণার মর্ম্মতন্ত্রীতে স্বাভাবিক ভাবে আঘাত করে বলিয়াই সকলের হৃদয়ই অভিভূত হয়।

(১) কাহারে কহিব, মনের মরম, কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে, মরম বেদনা, সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি, সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক্ নেহারিতে, সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে, জলেতে যাইতে, সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল, করে ঝলমল, তাহে কি পরাণ রয়॥

*　　*　　*

(২) হিয়ার মাঝারে যতনে রাখিব বিরল মনের কথা।
মরম না জানে ধরম বাখানে সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥

*　　*　　*

(৩) বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকণ ধন॥
সেরূপ লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লৈয়া যায় পাছে॥

*　　*　　*

(৪) সই না কহ ও সব কথা।
কালার পীরিতি যাহার লাগিল জনম হইতে ব্যথা॥
কালিন্দির জল নয়ানে না হেরি বয়ানে না বলি কালা।
তথাপি সে কালা অন্তরে জাগয়ে কালা হৈল জপ মালা॥
বঁধুর লাগিয়া, যোগিনী হইব, কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে, বিদায় হইয়া, যাইব গহন বনে॥

* * *

ভাব সম্মিলনের পদগুলি একেবারে ভক্ত সাধকের প্রত্যক্ষানুভূতি-মূলক চরম প্রার্থনা, ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিলেই স্তোত্ররূপে গীত হইতে পারে। প্রেমগীতির এই চরম পরিণতি, প্রেমময়ের বন্দনা প্রেমস্বরূপে আত্ম-বিসর্জ্জন আর কোন সাহিত্যে দেখা যায় না।

(১) বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

* * *

(২) বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে, প্রাণপতি হইও তুমি॥
বহু পুণ্য, ফলে গৌরী আরাধিয়ে, পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কিক্ষণে, দেখা তব সনে, তেঁই সে পরাণে মরি॥
বড় শুভক্ষণে, তোমা হেন নিধি, বিধি মিলায়ল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে অধিক করিয়া মানি॥

* * *

(৩) বঁধু কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম, ধরম করম, সকলি জানহে তুমি॥

যে তোর করুণা, না জানি আপনা, আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে, বুঝিতে না পারি রীতি ॥

* * *

সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি, তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোহারি বচন, অলঙ্কার মোর, ভূষণে ভূষণ বাসি ॥

* * *

(৪) বঁধু তুমি সে পরশ মণি।
ও অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার, সোণার বরণ খানি ॥

* * *

তোঁহার লাগিয়া, ধাই বনে বনে, সুবল বেশ ধরি হে।
তিলে শত যুগ, দরশনে মানি, ছেড়ে কি রইতে পারি হে ॥
অঙ্গের বরণ, কস্তুরী চন্দন, হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি।
ও দুটী চরণ, পরাণে ধরিয়া, নয়ান মুদিয়া থাকি ॥

* * *

(৫) বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি, কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, না জানি ভজন পূজন ॥
পীরিতি রসেতে, ঢালি তনু মন, দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি, মন নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম, তোহারি চরণ খানি ॥

(৬) বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া, হৃদয়ে তুলিয়া লব ॥

শিশুকাল হৈতে, আন নাহি চিতে, ওপদ করেছি সার।
ধন জন মন, জীবন যৌবন, তুমি সে গলার হার॥

*　　*　　*

(৭) রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রস-তত্ত্ব লাগি, গোকুলে আমার স্থিতি।

*　　*　　*

তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী, সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান, তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥

*　　*　　*

(৮) গৃহ মাঝে রাধা, কাননেতে রাধা সকলে রাধারে দেখি।
শয়নে ভোজনে, গমনে রাধিকা, রাধিকা সদাই মতি॥

*　　*　　*

(৯) জপতে তোমার নাম, বংশীধারী অনুপাম, তোমার বরণের পরিবাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরী, আইনু গোকুল পুরী, বরজ মণ্ডলে পরকাশ॥

*　　*　　*

(১০) শ্যাম সুন্দর, শরণ আমার, শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণ মন, শ্যাম সে গলার হার॥
শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল, শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন, ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥

*　　*　　*

এই সকল পদে নায়ক-নায়িকার প্রেমোচ্ছ্বাস ভক্তের আত্ম-নিবেদনে পরিণত হইয়াছে। মানুষের সাধারণ সহজ প্রেম কেমন স্বর্গদ্বারে লইয়া গিয়াছে। এই বিশেষত্ব চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য গৌরবের নিদর্শন। এতদ্ভিন্ন সরলতা ও লালিত্য এবং আড়ম্বর-হীন ভাষা চণ্ডীদাসের পদাবলীকে আরও গৌরবান্বিত করিয়াছে। সর্ব্বত্র মধুরতা ও সরলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর সাহিত্যে প্রেমগীতি বাক্য বিভাগে, অদ্যাপি যত কবিতা গান কাব্য ও পদাবলী রচিত

হইয়াছে, চণ্ডীদাসের পদাবলীর ন্যায় এমন সুমধুর সুললিত গভীর আবেগ-পূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত, সরল স্বাভাবিক ভাববিহ্বলতাময় গীতিমালা অতি বিরল।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনায় সমালোচনা।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই এক ভাবের কবি এবং সমসাময়িক কবি। উভয়েই পদাবলী রচয়িতা ও উভয়েই মধুর রসের সাধক। উভয়েরই নিজ নিজ বিশেষত্ব, উভয়ের গীতি কবিতার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অদ্যাপি এই দুই বৈষ্ণব কবির পদাবলী জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি কবিতার সভায় উচ্চ আসন অধিকার করিতে পারে। কোন কোন অংশে এই পদাবলী অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহাদের পদাবলীর তুলনায় সমালোচনা করা অতি কঠিন ব্যাপার। একজন এক বিভাগে নিজের শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, অন্যজন অন্য বিভাগে তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা ও রসসাধনার চরমোপলব্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। একে যেন অন্যের অভাব পূরণ করিয়াছেন। তথাপি এক বিষয়ের একই ভাবের কবিতা বলিয়া ইঁহাদের তুলনায় সমালোচনা করা উচিত। এখনও বৈষ্ণব সাহিত্যের তেমন রসজ্ঞ ভাবুক সমালোচক উপস্থিত হন নাই। এই গভীর মর্ম্মস্পর্শী রসসাধনার তত্ত্ববস্তুর ইঙ্গিতপূর্ণ পদাবলীর সৌন্দর্য্য ও মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়া ও উপযুক্ত বোধবিচার ও ভাব গ্রহণ (Right appreciation) করিয়া এই পদাবলী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার মত শক্তি আমার নাই, তথাপি বহু বৎসর ধরিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে যাহা মনে উদিত হইয়াছে, যাহা প্রাণে অনুভব করিয়াছি, তাহারই কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

(বিদ্যাপতির পদাবলীতে সর্ব্বত্র ভাষার সৌন্দর্য্য, উপমার ঐশ্বর্য্য, অলঙ্কার ও শব্দচাতুর্য্য আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসে সরল ভাষায় প্রাণের কথা আছে, ভাবের বিহ্বলতা, আবেগের গভীরতা ও প্রেমোন্মত্ততা আছে।) পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাপতি উপমায় অতুলনীয়, কালিদাসের মত সিদ্ধহস্ত। সৌন্দর্য্যের এক একটি পরিপূর্ণ চিত্র তাঁহার শব্দ-তুলিকা স্পর্শে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতির রাধিকার রূপবর্ণনে পূর্ব্বরাগে, বয়ঃসন্ধির চিত্রপটে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে। "গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনি" "স্বজনি ভাল করি পেখন না ভেল" "সুধামুখি কে বিহি নিরমিল বালা" প্রভৃতি পদ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চণ্ডীদাসের "বেলি অসকালে দেখিনু ভালে" "স্বজনি ও ধনি কে কহ বটে" "তড়িৎবরণী হরিণ-নয়নী" প্রভৃতি পদে সৌন্দর্য্যের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাপতির মত অমন উজ্জ্বল চিত্রপট নহে। তবে এই সৌন্দর্য্য বর্ণনার ভিতরেও "মোহিনী চাহনী মরমে লাগিল" "কিবা সে মুখের হাসি হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া মরমে রহিল পশি" "সই কিবা সে সুন্দররূপ। চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে বড়ই রসের কূপ॥" এইরূপ ভাবোচ্ছ্বাসের সুন্দর প্রকাশ আছে।

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কে পতিয়ায়ব সপন সরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীতবসন পরা সৌদামিনি রেহ॥
সামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কাজরে সাজল মদন সুবেশ॥
জাতকি কেতকি কুসুম সুবাস।
ফুলশর মনমথ তেজল তরাস॥

বিদ্যাপতি কহ কি কহব আর।
শূনকয়ল বিহি মদন ভঁড়ার ॥

বিদ্যাপতির এই পদে ভাষার সৌন্দর্য্য ও উপমার নিপুণতা আছে, কিন্তু ভাবের ঐশ্বর্য্য নাই।

জলদ বরণ কানু, দলিত অঞ্জন তনু, উদইছে শুধুসুধাময়।
নয়ন চকোর, মোর পিতে করে উতরোল, নিমিখে নিমিখ নাহি সয় ॥
সই দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে গোকুল নারী, হইয়াছে পাগলী, সকল লোকেতে বলে ॥
কিবা সে চাহনী, ভুবন ভুলনী, শোভিত গলের মাল।
মধুর লোভে ভ্রমরা বুলে বেড়িয়া তঁহি রসাল ॥
দুইটী লোচন, মদনের বাণ, দেখিতে পরাণ হানে।
পশিয়া মরমে, ঘুচায়ে ধরমে, পরাণ সহিত টানে ॥

চণ্ডীদাসের এই পদে ভাষার সৌন্দর্য্য ও ভাবমাধুর্য্য উভয়ই আছে। বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগের পদের মধ্যে "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" এই জাতীয় পদ একটিও নাই। চণ্ডীদাস যদি শুধু এই একটী পদ রচনা করিয়া নিবৃত্ত হইতেন, এই একটী পদেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার কবিদিগের সহিত সমান আসন প্রদান করিত।

বিদ্যাপতির রাধার পূর্ব্বরাগে পদগুলি রূপবর্ণনা ও যুবতীজনোচিত কৌতুকেভরা চণ্ডীদাসের রাধার পূর্ব্বরাগের রাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্য একেবারে পাগল।

আলো রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকই একলে না শুনে কাহার কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে যেন যোগিনীর পারা ॥

চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের উপরের পদ আর বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগের নিম্নের পদে তুলনা করিলে উভয়ের বিশেষত্ব আরও প্রতিপন্ন হইবে।

এক দিন হেরি হেরি হসি হসি জায়।
অরু দিন নাম ধরি মুরলি বাজায়॥
আজু অতি নিয়রে করল পরিহাস।
না জানিয় গোকুল ককর বিলাস॥
সজনি ও নাগর শামরাজ।
মূলবিনু পরধনে মাগ বেয়াজ॥
পরিচয় নহি দেখি আন কাজ।
না করয় সম্ভ্রম না করয় লাজ॥
অপনা নিহরি নিহরি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন ভএ বিভোর॥

বিদ্যাপতির প্রেমবৈচিত্রের পদগুলি কেবল ভোগলালসা বিলাস-কলা ও ইন্দ্রিয়োপভোগ অভিব্যক্ত করিয়াছে। এই সকল পদে ভাষার সৌন্দর্য্য আছে, কবিত্বও আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত ভাবোচ্ছ্বাসের সংস্রব নাই। চণ্ডীদাসের সম্ভোগস্মৃতির পদগুলিতেও ভাবোচ্ছ্বাস আছে। চণ্ডীদাসের "এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি। পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি" প্রভৃতি পদ ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার চণ্ডীদাসের "সই কি আর বলিব তোরে। অনেক পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া, আসিয়া মিলল মোরে॥" এই পদের অনুরূপ একটী পদও বিদ্যাপতিতে নাই।

সখি হে কি কহব নাহিক ওর।
স্বপন কি পরতেক, কহই ন পারিয়ে, কিয় নিয়র কিয় দূর॥

তড়িত লতা তলে, জলদ সমারল, আঁতর সুর সরি ধারা।
তরল তিমির, শশি সুর গরাসল, চৌদিশ খসি পড়ু তারা॥

বিদ্যাপতির এই পদ আলোচনা করিলে আমাদের পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য আরও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

দুহু মুখ হেরইতে দুহু ভেল ধন্দ।
রাই কহ তমাল মাধব কহ চন্দ॥
চিত পুতলী জনু রহু দুহু দেহ।
না জানিয়া প্রেম কেহন অছু নেহ॥
এ সখি দেখ দেখ দুহুক বিচার।
ঠামহি কোই লখই নহি পার॥
ধনি কহ কাননময় দেখিয়া, শ্যাম।
সে কিয়ে গুণব মঝু পরিণাম॥
চউকি চউকি দেখি নাগর কান।
প্রতি তরু তলে দেখ রাই সমান॥

এই পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের—

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহু কোড়ে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

এই পদের তুলনা করিলে উভয়ের বিশেষত্ব সুস্পষ্ট হইবে। আবার

কি পুছসি হে সখি কানু গুণ লেহা।
একহি পরাণ বিহি গড়ল ভিন দেহা॥
কহিল জে কহিনি পুছই কত বেরি।
কত সুখ পাবয় মঝু মুখ হেরি॥

বন্ধু মধু দরশে পরশে নহি জীব।
মো বিন্থ পিয়াসে পানি নহি পীব॥
ঘুমকে আলসে যদি পলটি হোউ পাস।
মনে ভয়ে মাধব উঠয় তরাস॥
উর বিন সেজ পরশ নহি পাই।
চিবহি বিন তাম্বুল নহি খাই॥
আন সঞে কহিনী না সহ পরাণ।
আন সম্ভাষণে হরয়ে গেয়ান॥
কহ কবিরঞ্জন শুন বর নারী।
তোহর প্রেম ধনে লুবধ মুরারি॥

বিদ্যাপতির এই পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোড়ে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥
একতনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি মোর যেন প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা বলিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে সই সব পরমাণ॥

এই পদের তুলনা করা চলে। এখানে উভয়েই কলানিপুণতা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

পিয়াক পিরিতি হাম কহই ন পার।
লাখ বয়ান বিহি ন দেল হামার॥
করে ধরি পিয়া মোরে বৈঠাওল কোর।
সুগন্ধি চন্দনে তনু লেপল মোর॥
আপন মালতি মালা হিয়াসে উতারি।
কণ্ঠে পহিরাওল যতনে হামারি॥
ফুয়ল কবরী বান্ধই অনুপাম।
তাহে বেঢ়য়ল চম্পক দাম॥
মধুর মধুর দিঠী হেরয় বয়ান।
আনন্দ জলে পরিপূরল নয়ান॥
ভণয় বিদ্যাপতি ইহ পর সঙ্গ।
ধনী ভুলল কহইতে রজনীক রঙ্গ॥

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে হয় তাহার চিতে—স্বতন্তরী নই।
তাহার গলার ফুলের মালা আমার গলায় দিল।
তার মত মোরে করি সে মোর মত হইল॥
তুমি সে আমার, প্রাণের অধিক, তেঁই সে তোমারে কই
এ যে কাজ, কহিতে লাজ, আপন মনেই রই॥
তাহার প্রেমের, বশ হইয়া, যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডী দাস, কহয়ে ভাষ, বালাই লইয়া মরি॥

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ
স্বপনে হি শুতলু কুপুরুখ সঙ্গ।

বড় সুপুরুখ বলি আওল ধাই।
শুতি রহলু মুখে আঁচর ঝাপাই॥
কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল।
মোহে জগায়ল তঁহি নিদ গেল॥
হে বিহি হে বিহি বড় দুখ দেল।
সে দুখ রে সখি অবহুঁ না গেল॥

পরাণ বঁধুকে, স্বপনে দেখিনু, বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া, ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙ্গলবরণ, বসন খানিতে, মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে, মাথাটী বাহুতে, রাখিয়া শুতল কাছে॥

* * *

অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন, কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে, রস উপজিল, জাগিয়ে হইনু হারা॥

এই সকল পদে উভয় কবির কবিত্ব ও বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এইগুলিব তুলনায় সমালোচনা করিলে দেখা যাইবে বিদ্যাপতির পদ উপমাশোভিত বিলাসভাবপূর্ণ এবং ইন্দ্রিয়ভোগ সুখব্যঞ্জক, আর চণ্ডীদাসের পদ ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ গভীর অনুভূতি প্রকাশক ও ইন্দ্রিয়ভোগের ভিতর দিয়াও ইন্দ্রিয়াতীতপ্রেমভাবব্যঞ্জক। বিদ্যাপতির প্রেমবিচিত্রতার অনেক পদে কবিতার সৌন্দর্য্য ও উপমা-চাতুর্য্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তার সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্লীলতা অতিক্রম করিলেও কবিপ্রতিভা প্রত্যেক পদেই প্রতিভাত হইয়াছে, আর সুরুচিসম্মত না হইলেও সরসতা ও মধুরতা কোথায়ও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

সেইজন্য বিদ্যাপতির সম্ভোগবর্ণনায় বা প্রেমবিচিত্রতার পদে উপমাসৌন্দর্য্য ও শব্দচাতুর্য্য এবং ছন্দলালিত্য সকল স্থলেই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সহায় হইয়াছে, কোন পদই নিতান্ত গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট (vulgar) হয় নাই। ইন্দ্রিয় ভোগবর্ণনায় এ বড় কম বাহাদুরি নহে। প্রত্যেক কবিতার একটী ভাবব্যঞ্জনা (Suggestiveness) থাকে, যাহার দ্বারা তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ণয় ও মর্য্যাদা গ্রহণ করা যায়। বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগ, মিলনঅনুরাগ ও প্রেমবৈচিত্র কেবল হাবভাব বিলাস কলা প্রকাশক এবং চঞ্চল লীলাকুশল ইন্দ্রিয় ভোগব্যঞ্জক। দেহের মিলন ও দেহের ভোগ যেমন শব্দ উপমা অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়াতীত স্বর্গীয়ভাব উপলব্ধি বা ভাবোচ্ছ্বাস কোথায়ও তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগ, মিলন, প্রেম বিচিত্রতার পদের মধ্যে, ইন্দ্রিয় ভোগের কথা, দেহের মিলনের ও সুখের কথা থাকিলেও একটা দিব্যদ্যুতি, স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই দেহের রূপ, দেহের সম্বন্ধ মিলনবিরহ সকলের ভিতর দিয়া এমন এক মধুর সুর বাজিয়াছে, যাহাতে সকল ব্যথা, সকল বিরহ সকল মিলন, সকল সম্ভোগ যেন অজ্ঞাতে স্বর্গদ্বারে লইয়া উপনীত করে। যেন বলিতে হয়—

"দিয়ে দুঃখ সুখের বেদনা আমায় তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া এলে তোমার সুর মেলিয়া
এলে আমার জীবনে।"

এখানে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয়। এই প্রাণের এক অব্যক্ত আকুলতা এক উর্দ্ধদৃষ্টি চণ্ডীদাসকে সর্ব্বদাই বিভোর করিয়া রাখিয়াছে, তাই কথায় কথায় চণ্ডীদাস কাঁদিয়া আকুল। সবই যেন তার "মরমে পশিল গো আকুল করিল মন প্রাণ।" বিদ্যাপতি ভোগের সুখের

বিলাস কলার কবি, সৌন্দর্য্যসাধনার কবি, চণ্ডীদাস প্রেমোন্মাদ ও ভাবোচ্ছ্বাসভরা দুঃখের কবি, দিব্য প্রেমসাধনার কবি।

মানের কতকগুলি পদ উদ্ধার করিতেছি, যে ইহা হইতে আবার আমরা উভয় কবির কবিত্ব সমালোচনার সুযোগ পাইব। বিস্তৃত আলোচনা না করিলেও শুধু পাঠ করিলেই বোঝা যাইবে।

সখিহে না বোল বচন আন।
ভাল ভাল হাম, অলপে চিহ্নল, যৈছন কুটিল কান॥
কাঠ কঠিন, কয়ল মোদক, উপরে মাখল গুড়।
কনয় কলস, বিখে পূরল, উপরে দুধক পূর॥
কানু সে সুজন, হাম দুরজন, তকর বচন যাই।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল কোটীকে গুটিক পাই॥
যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি সে ফুলে ধরসি বাণ।
কানুর বচন ঐ ছন চরিত কবি বিদ্যাপতি ভান॥

না কহ শ্যামের কথা।
কালা নাম দুটী, আখর শুনিতে, হৃদয়ে বাড়য়ে ব্যথা॥
আমি না যাইব সে শ্যাম দেখিতে পরশ কিসের লাগি
শ্রবণে শুনিতে শ্যাম পরসঙ্গ অন্তরে উঠয়ে আগি॥

* * *

চরণ নখর মণি রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল চাঁদ।
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন লোর।
কতরূপে মিনতি করল পহু মোর॥
লাগল কুদিন কয়ল হাম মান
অবহু ন নিকসয় কঠিন পরাণ॥

রোখ তিমির এত বৈরি কিয় জান।
রতনক ভৈগেল গৈরিক ভান॥
নারি জনমে হাম না করল ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে কহ ভন সমুঝাই॥

আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর নটবর শেখর কাঁহা সখি করল পয়ান॥

*　　　*　　　*

বিরহ ও মাথুরের কয়েকটী পদ উপস্থিত করিতেছি-

হরি গেল মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈসে মালতীক মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গে দুখ মোর পাস॥
ভনই বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥

পিয়া গেল দূর দেশে হাম অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাণী॥
পরশে সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে॥

কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে।
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া পাথারে ॥
গরল আনিয়া দেহ জিহ্বার উপরে।
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে ॥
চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।
কানু সে পরাণ নিধি আপনি মিলিবে ॥

হাম অভাগিনী দোসর নহি ভেলা।
কানু কানু করি জনম বহি গেলা ॥
আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক যত গুণ বিসরিত ভেলা ॥
মনে মোর যত দুঃখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুঃখ নাহি জানে লোকে ॥
ভণয় বিদ্যাপতি শুন ধনি রাই।
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই ॥

অকথ্য বেদনা সই কহা নাই যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরি কান্দে তার চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ধুলায় লুটায় ॥
পুছয়ে পিয়ার কথা ছলছল আঁখি।
তুমি কি দেখেছ কালা কহনারে সখি ॥
চণ্ডীদাস কহে কাঁন্দ কিসের লাগিয়া।
সে কালা রয়েছে তোমার হৃদয় জাগিয়া ॥

বিরহ বর্ণনায় উপরের পদগুলিতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, কিন্তু নিম্নলিখিত পদগুলিতে বিদ্যাপতির প্রেম-বিহ্বলতা অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পদে চণ্ডীদাস দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি

(১) কে কহ আওব মাধাই।

বিরহ পয়োধি, পার কিয়ে পাওব, মঝু মনে নহি পতিয়াই ॥

এখন তখন করি, দিবস গমাওল, দিবস দিবস করি মাসা।

মাস মাস করি, বরস গমাওল, ছোঁড়লু জীবনক আশা ॥

* * *

(২) নাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ।

আঁকুরে ভাঙ্গল বিনি অপরাধ ॥

সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।

জলদ নিহারী চাতক মরি গেল ॥

আন করহ হিয়ে বিহি কৈল আন।

অব নহি নিকসয় কঠিন পরাণ।

শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান।

শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ ॥

বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।

মরণ সমাপন প্রেম বিথারী ॥

(৩) মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।

কানু হেন গুণ নিধি কারে দিয়া যাব ॥

* * *

(৪) জতএ সতত বৈইসে রসিক মুরারি।

তত্তএ লিখিহ মোর নাম দুই চারি ॥

সখিগণ গণইতে লইহ মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি মোর বাম॥
দিনে এক বেরি পিয়া লএ মোর নাম।
অরুণ তুলহ করে দএ জল দান॥
ইহ সব আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥
নিচয় মরব হাম কানক উদেশ।
অবসর জানি মাগব সন্দেশ॥

উপরে উদ্ধৃত (৩) পদটী পদকল্পতরু ও পদকল্পলতিকায় থাকিলেও নগেন্দ্র-বাবু একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ-বিষয়ে শেষ মীমাংসা পর্য্যন্ত ইহাকে বিদ্যাপতির বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত পদ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আর বিদ্যাপতির না হইলেও এই সুমধুর প্রাণস্পর্শী চির-পরিচিত পদ একেবারে দূরে ফেলে দেবার মত মোটেই নয়, বরং শ্রেষ্ঠ পদাবলী সংগ্রহে অতি উচ্চ স্থান পাইবার উপযুক্ত। এই জাতীয় তথাকথিত মেকি পদগুলি আসলের অপেক্ষা আরও পরম সুন্দর, পরম উজ্জ্বল।

চণ্ডীদাস

(১) সখিরে, মথুরা মণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলি, পুন না আসিল, কুলিশ পাষাণ হিয়া॥
আসিবার আশে, লিখিনু দিবসে, খোয়ানু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে, পথ নিরখিতে, দু আঁখি হইল অন্ধ॥

* * *

(২) ধিক্ রহু জীবনে যে পরাধীন জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক পরাধীন হয়ে॥

এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল।
সুধার সাগরে মোর গরল হইল॥

* * *

অতএ এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুই এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জান।
দারুণ পীরিতি মোর বধিল পরাণ॥

(৩) ও পারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণ নিধি।
পাখী হইয়া উড়ি যেতে পাখা না দেয় বিধি॥
যমুনাতে দিব ঝাঁপ না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে ছিঁচো না ঘুচে পাথার॥
মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
সাধ করে বড়ই গো কানু দেখিবারে॥

* * *

(৪) সখি কহিবি—কানুর পায়।
সে সুখ সায়র, দৈবে শুকায়ল, তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি ধরিবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি, মাগিয়া লইবি বর॥

চণ্ডীদাস প্রেমভিখারিণী নিরভিমানী বিরহকাতরা তদ্গতপ্রাণা রাধার যে আক্ষেপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বেদনার অসহ্য তীব্রতা-বোধ ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দাবীদাওয়াকে তেমন করিয়া সুস্পষ্ট করে নাই, যেমন বিদ্যাপতির পদে করিয়াছে। আবার বিদ্যাপতির ভাবোল্লাসের পদাবলীর মধ্যে কেবল দুই একটীতে স্বর্গীয় ভাব-দীপ্তি

প্রকাশিত হইয়াছে, আর বাকীগুলি শব্দ কৌশলে উপমা-চাতুর্য্যে, জগতের প্রেম-কবিতার সাহিত্যে অতি দুর্লভ হইলেও, চণ্ডীদাসের ভাবসম্মিলনের পদের সহিত তুলনা করা চলে না।

তবে বিদ্যাপতির ভাবোল্লাসের অনেক পদই পরম রমণীয়, যদিও অনেক স্থলেই দৈহিক মিলনের উল্লাস বর্ণনা বলিয়া পদে পদে সুরুচি ও শ্লীলতাকে অতিক্রম করিয়াছে। এমন সুন্দর চিত্র, এমন শ্রুতিমধুর ও হৃদয়স্পর্শী শব্দ-তুলিকায় চিত্রিত, এমন জীবন্ত উজ্জ্বল চিত্রপট যে অতি সুরুচিবাদীকেও অতি অনিচ্ছায়ও এই সকল পদের মধুরতা ও সার্থক সৌন্দর্য্য চিত্রনকে পরম রমণীয় বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, গীতি-কবিতা সাহিত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

"হমার মন্দিরে যব আওব কান। দিঠি ভরি হেরব সে চান্দ বয়ান॥" "হরি যব আওব গোকুলপুর। ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয় তুর॥" এই জাতীয় পদ সাহিত্যের ভাণ্ডারে অতুলনীয় সঞ্চয়। বিদ্যা-পতির যে দুইটী পদের কথা বলিয়াছি যাহার যে কোন একটী লিখিয়াই বিদ্যাপতি অমর কবি হইতে পারিতেন, সেই পদ দুইটী উদ্ধার করিতেছি। নগেন্দ্র-বাবুর সংস্করণে—"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর" এই চিরপরিচিত বহু শ্রুত পদটীকে নিতান্ত পরিবর্ত্তিত আকারে উপস্থিত করা হইয়াছে। প্রথম পদটী কাব্যবিশারদের সংস্করণ হইতে উদ্ধার করিলাম—

আজু রজনী হাম, ভাগ্যে পোহায়নু, পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন, সফল করি মাননু, দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মাননু, আজ মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি, মোহে অনুকূল হোয়ল, টুটল সবহু সন্দেহা॥

সোই কোকিল, অব লাখ ডাকউ, লাখ উদয় কর চন্দা।
পাঁচবাণ অব, লাখবাণ হউ, মলয় পবন বহু মন্দা॥

এই পদের তুলনা জগতের গীতিসাহিত্যে কোথায়ও মিলে না এবং ইহার ভাবোচ্ছ্বাস সকল হৃদয়কেই অভিভূত করে।

শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি, লইয়া হৃদয়ে তুলি, রাখিতে না সহে অবকাশ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চাঁদ, পাতিয়া পীরিতি ফাঁদ, কমলিনী পাওল মধুপ॥
রসভরে দুহুঁ তনু, থর থর কাঁপই, ঝাঁপই দুঁহু দোঁহা আবেশে ভোর।
দুহুক মিলনে আজি, নিভায়ল অনল, পাওল বিরহক ওর॥

চণ্ডীদাসের এই পদ সুন্দর কবিত্বপূর্ণ হইলেও বিদ্যাপতির "আজ রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়লু" পদ হইতে অনেক নিম্নে। বিদ্যাপতির দ্বিতীয় পদ পরিবর্ত্তিত আকারে উপস্থিত করিতেছি—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
দারুণ বসন্ত—যত দুখ দেল।
হরি মুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
যতহুঁ আছিল মোর হৃদয়ক সাধ।
সে সব পূরল হরি পরসাদ॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরক পানে বিরহ দূর গেল॥

* * শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমৈশ্বর্য্যের প্রতি চিরবিশ্বাসময়ী, মুগ্ধার মৃত্যু-যাতনাও আমাদিগকে মোহিত করে, সে বিরহকথা মর্ম্মান্তিক হইলেও তাহা এক স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যের গুণে চিত্ত আকর্ষণ করে। * * * চণ্ডী-দাসের বর্ণিত রাধিকা—প্রথমই উন্মাদিনী বেশ; প্রেমের মলয়সমীরে তিনি ফুটিয়া রহিয়াছেন। তাহার পর প্রেমের বিহ্বলতা কত কাতর অশ্রুর সম্পাত কত দুঃখের নিবেদন কত কাতরোক্তি। ভালবাসার দুঃখের প্রতিশোধ অভিমান; কিন্তু তাহা আত্মবঞ্চনা মাত্র। চণ্ডীদাসের রাধার মান করিবারও সাধ্য নাই, দশ ইন্দ্রিয় মুগ্ধ, মন মান করিবে কিরূপে? ইহা অপূর্ব্ব তন্ময়ত্ব।”

সহজিয়া সম্প্রদায় ও রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব।

সম্প্রতি একটী কথা উঠিয়াছে, রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব বৌদ্ধ মহাযান ও সহজযানের রূপান্তর মাত্র। কেহ কেহ প্রত্নতাত্ত্বিক মোহে মুগ্ধ হইয়া এই মত অতি আগ্রহের সহিত পোষণ করেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মতত্ত্ব ও মহাযান ও সহজযানের তত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, এই মতের বাস্তবিক কোন ভিত্তি নাই। আপাত প্রতীয়মান আংশিক সাদৃশ্যকে মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্ব ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি ও উপস্থিত বিষয়ের আলোচনার সুবিধার জন্য কোন কোনও বিষয়ের নূতন অবতারণা করিতে হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্ম ভক্তিধর্ম্ম হইলেও জগতের অন্যান্য ভক্তিধর্ম্ম হইতে ইহার একটু বিশেষ পার্থক্য আছে, আর ইহার সাধন প্রণালীতেও সেইজন্য বিশিষ্টতা

দেখা যায়। প্রথম তত্ত্ব ঈশ্বর পরম সম্পদ পরমানন্দ। এই আনন্দ জগতের সকল নরনারীর জন্য সমানভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। এই আনন্দ বিলাইবার জন্য পরমানন্দ ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন, কারণ এই দ্বারে "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।" দ্বিতীয় তত্ত্ব তিনি নর-নারীর ভিতরে আপনাকে চিরপ্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন—নর নারায়ণ রূপে নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন।

প্রাকৃতা প্রাকৃত সৃষ্টি যত জীবরূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল স্বরূপ॥
পৃথিবী যৈছে ঘট কুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি তুমি সর্ব্বাশ্রয়॥

(চৈতন্য চরিতামৃত)

তৃতীয় তত্ত্ব জীব সেই নিত্যানন্দকে নিত্য চাহিতেছেন কেবল তাহা নহে, সেই নিত্যানন্দ জীবকে চাহিতেছেন। এই মধুরলীলা সুধা ধারায় বৈষ্ণবকবির সাহিত্য বৈষ্ণব সাধকের সাধনা অভিসিঞ্চিত ও মধুর হইয়া রহিয়াছে। পতিতপাবন কাঙ্গালশরণ অধমতারণ ঈশ্বর যখন প্রেমিক ঈশ্বর হইলেন, তখন পৃথিবীর দুঃখী কাঙ্গালের দীন হীনের মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমাকে উদ্ধার করিয়া কৃতার্থ করিবেন, তাহা নহে আমাকে লইয়া তাঁর প্রেমানন্দলীলা, আমাকে ফেলিয়া তাঁর চলে না। এত দিন ভক্তিধর্ম্ম বলিতেছিল তাঁকে ফেলিয়া মানুষের চলে না, মানুষকে পথের ধূলায় তিনি ফেলিয়া রাখেন না। আমাকে নহিলে তাঁর চলে না এই নূতন স্বর্গের বারতা—মানব চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা ও সাধনাকে এক পরম গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। মানুষের ধূলার আসন ধন্য করে, তিনি এক সাথে আসিয়া বসিলেন। আবার "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।" শুধু কি

প্রেমই মিছে হতো সেই অসীমসুন্দর অনন্তরূপরসাধার মিছে হ'য়ে যায়, আমাকে বাদ দিলে। এই কণার কণা ধূলি-মলিন আমাকে নিয়েই তিনি অসীম অনন্ত। এই কণার কণা বাদ পড়িলেও তাঁর অনন্তত্ব ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই আমি না গেলে তিনি কেঁদে ফিরে যান। তিনি আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন, আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন, আমি নহিলে তাঁর রসের খেলা, প্রেমের লীলা অপূর্ণ থেকে যায়।

"প্রেমের প্রাণে সইবে কেমন করে'
তোমার যে জন সে যদি গো
দ্বারে দ্বারে ঘোরে।
কাঁদিয়ে তারে ফিরিয়ে আনো
কিছুতেই ত হার না মানো
তার বেদনায় তোমার অশ্রু
রইল যে গো ভরে'।"

মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর স্বর বংশী গীতে আকর্ষে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
* * *
এই মত জগতের আমি সুখহেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

চতুর্থ তত্ত্ব তিনি যে কেবল মানবের বিশিষ্ট আত্মবোধের নির্জ্জন দেবালয়ে আপনাকে প্রকাশ করেন তাহা নহে, স্ত্রীরূপে, বন্ধুরূপে, পুত্ররূপে তিনি আমাদের প্রেম গ্রহণ করিতেছেন ও আমাদিগকে প্রেম দিতেছেন।

পঞ্চম তত্ত্ব তিনি "রসো বৈসঃ"। সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়া, সকল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ভিতর দিয়া, সকল আনন্দের ভিতর দিয়া, সকল সম্ভোগের ভিতর দিয়া তিনি আপনাকে রসস্বরূপরূপে প্রকাশিত করিতেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানসিক আত্মিক সকলপ্রকার সম্ভোগের ভিতরে রসস্বরূপকে উপলব্ধি করাই পরম সম্ভোগ ও পরম সার্থকতা। শুদ্ধ রসের সম্বন্ধেতেই অহেতুক সত্য অনুরাগ জাগিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ অনুরাগের জন্য শ্রেষ্ঠ রসাস্বাদন আবশ্যক।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মসম্প্রদায় এই সকল তত্ত্বের সমুদায়কে আত্মসাৎ করিয়া অপূর্ব্ব মধুর রস সাধনার স্থষ্টি করিলেন। সেই নিখিল রসামৃত মূর্ত্তি নিত্যানন্দ এই দীন হীন আমাকে চাহিতেছেন, তিনি আমার প্রেমভিখারী। আমাকে পাইলে তাঁহার সকল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের সার্থকতা সকল প্রকাশের পরিপূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

আমায় তুমি কর্‌বে দাতা আপনি ভিক্ষু হবে।
বিশ্বভুবন মাতল যে তাই হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ঐ রথে নাম্‌বে ধূলা পথে।
যুগ যুগান্ত আমার সাথে চল্‌বে হেঁটে হেঁটে॥

প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সর্ব্ব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে মোর নহে প্রীত॥

অনুরাগে কালিয়া গলার মালা, কালিয়ার লাবণ্য অন্তরে লাগিয়া আছে, সম্ভোগমিলনে কালা হৃদয়ে জাগিয়া আছেন, অভিসারে শ্যাম গুণগান করিতে করিতে চলিয়াছেন ; এই সকল ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেমোন্মাদময় আত্ম-বিসর্জ্জনের মধুময় পদ যিনি রচনা করিয়াছেন, বাহিরের সৌন্দর্য্য দেহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তরের সৌন্দর্য্য অধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শী অমর প্রেমের মাধুর্য্য যিনি সর্ব্বত্র দেখেন, তাঁর পক্ষে এই জাতীয় পদ-রচনা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। রামীকে ভাল বাসিয়াই তাঁহার যত বিপদ। রামীর প্রেম যে বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে পারে, স্বর্গের প্রেম মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিতে পারে, এ কথা ভুলিয়া তন্ত্রের এক শ্লোক তুলিয়া বামাচারের সাধিকারূপে রামীকে উপস্থিত করিতে গিয়া সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। রামীব উদ্দেশে রচিত পদ-গুলিতে অন্য দুই একটী কথা যোগ করিয়া রাগাত্মিক অন্য পদের সহিত মিল করা হইয়াছে। সহজিয়া সম্প্রদায়ের বা বাউল সম্প্রদায়ের কোনও কবি যশঃপ্রার্থী মহাত্মা এই পদগুলি চণ্ডীদাসের ছাঁচে রচনা করিয়া তাঁহার নামে চালাইয়াছেন। "উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী কিশোরী গলার হার" প্রভৃতি ভাব সম্মিলনের কয়েকটী পদে যে ঘন ঘন কিশোরী শব্দের অবতারণা দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তী প্রক্ষেপ বা পাঠবিকৃতি হওয়া অসম্ভব নহে। দশম শতাব্দীতে কাহ্নভট্ট সহজযানের পদাবলী রচনা করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন। চণ্ডীদাসের সম-সাময়িক এবং পরবর্ত্তী বাঙ্গালা সাহিত্যে সহজযানের উল্লেখ দেখা যায় না। সহজযান হয় কাহ্নভট্টের পদাবলীর সহিত দেশান্তরিত হইয়াছিল না হয় তান্ত্রিক বামাচারে রূপান্তরিত হইয়াছিল ; আর কোন-ভাবে সহজিয়া সম্প্রদায় থাকিলেও অতি নগণ্য ও অবজ্ঞেয় ছিল।

শ্রীচৈতন্যযুগের সাহিত্যেও সহজিয়া সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ নাই। বামাচারীদিগের কথা, বৌদ্ধদিগের কথা, অদ্বৈতবাদীদিগের কথা চৈতন্য চরিতামৃতে ও চৈতন্য ভাগবতে পাওয়া যায়, নৈয়ায়িক পণ্ডিতের কথাও আছে, কিন্তু সহজযানের কোন উল্লেখ নাই। চৈতন্য ভাগবতে দেখা যায়, বৈষ্ণবদ্বেষীরা বৈষ্ণবদিগকে নানা কথা বলিয়া কুৎসা করিতেছেন, গোপনে মদ্যমাংস খায় বলিয়া ঈঙ্গিত করিতেছেন, কিন্তু সহজযানের কুৎসিত সাধনপ্রণালীর সঙ্গে যদি প্রচলিত বৈষ্ণব সাধনের কোন মত গত সৌসাদৃশ্য বা কোনপ্রকারের সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য থাকিত, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। বরং আরো নানা ভাবে অতিরঞ্জিত করিয়া এই উভয় সাধনের নিকট কুটুম্বিতা প্রতিপন্ন করিতেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় "অভেদ পুরুষ নারী যখন জানিবে তখন প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ে জাগিবে" প্রভৃতি পদে দীনেশবাবু তৎকালীন রমণী-সঙ্গ-বিলাসমূলক সহজযানের ধর্ম্মকে ঈঙ্গিত করা হইয়াছে বলেন, কিন্তু এই পদ বামাচার ও ভাবী স্বেচ্ছাচারকে প্রশমিত করিবার জন্যও রচিত হইতে পারে। প্রক্ষেপও হইতে পারে।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন সহজযানের ধর্ম্মমতের প্রভাব (Spirit of the Sahajia Cult) চণ্ডীদাসের ধর্ম্মমতকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী সহজিয়া সাহিত্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। চণ্ডীদাসের ধর্ম্মমত যে শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্ম্মতত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে এই তত্ত্ব অধিকতব পরিস্ফুট আর পদাবলীসাহিত্যে তাহার পূর্ণ বিকাশ। আর যে সহজিয়া পদাবলী অন্যান্য বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের সহিত দেশান্তরিত হইয়াছিল এবং চণ্ডীদাসের যুগে প্রচলিতও ছিল না অন্ততঃ প্রচলিত ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই, সেই অপূর্ব্ব সহজিয়া-পদমাধুরী চণ্ডী-

দাসকে অভিভূত করিল! আর গানে কীর্ত্তনে কথকতায় পাঁচালীতে যে রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা কীর্ত্তিত হইতেছিল, সেই পাচালী ভাগবত কথা জয়দেবের গীতগোবিন্দ কিছুই চণ্ডীদাসের পদাবলী রচনায় কোন অনুপ্রাণনাই দিতে পারিল না বা দিল না!

চণ্ডীদাসের যুগে বৈষ্ণব সাধনার আগমনী সঙ্গীত গীত হইতেছিল। পরে যখন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল, বৈষ্ণব সমাজ গঠিত হইল এবং চণ্ডীদাস আদি বৈষ্ণব কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং তাঁহার পদাবলী বৈষ্ণবগণের নিত্য উপাসনার সহায় হইল ও তাঁহার রাধাকৃষ্ণ-লীলাবর্ণনা উপাসনাতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হইল, তখন কোন সুচতুর সহজিয়া সম্প্রদায়ের কবি নিজেদের মতের কৌলিন্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে চণ্ডীদাসের নামে এই রাগাত্মিক পদগুলি চালাইয়া দিলেন। এই তথা-কথিত সহজ সাধন বৌদ্ধযুগের মহাযান সম্প্রদায়ের বিবর্ত্তন ও তান্ত্রিক বামাচারের রূপান্তর এবং শ্রীচৈতন্যযুগের শেষে বৈষ্ণব আকার ধারণ করিয়া আউল-বাউল কিশোরী ভজা সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। বৈষ্ণবসমাজে আশ্রয় লাভ করিয়াও এই সম্প্রদায় নিজেদের কুৎসিত সাধন প্রণালী ও নিজেদের সম্প্রদায় স্বতন্ত্রতা বরাবর রক্ষা করিয়াছে। এমন কি অদ্যাপি ইহাদের নানা গুপ্ত সাধন কেন্দ্র আছে, যেখানে যথেচ্ছ ব্যভিচার পরম ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। পরিষৎ পত্রিকায় খগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ করিয়া সহজিয়ারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের লীলারস আপনাদের প্রয়োজনোপযোগী করিয়া তাহার ব্যভি-চার ঘটাইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্ম্মতত্ত্বের স্বাভাবিক সার্থক বিকাশ ও পূর্ণ অভিব্যক্তি, ঘুণাক্ষরেও সহজযানের নিকট ঋণী নহে। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য তৎকালপ্রচলিত শিব মনসা ও চণ্ডীর গান ও পাঁচালী এবং রাধাকৃষ্ণ লীলাকীর্ত্তনের দ্বারা অনুপ্রাণিত

এবং তৎকালপ্রচলিত সাহিত্যের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ; নির্ব্বাসিত ও অপ্রচলিত দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকাপূর্ণ সদ্য প্রাপ্ত সহজিয়া সাহিত্যের সহিত ইহার কোন রক্ত সম্বন্ধও নাই অথবা নিকট কুটুম্বিতা বা সৌহার্দ্দ্যও নাই।

পদাবলী সাহিত্যের অশ্লীলতা

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনে কোন অশ্লীলতা আছে কি না, তাহার আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। লোকধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য ভাগবতকার রাসমণ্ডলস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীরাধাকে আয়ান-পত্নী না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিত পত্নী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবার রাধাকৃষ্ণকে প্রকৃতি পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া, এই ব্রজলীলার আপাত-দৃশ্যমান লৌকিক দোষক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন "গোপবধূগণ পর স্ত্রী এবং পর দার গমন পাপ। মানব দেহধারী কৃষ্ণ লোকশিক্ষক হইয়া পারদারিক পাপাচারী হইলেন এই জন্য পুরাণকার দোষক্ষালনের নানা ব্যবস্থা করিয়াছেন।" গোগবধূগণ পর স্ত্রী হওয়াতে যে বিপদ তাহা বঙ্কিমবাবু বেশ বুঝিলেন, কিন্তু পর স্ত্রী না হইয়াও যদি গোপাঙ্গনারা গোপবধূ না হইয়া গোপ কুমারী হইতেন তাহা হইলেই কি বিপদ কাটিত? বঙ্কিমবাবুর হিন্দুজনোচিত স্বাভাবিক ভাব (Hindu Sentiment) এই বহু গোপ কুমারীর সহিত লীলাকে তেমন গর্হিত মনে করিত না কারণ বহু-বল্লভতা তত সমাজ বিরুদ্ধ নহে। একনিষ্ঠ অনুরাগ ও প্রেমোন্মাদ

বর্ণনায় এই গোপবধূগণের পরিকল্পনা বর্ত্তমান রুচি মতিগতি অনুসারে অতি অদ্ভুত। এই বহু গোপীদিগের সহিত লীলা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ রাধার পরম প্রিয় হইয়া রহিয়াছেন আবার গোপীগণেরও সকলেরই প্রাণ বল্লভ হইয়া রহিয়াছেন। আবার অন্যদিকে এই কৃষ্ণগত প্রাণা গোপবধূ-দিগের পরিকল্পনা রাধাকৃষ্ণ লীলাবর্ণনাকে পরিস্ফুট ও পরম উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। গোপীরা রাধাকৃষ্ণ মিলনের সহায়, রাধার হইয়া কৃষ্ণকে দুকথা শুনাইয়া দেন, আবার কৃষ্ণ অদর্শনে অধীর হইয়া পড়েন। জগতের প্রেমের সাহিত্যে এই অপূর্ব্ব প্রেমময়ী ব্রজগোপীদিগের চিত্রের ন্যায় অতি অপরূপ মনোহর, পরম সুন্দর সার্থক সফল পরিকল্পনা আর কোথাও নাই।

গোপিকা করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাঞি সুখ হয় কোটীগুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়॥

* * * *

কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন।
তাহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

গোপীদিগের এই বর্ণনায় গোপী ভাবের অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ও অন্যান্য পুরাণের রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনার ভিতরে কোথায় কি সুরুচি বিরুদ্ধতা বা সমাজদ্রোহিতা বা লোকধর্ম্ম সমাজধর্ম্মগ্লানিকর ভাব রহিয়াছে, তাহার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে যদি মানব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি শ্রীভগবান্ বলিয়াই মানবধর্ম্মের বিধিবহির্ভূত।

আর তাঁহার পক্ষে অলৌকিক অতি প্রাকৃত কার্য্য (Miracle) অতি স্বাভাবিক। যা-হ'ক সে সব বিষয়ের আলোচনায় যোগ্যতর ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইয়া এই দেশের ধর্ম্মসাহিত্যের আপাত-দৃশ্যমান গ্লানি অচিরে দূর করিবেন এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। কোন সাহিত্য কোন ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত সুপরিচিত না থাকিলে কেবল ভাসা ভাসা ভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা করিয়া মন্তব্য করিতে গেলে কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা বঙ্কিমবাবুর সমালোচনা পাঠ করিলে বোঝা যায়। বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন "বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভাগবতের ব্রজলীলার নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া—ঐ লীলার উপরে ভাসমান কাম কুসুম দামের মালা গাঁথিয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণতাময় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছেন।" বঙ্কিমবাবু, জয়দেব ও বিদ্যাপতির তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন, আবার জয়দেবের উপর কৃপাকটাক্ষও করিয়াছেন। "যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনমহোৎসব।" যাহা হউক, বিদ্যাপতির সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকার কথা, কিন্তু বিদ্যা-পতির সমালোচনায় তাঁহার বিচারবুদ্ধি ও প্রকৃত মর্য্যাদাজ্ঞানের (Right appreciation and correct critical sense) পরিচয় পাওয়া যায় না। কামকুসুমদামের বিচিত্র মালাশোভিত বিদ্যাপতির পদে বিদেশী পণ্ডিত গ্রিয়ারসন্ (First yearnings of the soul after God, full possession of the soul by love for God এবং estrangement of the soul from God) ঈশ্বর লাভের জন্য আত্মার প্রথম ব্যাকুলতা, ঈশ্বর প্রেমে আত্মার পরিপূর্ণতা এবং ঈশ্বর হইতে আত্মার বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি দর্শন করিয়াছেন। অতিশয় অশ্লীল পদও গ্রিয়ারসন্ অনুবাদ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

কারণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনার ভিতরে পরমাত্মার সম্বন্ধ বিবৃত হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। জনবিম্‌স্ বিদ্যাপতি ও বৈষ্ণব কাব্য পারস্য দেশের সুফী কাব্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। পণ্ডিত সিলভ্যান লেভি চণ্ডীদাসের পদমাধুর্য্যের ও আবেগপূর্ণ প্রেমবর্ণনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মেসিন ক্লেয়ার র‍্যাটক্লিফ প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের অনেক পাশ্চাত্য লেখকগণও বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে ইহার অতি গৌরবময় উচ্চস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভক্তিমার্গে ঈশ্বর সাধনার যত প্রকার প্রণালী আছে, তন্মধ্যে মধুর-ভাবাত্মক উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। খৃষ্টান সম্প্রদায়েও এই মতের প্রভাব দেখা যায়। ডাক্তার ইংএর (Dr. Inge) উদ্ধৃত সেণ্ট জুয়ানের উক্তি এই—"I will draw near to thee in silence and will uncover thy feet, that it may please thee to unite me to thyself. Make myself thy bride, I will rejoice in nothing till I am in thy arms" আমি নীরবে তোমার দিকে অগ্রসর হইব, তোমার চরণ-পাদুকা মোচন করিব, যাহাতে তুমি দয়া করিয়া আমাকে তোমার সহিত মিলিত কর। আমাকে তোমার বধূ কর আমি যে পর্য্যন্ত তোমার আলিঙ্গন না লাভ করি সে পর্য্যন্ত কিছুতেই আনন্দিত হইব না। পণ্ডিত নিউম্যান বলিতেছেন, যদি তোমার আত্মা উচ্চ অধ্যাত্ম রাজ্যের নিত্যানন্দধামে প্রবেশ করিতে চায় তবে তাহাকে রমণী হইতে হইবে; মনুষ্য সমাজে যতই তোমার পুরুষকারের গর্ব্ব থাক, এখানে রমণী হওয়াই আবশ্যক! "If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it must become a woman; yes, however manly thou may be among men." খৃষ্টিয় সমাজে অনেক ভক্তিমতী নারী আপনাকে

খ্রীষ্টের বধূরূপে কল্পনা করিয়া ভক্তি সাধন করিতেন। এই মধুর ভাবের ভিতরে অন্য সকল ভাবের গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিবার সময় এই বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শান্ত—নিষ্ঠাময়

দাস্য—সেবা ও নিষ্ঠাময়

সখ্য—বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও সেবাময়

বাৎসল্য—মমতা নিষ্ঠা সেবা ও বিশ্বাসময়

মাধুর্য্য—আত্মসমর্পণ, মমতা, নিষ্ঠা, সেবা ও বিশ্বাসময়

সুতরাং "মধুর রসের হয় পঞ্চগুণ।" এই পঞ্চগুণ লাভ করিলে তবে মধুররস সাধনার দ্বারে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহা লাভ করিতে কত তপস্যা, কত ঐকান্তিকতা আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মধুর ভাবের উপাসক এই সকল ভাবে পূর্ণ হইয়া শ্রীভগবানকে পতি স্বরূপ ও নিজেকে পত্নীস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সাধন পথে অগ্রসর হন। বৈষ্ণবসাধক শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষ পতি ও নিজকে প্রথমে শ্রীরাধার অনুগতা সখী ও অবশেষে সাধনায় অগ্রসর হইলে নিজকে মহাভাবময়ী শ্রীরাধা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই ভাব সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক কোন অংশেই শারীরিক নহে। কোথায়ও বৈষ্ণবসাহিত্যের কোনস্থলে বৈষ্ণব সাধক আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া মধুররস আস্বাদন করিবার প্রস্তাব করেন নাই। এখানেই সহজযান ও বামাচারের সহিত বৈষ্ণবসাধনতত্ত্বের মৌলিক পার্থক্য। ভগবানকে পতি জ্ঞান করিয়া তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ ও প্রেম, সেবা, নিষ্ঠা ও বিশ্বাস লইয়া তাঁহার সেবা করা বড় সহজ

কার্য্য নহে, তাই এই সাধনা সাধারণের পক্ষে সহজ সম্ভব নহে বলিয়া শ্রীচৈতন্য অন্তরঙ্গের সঙ্গে লীলা-রস আস্বাদন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভাগবতে যাহা ক্ষুদ্র বীজ মাত্র ছিল তাহাই বৈষ্ণব-মধুররসসাধনার নির্ম্মল বারিধারা বর্ষণে প্রেম পারিজাতরূপে বিকশিত হইয়া উঠিল। রাধা কৃষ্ণের লীলাকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ববস্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জগৎবাসী নরনারীর জন্য প্রচার করিলেন। ভক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব ইহা হইতে অদ্যাপি আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

অনেকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ভিতরে এই মধুর রস-সাধনার তত্ত্ব বস্তুকে স্বীকার করিলেও এবং ইহার উপযোগিতা মানিয়া লইলেও পূর্ব্বরাগ অনুরাগ মিলন ও সম্ভোগ লীলায় যে শারীরিক সুখ ইন্দ্রিয় ভোগ রতি বিলাসের সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে, তাহা অসঙ্গত অশ্লীল ও অপবিত্র বলিয়া মনে করেন। সতীশবাবু তাঁহার জয়দেবের ভূমিকায় ৭২ পৃষ্ঠা হইতে ৯২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই কুরুচি ও অশ্লীলতার নানা অক্ষম কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লইলে তাঁহার ব্রজ-লীলার কৈফিয়ৎ সহজ হইয়া আসে, কিন্তু তাই বলিয়া জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্ভোগ বর্ণনার ভিতরে যে ইন্দ্রিয়ভোগের নানা ছবি রহিয়াছে তাহাতে উচ্চাঙ্গের কোন ভাবও প্রতিফলিত হয় নাই অথবা আত্ম-সমর্পণকেও উজ্জ্বল বা সুপরিস্ফুট করে নাই, কেবল সাধারণ রতি বিলাস কলা হাবভাব নিপুণতাই প্রকাশ করিয়াছে, কেহ এ কথা বলিলে তাহার কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় না।

বৈষ্ণব সাধনার তত্ত্ব বস্তুর প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিলাস কলা হাবভাব নিপুণতার কোন প্রয়োজন ছিল না বলিয়া বোধ হয়। ভক্তি ধর্ম্ম উদ্দীপনার সহায় ত মোটেই না তথাপি বৈষ্ণব কবিগণ ইহাকে সমাদরে স্থান দিলেন কেন তাহা আমার মত (Intensely passio-

nate devotion ও religious mysticism) তীব্র আসক্তিপূর্ণ অনুরাগ ও ধর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞতাশূন্য লেখকের পক্ষে নির্ণয় করা সুকঠিন। কাব্যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির জন্য ইহার যদি কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকে, তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও যে পদাবলী বৈষ্ণব ভক্তেরা সন্ধ্যাহ্নিকের মত নিয়মিত প্রতি দিন ভক্তি সহকারে পাঠ কীর্ত্তন করেন তাহাতে এই রস-রঙ্গকলার বিস্তৃত বর্ণনার কোন উপযোগিতাই সাধারণ পাঠকের চোখে পড়ে না। সতীশচন্দ্র রায় 'তথাকথিত অশ্লীলতা' বলিয়া অনেকটা উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্ভোগবর্ণনা সাধারণ নায়ক নায়িকার সম্ভোগবর্ণনা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, তজ্জন্যই প্রেমিক ভক্তদিগের হৃদয়ে কুভাবের উদ্দীপক নহে বলিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে সুবিস্তৃত বিলাসকলা রতিবিলাসপূর্ণ সম্ভোগবর্ণনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হইল না।

তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বিস্তৃত রূপবর্ণনা ও সুনিপুণ সম্ভোগবর্ণনা পদাবলীর কবিতাকে ও সৌন্দর্য্য প্রকাশকে উজ্জ্বল জীবন্ত ও বস্তুতন্ত্র করিয়াছে। বৈষ্ণবকবিদিগের পদাবলী যখন কেবল সৌন্দর্য্যসৃষ্টির কাব্য নহে, অথবা সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রেমগীতি নহে তখন এই পদাবলীতে কাব্যের সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দোহাই দিয়া এই অশ্লীল বর্ণনাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। বর্ত্তমান যুগে নানা স্বনাম প্রসিদ্ধ বস্তুতন্ত্র (Realistic) উপন্যাসে যে রতিবিলাস ও সম্ভোগ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে না আছে বর্ণনাসৌন্দর্য্য, না আছে কোন সার্থকতা, তথাপি বর্ণিত বিষয়কে এই বস্তুতন্ত্র করিবার জন্য শ্লীলতা ও সুরুচিকে অকারণ অতিক্রম করা হইয়াছে, কিন্তু এমনি যুগধর্ম্মের মাহাত্ম্য যে বর্ত্তমান সভ্য সমাজের কোন নর নারীকে এই

জাতীয় কদর্য্য উপন্যাসের অশ্লীলতা মোটেই লজ্জিত বা পীড়িত করে না। আর্টে কাব্যে সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা যদি ভব্যতা শ্লীলতা ও রুচির উপরে, শিষ্ট সৌন্দর্য্যবোধের উপরেই স্থান পাইবার যোগ্য হয়, তবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, পদাবলীর বস্তুতন্ত্র বর্ণনায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর-প্রেমলীলা অত্যন্ত বাস্তব (Realistic) হইয়া উঠিয়াছে এবং বর্ত্তমান যুগের বস্তুতন্ত্র-বর্ণনা-পূর্ণ-উপন্যাস-রসগ্রাহীদিগের নাসিকা কুঞ্চনের কোন কারণই নাই। যাহা কেবল ভাবোচ্ছ্বাসে ভরা ছিল, তাহা এই দেহের সৌন্দর্য্য ও ইন্দ্রিয় ভোগবর্ণনার ভিতর দিয়া বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে সত্য; অনেক স্থলে ছোট খাটো প্রেমের হাবভাবে বাস্তবতাকে পরিস্ফুট করে ইহাও সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সুবিস্তৃত সম্ভোগবর্ণনার প্রয়োজনীয়তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এমন কি কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত চিত্তেন্দ্রিয়কায় হইলেও এই রতিবিলাসের নিপুণ-বর্ণনার কোন সার্থকতা দেখা যায় না; কারণ এই সম্ভোগের নিপুণ-বর্ণনা সাধারণ নরনারীর ভাবোচ্ছ্বাসের অন্তরায় হইয়া কেবল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যভোগের বিষয় ও বিলাসকলার অভিমুখীন করে।

এই উপলক্ষে পরকীয়া রস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। "পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস"। পরকীয়া ভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব বলিয়া—সামাজিক অপবিত্রতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে কি না? রাধা ভাবে সখী ভাবে কৃষ্ণ ভজনা ভিন্ন কৃষ্ণরূপে রাধার ভজনা বৈষ্ণবের নির্দ্দিষ্ট পথ নয় বলিয়া সহজযানের মত বৈষ্ণব-মতকে হীন করে নাই। সমাজ দ্রোহ বা দুর্নীতির পরিপোষক বলিয়া আপত্তি থাকিলেও এই সর্ব্বকামনাশূন্য সর্ব্বস্বার্থবর্জ্জিতপ্রেম, এই সর্ব্বত্যাগী আত্মবিসর্জ্জন যে শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইবার শ্রেষ্ঠ পথ তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বৈষ্ণবরস শাস্ত্রকারেরা নানা কৌশলে ইহার

অনন্য সাধারণত্ব ও উপাদেয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমাদের দেশে স্বকীয়া ভাবে রসের উল্লাস দেখা যায় না। প্রথমতঃ বিবাহের পূর্ব্বে পরিচয় ও প্রণয় (Prenuptial love) হইবার সুযোগ নাই। আবার বিবাহিত দম্পতির মধ্যে প্রেমের উগ্র ব্যাকুলতা স্বাভাবিক নহে। অনুরাগের যে উৎকট অবস্থায় "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর" এই রূপ হয় তাহা স্বকীয়া রতিতে সাধারণতঃ থাকে না। এই তীব্র অনুরাগ ও বিবিধ বিঘ্ন বাধা বিপদের মধ্যে মিলনের জন্য ব্যাকুলতা, এই সর্ব্বত্যাগী আত্মবিসর্জ্জন আমাদের দেশে পরকীয়া ভাবেই সম্ভব বলিয়া বৈষ্ণবেরা পরকীয়া ভাবের কল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় ছলাকলাবর্ণনার প্রয়োজনীয়তা আছে, উদগ্র ব্যাকুলতা ও কুলমান লোকলজ্জাভয় বিসর্জ্জন পূর্ণ আত্ম সমর্পণের বিস্তৃত বর্ণনার আবশ্যকতা আছে কিন্তু নিপুণ রতি বিলাস বর্ণনা ইহাকে পরিস্ফুট করিবার জন্যও প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক নহে।

এ বিষয়ে আর আলোচনা করিতে গেলে অনধিকারচর্চ্চা হইয়া পড়িবে। কারণ অনেক ভক্ত বৈষ্ণব এই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট পদগুলি গাহিতে গাহিতে পুলকাশ্রুপূর্ণ লোচনে ভাবে বিহ্বল হইয়া যান, অনেক বৃদ্ধ বৈষ্ণব নিশীথে নিতান্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গে এই সকল পদের আলোচনা করিয়া অবিরল অশ্রু মোচন করিয়া থাকেন। সাধারণ পাঠকের নিকট যাহা নিন্দনীয়,ভোগ বিলাসের সম্ভোগের বিস্তৃত নিপুণ বর্ণনা সেই পদই ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট যে মধুর তত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেয় তাহা বুঝিবার সাধ্য আমাদের নাই। তবে এই সম্ভোগ বর্ণনায় রতি বিলাসের চিত্রে যে বিস্তৃত নিপুণতা আছে তাহা তখনকার রসগ্রাহী ব্যক্তিদিগের সৌন্দর্য্যবোধকে পীড়িত করিত না, বরং কাব্যের সৌন্দর্য্য

তাঁহাদিগের নিকট অধিকতর অভিব্যক্ত করিত। যে রুচিবাদ ও শ্লীলতা বোধ এখন আমাদিগকে এই সকল বিষয়ের বাস্তব সৌন্দর্য্য (Realistic beauty) উপলব্ধি করিবার পক্ষে বাধা দিতেছে, সেই জাতীয় শ্লীলতাবোধ সংস্কৃতকাব্য, কুমারসম্ভব প্রভৃতির সময়েও ছিল না। বৈষ্ণবকবিদিগের সময়েও ছিল না। ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে যে ভাষায় ঠাকুরদাদা, দাদামহাশয়েরা নাতিনাতিনীকে সম্বোধন করিতেন, সেই ভাষার বাস্তব অর্থগ্রহণ কেহই করিত না বা তাহার রুচিহীনতা কাহাকে পীড়া দিত না, কিন্তু সেই সকল অপূর্ব্ব সম্বোধনের ভাষার ভিতর দিয়া যে সুনির্ম্মল প্রীতির উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত তাহাই সকলের হৃদয় স্পর্শ করিত। তেমনি হয়ত ঐ সম্ভোগ বর্ণনার নানা ছলা কলার মধ্যে, অশ্লীল প্রকাশের মধ্যে এমন একটা তীব্র আসক্তি উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ পাইত, যাহা ঐ অশ্লীল প্রকাশকে আড়াল করিয়া, তীব্র আসক্তি উদগ্র কামনাকেই বৈষ্ণবভক্তের নিকট ব্যক্ত করিত, তাই তাঁহারা গলদশ্রুলোচনে এই সব পদের ভাবের ভিতরে ডুবিয়া যাইতেন। পরম ভক্ত বৃদ্ধা মাধবী বৈষ্ণবীর নিকট ভিক্ষার চাউল পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়াতে, প্রিয় ভক্ত ছোট হরিদাসকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মের মত ত্যাগ করিলেন। আর সেই শ্রীচৈতন্য গীতগোবিন্দ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী গান করিতে করিতে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন। যিনি নিজের পতিগতপ্রাণা পরমরূপবতী যুবতী পত্নীর প্রতিও কোন দিন আসক্ত ছিলেন না, যিনি সন্ন্যাসের পরে একদিনও এই পত্নীর মুখদর্শন করেন নাই, যাঁহার দেবোপম পবিত্র চরিত্র নৈতিক বিশুদ্ধতা রমণী-বিষয়ে সতর্কতা অতি অসাধারণ, সেই প্রেমপবিত্রতার আধার শ্রীচৈতন্য ভক্ত রামানন্দ রায়ের সহিত সাধ্যসাধননির্ণয় প্রসঙ্গে যখন রামানন্দের মুখে তাঁহার

রচিত নিম্নের পদটি শুনিলেন, তখন ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন।

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
ন সো রমণ ন হাম রমণী।
তুহুমন মনোভব পেশল জানি॥

* * *

এই পদের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য যে মাধুর্য্য উৎসারিত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি যে সব পদ মগ্ন হইয়া গাহিতেন, পরবর্ত্তী ভক্তেরা যাহা লইয়া ভজনা করিতেন, সেই পদের ঐ অশ্লীল সম্ভোগ-বর্ণনার ভিতরেও বৈষ্ণবভক্তেরা রসসাধনার সঙ্কেত প্রত্যক্ষ করিতেন, ঐ সকল হাবভাব কলানিপুণতাকে তীব্র অনুরাগ ও উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে দেখিতেন বলিয়াই ঐ সকল পদের বাহ্যিক অশ্লীল দিকটা তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিত না। কবি জয়দেব নমস্ক্রিয়া, আশীর্ব্বচন ও মঙ্গলাচরণ ব্যপদেশে গীত গোবিন্দের যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছেন, সেখানে তিনি শৃঙ্গার রসোদ্দীপক পদের অপূর্ব্ব সমাবেশ দ্বারা নিশ্চয়ই তাঁহার পরিহাসপটুতা প্রদর্শন করেন নাই। আবার বিদ্যাপতির রাধা কাঁদিতে কাঁদিতে যে মিলন প্রত্যাশা করিতেছেন, তাঁহার সেই অশ্রু জলের মিলনের ভিতরেও দেহের নানা ছলাকলার যে বর্ণনা আছে, সে ত প্রবাসী কৃষ্ণকে ভুলাইবার জন্য নহে, সখীকে মুগ্ধ করিবার জন্যও নহে, সে বর্ণনা রাধার প্রাণের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস মাত্র। তাই এই স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস সকল রতিকলাকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভক্তবৈষ্ণব হৃদয়-দ্বারে আঘাত করে।

শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কারিকা এক রমণী প্রাণ খুলিয়া জয়দেবের পদ গান করিতেছিল। দূর হইতে এই গান শ্রবণ করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য গায়িকার উদ্দেশ্যে ছুটিলেন; পথের বাধা উত্তর দক্ষিণ কিছু জ্ঞান নাই, গোবিন্দ কোন ক্রমে নিরস্ত করিতে না পারিয়া গায়িকা রমণী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রভুর নিকট চীৎকার করিলেন। অমনি তাঁহার ভাবাবেশ প্রশমিত হইল। এই শ্রীচৈতন্য জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদে এত আনন্দ কখনই পাইতেন না, যদি ঐ অশ্লীল পদগুলির ভিতরে কোন পরম তত্ত্বের সঙ্কেত না পাইতেন। যে সঙ্কেত সাধারণ পাঠকের নিকট লুক্কায়িত বলিয়াই ঐ অশ্লীলতা এত পীড়ন করে।

চতুর্থ অধ্যায়

পদাবলী সংগ্রহ ও গৌর চন্দ্রিকা

চণ্ডীদাসের পদাবলীর পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে ও তাঁহার তিরোভাবের পরে অন্যান্য পদকর্ত্তারা পদাবলী সাহিত্যের বিরাট সৌধ মালা রচনা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীকে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির যুগ বলা যাইতে পারে। পদাবলী সাহিত্য পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ও ষোড়শ শতাব্দীতে এবং কিছু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হয়। পদকর্ত্তা-দিগের সকলের জীবনী অদ্যাপি সংগৃহীত হয় নাই। দীনেশ বাবু তাঁহার পুস্তকে কয়েক জনের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। আর সম্প্রতি সতীশ বাবু তাঁহার পুস্তকেও কয়েক জনের কিছু পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় গৌরপদতরঙ্গিনীর ভূমিকায় ৭৯ জন পদকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত পদ সংগ্রহ সম্পূর্ণ হয় নাই, পদের পাঠ নির্ণয়ও স্থির হয় নাই এবং পদ কর্ত্তা-দিগের জীবনী সংগ্রহও হয় নাই। এই পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা করিবার আছে তাহার তুলনায় যাহা করা হইয়াছে তাহা অতি যৎসামান্য মাত্র। যাহা হউক এই বিভাগে যিনি যাহা যতটুকু করিয়াছেন তাহার জন্যই তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন।

এই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও এই দুই শতাব্দীর সাহিত্য পরম গৌরবের সামগ্রী। এই সময়ে যে কেবল জগজ্জনবিমোহন

বিশ্ববাসীর তৃষাহারী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী বৈষ্ণব-সাহিত্যেরই উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছিল তাহা নহে, এই যুগে মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদিগের আশ্রয়ে আনুকূল্যে প্ররোচনায় রামায়ণ ও মহাভারতের নানা অনুবাদ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই যুগে চণ্ডী কাব্য, বেহুলার গান ও অন্যান্য নানা পাঁচালী রচিত হইয়াছিল, যাহা অদ্যাপি যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বাঙ্গালার পল্লীসমাজে প্রতিপত্তিশালী হইয়াই রহিয়াছে। এই যুগের অনুবাদ গ্রন্থ, মৌলিক গ্রন্থের ন্যায় কেন, মৌলিক গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক সম্মান সমাদর প্রতিপত্তি লাভ করিয়া, অদ্যাপি বাঙ্গালীর চির প্রিয় হইয়া রহিয়াছে। এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে সম্ভব হইবে না। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব এই যুগের যাবতীয় সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। এমন কি পরবর্ত্তী যুগেও শাক্ত ভক্তদিগের গানেও এই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার সমাজেও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব বড় কম নহে।

আজ পর্য্যন্ত আমরা পদাবলী সাহিত্যের যতটুকু আলোচনা করিয়াছি তাহাতে সাহিত্যিক গবেষণার পথ তত পরিষ্কৃত হয় নাই, তবে ভবিষ্যৎ সাহিত্যসেবকের গবেষণার জন্য অনেক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে! পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখনও সমুদায় পদ সংগৃহীত হয় নাই। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার পাঠ বিশুদ্ধি পাঠ নির্ণয় ও পদবিচার হয় নাই, আবার অর্থ নির্ণয় প্রভৃতি আরও কত কাজ বাকী রহিয়াছে। বিশুদ্ধ পাঠ ও টীকা এবং নির্ঘণ্ট সম্বলিত সংস্করণ কবে সম্ভব হইবে ভগবান জানেন। সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদাবলী গ্রন্থসমূহেও এই সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। এ বিষয়ে মনীষী সাহিত্যিকদিগের অনেক দিনের শ্রমসাধ্য গবেষণার প্রয়োজন হইবে।

পদাবলী সংগ্রহ অনেকগুলি পুস্তক আছে। ইহাতে পদবিন্যাসের

তিনটী প্রণালী আছে। প্রথম পালার আকারে পদাবলী গ্রথিত করা দ্বিতীয় রসের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে অর্থাৎ রসপর্য্যায় অনুসারে পদাবলী সংগ্রহ তৃতীয় কোন বিশেষ পদকর্ত্তার রসপর্য্যায় অনুসারে স্বতন্ত্র পদ সংগ্রহ।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রণালীতে মিশ্রিত করিয়া পদ-কল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। তৃতীয় প্রণালী অনুসারে গোবিন্দ দাসের "একান্ন পদ" প্রভৃতি সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন অনেক কীর্ত্তনিয়া প্রথম প্রণালী অনুসারে কীর্ত্তনের পালা সজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের হস্ত লিখিত পুঁথিতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পদসংগ্রহের যে সকল পুস্তকের বিবরণ এ পর্য্যন্ত আমরা অবগত হইয়াছি, তাহারও সবগুলি আদ্যোপান্ত মুদ্রিত হয় নাই। অনেকগুলি বটতলা রক্ষা করিয়াছে। যেগুলির বিবরণ জানা গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এক ভাবের কেন প্রায় এক ভাষার পদ বিভিন্ন পদকর্ত্তার ভনিতাযুক্ত দেখা যায়।

পদ সমুদ্র—মনোহর দাস সঙ্কলিত। দীনেশবাবু বলেন ইহার পদ সংখ্যা ১৫০০০। ইহা অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

পদামৃত সমুদ্র—রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলিত। তিনি ইহার সংস্কৃত টীকা করিয়াছিলেন। বহরমপুর রাধামোহনযন্ত্র হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পদসংখ্যা প্রায় ৭০০ শত।

পদকল্পতরু—বৈষ্ণবদাস সঙ্কলিত। পদকল্প-তরু ৪ শাখায় বিভক্ত। মোট পদসংখ্যা ৩১০১; সাহিত্য পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অনেক পদ লুপ্ত হইয়াছে তথাপি এই পদ সংগ্রহই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

পূর্ব্বরাগাদি ক্রমে ৪ শাখা ও মঙ্গলাচরণ বয়ঃ সন্ধি, রূপোন্মাদ

দিব্যোন্মাদ, বিরহ প্রভৃতি নানা পল্লবে এই পদকল্পতরুর পদ সংগ্রহ নানা ভাবানুযায়ী নানা ভাগে বিভক্ত। একই ভাবের বিবিধ পদকর্ত্তার পদ সমাবেশে একের ছায়া বা প্রভাব অন্যের পদে সহজেই ধরা পড়ে। কোন কোনও স্থলে পদানুসরণ অক্ষম অনুকরণ বা পূর্ব্ব ভাবের অনুবৃত্তি না হইয়া, ভাবের বিস্তৃতি বা উচ্ছ্বাসের পক্ষে সার্থক সহায়তা করিয়াছে, অনেকগুলি পদের ভনিতায় কোন নাম পাওয়া যায় না, আবার অনেকগুলি এক প্রকারের নাম হইলেও ভাবে ও ভাষায় এক নহে।

পদকল্প লতিকা—গৌরমোহন দাস সঙ্কলিত

গীত চিন্তামণি—হরিবল্লভ সঙ্কলিত

গীত চন্দ্রোদয়—নরহরি চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত

পদচিন্তামণি মালা—প্রসাদ দাস সঙ্কলিত

পদ রত্নাকর—কমলাকান্ত দাস সঙ্কলিত। ইহার পদসংখ্যা ১৩৫৮।

পদরসসার—নিমানন্দ দাস সঙ্কলিত। এখানিও সুবৃহৎ গ্রন্থ। পদের সংখ্যা প্রায় ২৭০০ শত।

রসমঞ্জরী—পীতাম্বর দাস সঙ্কলিত।

সাহিত্য পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুঁথি—
পদসংখ্যা প্রায় ৭০০ শত; সংগ্রাহকের নাম নাই।

ইহা ভিন্ন লীলা সমুদ্র, পদার্ণব সারাবলী, গীতকল্পলতিকা, গীতরত্নাকর, গীতচন্দ্রোদয় প্রভৃতি বহু অজ্ঞাত সংগ্রাহকের নানা পদসংগ্রহ গ্রন্থ আছে। আরও কত লুপ্ত হইয়াছে অথবা ভবিষ্যৎ প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই উপলক্ষে গৌরচরিতচিন্তামণি ও অবশেষে জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সঙ্কলিত গৌরপদতরঙ্গিণীও উল্লেখযোগ্য। এই গৌরপদতরঙ্গিনীতে একটী বিস্তৃত ভূমিকা আছে এবং পরিকর ও পদকর্ত্তা পরিচয়ে ৭৯ জন পদকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে।

ইঁহাদের জন্মকাল প্রভৃতি বিশুদ্ধ ভাবে সন্নিবিষ্ট না হইলেও এই বিবরণ অতি প্রয়োজনীয় এবং বিবিধ তথ্যপূর্ণ। এইখানি অতি বৃহৎ গ্রন্থ। সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পদসংখ্যা ১৫১৬।

এই গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য এথানেই লিপি-বদ্ধ করিতেছি। সমুদায় কীর্ত্তনিয়ারা কীর্ত্তন গাহিবার, সময় মূল পালা গাহিবার পূর্ব্বে, গৌরাঙ্গ বিষয়ক কয়েকটী পদ গাহিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেন। এই সকল পদে মূল পালার ভাবের পূর্ব্ব সূচনা থাকিত। গোরার কথন কি ভাব হইত, ব্রজের কি ভাব অনুধ্যান করিয়া, কি ভাব-বিলাসে মগ্ন হইতেন, সেই সকল অবলম্বন করিয়া নানা পদকর্ত্তা নানা পদ রচনা করিয়াছেন। আবার চৈতন্য ভাগবতের মত অনেক পদকর্ত্তা শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণরূপে পরিকল্পনা করিয়া ব্রজলীলার সকল অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রকাশ ও ব্রজভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি গৌরাঙ্গে আরোপ করিতেন। এমনি করিয়া ব্রজবালার ন্যায় নদীয়া নাগরীর সৃষ্টি হইয়াছিল। অথচ সে সময়ে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পণ্ডিতগণ এবং প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসীগণ রমণী বিষয়ে অতি সতর্ক নিমাই চরিতে এমন কোন ভাবের পরোক্ষ প্রমাণ পাইলেও রক্ষা রাখিতেন না; তখনকার দিনে একটু অসতর্কতা বা এই জাতীয় কোন ভাবোচ্ছ্বাস দেখিলেই বিরুদ্ধ পক্ষ অতিরঞ্জিত করিয়া প্রতিবাদ ও সমালোচনা নিশ্চয়ই জমকালো করিয়া তুলিতেন। পরবর্ত্তী গৌরভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের সমুদায় ভাব ও কার্য্য শ্রীকৃষ্ণের ভাব ও কার্য্য দিয়া বিবৃত করিতে চাহিতেন। অনেক রসিক ভক্তপদকর্ত্তা এই গৌরপদের মধ্যে বিশেষ কবিত্ব ও উপমা চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গৌরপদ কীর্ত্তনকে গৌরচন্দ্রিকা বলিত। গৌরচন্দ্রিকা তাই এখনও ভূমিকার পরিবর্ত্তে

ব্যবহৃত হয়। আবার গৌর চন্দ্রিকায় অনেক সময় ব্রজলীলার বাল-সুলভ অনুকরণ মূলক পদ থাকিত বলিয়া অনেকের তাহা মনোরম হইত না এবং অনেক সময় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পীড়াদায়ক হইত, তাই গৌর চন্দ্রিকার শেষ, সাধারণে উৎসাহের সহিত অপেক্ষা করিত। এই গৌর চন্দ্রিকার পদে অনেক সময় মূল পদাবলীর বিবিধ পদকর্ত্তার অক্ষম অনুকরণ ও অতি শিশুজনোচিত ভাববিবর্ত্তন (adaptation) দেখা যায়। আবার ভক্ত জনোচিত দৈন্য ও প্রার্থনা মূলক পদও গৌর চন্দ্রিকায় গান করা হইত। এই পদগুলির মধ্যে কোন কোন পদ অতি সুন্দর। এই পর্য্যায়ে গোবিন্দদাসের "জয় শিব সুন্দর বিশ্ব পরাৎপর পরমানন্দকারী" ইত্যাদি পদ ও গোকুলদাসের "জগজীবন জগন্নাথ জনার্দ্দন যদুপতি জলধর শ্যাম" ইত্যাদি পদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগের আর একটী পদ বৈরাগী ভিখারীর মুখে সর্ব্বদাই গ্রামে সহরে এমন কি কলিকাতার রাস্তায়ও শোনা যায়।

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা সাগর॥
জয় গুরু গোবিন্দ গোপেশ গিরিধারী।
শ্রীরাধিকার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি॥
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জনম যায় দিনে দিনে॥
দিন যায় বৃথা কাজে রাত্র যায় নিদে।
না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥

* * *

এই পদের ভনিতায় দ্বিজ হরিদাসের নাম দেখা যায়। এই দ্বিজ হরিদাসের কৃষ্ণের শত নামের একটী পদ আছে। এই শতনামের পদ বাঙ্গালার

ঘরে ঘরে গীত হইয়া থাকে। এই সব পদের সঙ্গেই প্রেমদাসের চতুর্দ্দশ স্বরাবলী ও নরোত্তম দাসের চৌত্রিশপদাবলী উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রচলিত সচিত্র বর্ণমালা শিক্ষার পুস্তকে যেমন ছড়া দেখা যায়, এই দুইটা পদে তাহা অপেক্ষা অধিক কবিত্ব বা নিপুণতা দেখা যায় না। দ্বিজ হরিদাসের চিরপরিচিত চির প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের শত নামের মত শচীনন্দনের রচিত গৌরাঙ্গের একশত আট নামের একটি পদ আছে। ইহাতেও কোন গতিকে ১০৮ নাম পূরণ করা ছাড়া আর কোন বিশেষত্ব নাই। নরোত্তম দাসের হাট পত্তনের যে পদ আছে তাহার ঐ একটীতেই গৌর চন্দ্রিকার কাজ নির্ব্বাহ হইতে পারে। আর পদকর্ত্তাদিগের গুণানুবাদ করিয়াও কতকগুলি পদ আছে। সে গুলিও গৌর চন্দ্রিকায় ব্যবহৃত হইত। এই গৌর চন্দ্রিকার পদগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় অনেক পূর্ব্বেই পদাবলী পালার মত করিয়া গান করা হইত এবং তখনি বলরাম দাস, রাধামোহন দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণ এই গৌর চন্দ্রিকার পদ রচনা করেন। কোন পদকর্ত্তার পদাবলী সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে তাঁহার গৌরচন্দ্রিকার পদও সন্নিবেশ করা প্রয়োজন হইবে.

পদকর্ত্তাদিগের বিবরণ

সতীশ বাবু "অপ্রকাশিত পদ রত্নাবলী"র ভূমিকায় লিখিয়াছেন। দীনেশ বাবুর উল্লিখিত ১৬৫ জন পদ কর্ত্তার মধ্যে ৫টী নাম পুনরুক্ত হইয়াছে। এই পুনরুক্ত ৫টী বাদে ১৬০ ও তাঁহার প্রকাশিত ২৮ জন মোট ১৮৮ জন পদকর্ত্তার বিষয় অদ্যাবধি জানা গিয়াছে বলা যাইতে পারে। দীনেশ বাবুর সংগৃহীত তালিকায় পদকর্ত্তাদিগের

মধ্যে ১১ জন মুসলমান ও ৩ জন স্ত্রীলোক পদকর্ত্তা দেখা যায়। এই বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ সকলেই অতি বিনয়ী ছিলেন এবং গুরুভক্ত ছিলেন। নিজের দৈন্য ও বিনয় প্রকাশ করিবার জন্য অনেকে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রিয় পদকর্ত্তার নামে অথবা নিজের গুরুর নামে আপনার রচিত পদ চালাইয়াছেন। অনেক সময়ে একই প্রকার বিনয়-দৈন্য প্রকাশক উপাধি একাধিক পদকর্ত্তা গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—প্রেমদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি; আবার এই দাস উপাধিও বিভ্রাটের কারণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কর্ম্মকার সকলেই বৈষ্ণব হইয়া দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এখন এই দাসকে দাসত্ব হইতে বাঁচাইবার জন্য অনেক গণতান্ত্রিক নেতাও "স" কে শ করিয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছেন, কিন্তু তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কেহই দাস হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এক নামের ৪।৫ জন পদকর্ত্তা উপস্থিত হওয়াতেও বিশেষ গোলযোগের কারণ হইয়াছে। সম্প্রতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুই জন হওয়াতে সুপ্রসিদ্ধ শরৎচন্দ্রের পুস্তকের বিজ্ঞাপনে সতর্কতা লওয়া হইয়াছে। এক নামে কত পদকর্ত্তার বিবরণ পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল

কৃষ্ণ দাস ৮ জন
গোপাল দাস ১১ জন
গোকুলানন্দ ৫ জন
মাধব দাস ৩ জন
নরহরি দাস ২ জন
পুরুষোত্তম দাস ৪ জন
মনোহর দাস ২ জন
শেখর ৫ জন
হরিদাস ৭ জন

গোপীকান্ত ২ জন
গোবিন্দ দাস ১৩ জন
গৌরী দাস ৬ জন
বলরাম দাস ১৯ জন
বল্লভদাস ২ জন
যদুনাথ দাস ২ জন
যদুনন্দন দাস ৫ জন
শঙ্কর দাস ৫ জন

ইঁহারা সকলেই পদকর্ত্তা কি না বলা যায় না ; ইঁহারা এক নামের বৈষ্ণব ভক্ত। ইঁহাদিগের মধ্যে হয়ত এক নামের ৩ জন পদ রচনা করিয়াছেন। অন্য ৩ জন করেন নাই, এখন কোন্ ৩ জন করিলেন, কোন কোনও স্থলে তাহা নির্ণয় করা কঠিন ; আবার যাঁহারা করিলেন তাঁহাদের মধ্যে কার কোন্‌টি তাহা নির্ণয় করা আরও কঠিন। এক নামের বিবিধ পদ-কর্ত্তা, একাধিক পদকর্ত্তার এক বিনয়ের উপাধি গ্রহণ এবং দাস উপাধির বাহুল্য ভিন্ন আবার কেহ কেহ দুঃখিনী ও স্ত্রী ভনিতা ব্যবহার করিয়া-ছেন। এই সমস্যা-জটিল বিভ্রাটসঙ্কুল পদকর্ত্তার পরিচয় কবে সম্পূর্ণ-রূপে পাওয়া যাইবে এবং কবে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উল্লেখ ও বিবৃত বিষয়ের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে এই সকল সমস্যা সমাধান হইয়া পদকর্ত্তাদিগের জীবনী ও পদ বিচার ও পাঠ নির্ণয় বিশুদ্ধ হইবে, তাহা বিধাতা জানেন, তবে ইহার জন্য অসীম অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা এবং দীর্ঘকালব্যাপী সুনিপুণ সতর্ক গবেষণার প্রয়োজন হইবে।

এই প্রসঙ্গে স্ত্রীপদকর্ত্তাদিগের কথা আবার উল্লেখ করিতেছি। দীনেশবাবু তিনজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন রসময়ী দাসী মাধবী দাসী ও রামী। রামীর পদ পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়াছি। রামীর এই পদ যদি খাঁটী রামীর হয়, তাহা হইলে রামী ধোপানীকে বাঙ্গালার আদি মহিলা কবি এবং আদি মহিলা বৈষ্ণব পদকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মাধবী শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক এবং প্রসিদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবী। মাধবীর একটী পদ উদ্ধার করিতেছি

নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে, আইসে জগদানন্দ।
রহি কত দূরে, দেখে নদীয়ারে, গোকুলপুরের ছন্দ ॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে, এই অনুমানে যায় ॥

লতাতরু যত, দেখে শত শত, অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ, না হয় ফুটন, মেঘগণ দেখে রাতা॥
শাখে বসি পাখী, মুদি দুটী আঁখি, ফল জল তেয়াগিয়া।
কাঁদয়ে ফুকরি, ডুকরি ডুকরি, গোরাচাঁদ নাম লৈয়া॥
ধেনু যূথে যূথে, দাঁড়াইয়া পথে, কার মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসের, ঠাকুর পণ্ডিত, পড়িল আছাড়ি গা॥

মুসলমান-পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে নসির মামুদের একটী পদ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি—

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচলি কাচলি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গানরি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তপন তনয়া তীরে কেলি
ধবলি শাঙলি আওরি আওরি
ফুকরি চলত কানরি॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি
বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ্রক গুঞ্জা হার
বদনে মদন ভালরি।
আগম নিগম বেদ সার
লীলায় করত গোঠ বিহার
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দানরি॥

আকবর সাহের একটী গৌর চন্দ্রের পদ উদ্ধার করিতেছি—

জীউ জীউ মোর মনচোরা গোরা।
আপঁহি নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া।
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নট নটিয়া।
খির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া॥
ঐছন পঁহুকে যাহু বলিহারি।
সাহ্ আকবর তেরে প্রেম ভিকারী॥

ইহা ভিন্ন সেখ মর্ত্তুজা প্রভৃতি আরও কয়েকজন মুসলমান-পদকর্ত্তার পদ পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে গোবিন্দ দাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গোবিন্দ দাসের পরেই জ্ঞান দাস এবং বলরাম দাস। দীনেশবাবু ইহাদের পরেই রায় শেখর ঘনশ্যাম প্রভৃতি ছয় জনের নাম করিয়া পরে বাসু ঘোষ ও নরহরির নাম করিয়াছেন। এই শেষোক্ত শ্রেণী বিভাগ অনেকে স্বীকার না করিলেও গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস ও বলরাম দাস-সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই।

গোবিন্দ দাস জ্ঞান দাস ও বলরাম দাস

পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের নামে অনেক গোবিন্দ দাস পাওয়া যায়। গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস অথবা গোবিন্দ কবিরাজের জীবনকাহিনী ভক্তমাল প্রেম বিলাস ভক্তিরত্নাকর নরোত্তমবিলাস ও শ্রীনিবাসচরিত প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইনি চিরঞ্জীব সেনের পুত্র এবং কবি দামোদর

সেনের দৌহিত্র। ইহার জন্মকাল এখনও সুনির্ণীত হয় নাই। বিবাহ করিয়া চিরঞ্জীব শ্বশুরালয় শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করেন, কুমার নগরে তাহার আদি বাস। কুমার নগরে তাহার পুত্রেরা পুনর্ব্বার বাস করিতে গিয়া বৈষ্ণবদ্বেষী দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া পদ্মাতীরে বুধরী গ্রামে বাস করিতে থাকেন। দীনেশবাবু বলেন শ্রীখণ্ডেই উৎপীড়িত হইয়া শ্রীখণ্ড ত্যাগ করিয়া বুধরীতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। গৌরপদতরঙ্গিনীর ভূমিকায় ভদ্র মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে শ্রীখণ্ড চিরঞ্জীব সেনের আদি বাসস্থান ও কুমারনগর শ্বশুরালয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, গোবিন্দের পিতা চিরঞ্জীব বৈষ্ণব ভক্ত হইলেও নৈয়ায়িক দামোদর সেনের দৌহিত্র গোবিন্দ শাক্ত ছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি শাক্ত ছিলেন পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজও শাক্ত ছিলেন পরে বৈষ্ণব হন। তিনি নরোত্তম ঠাকুরের বন্ধু ও বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। গোবিন্দের বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ-সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। গল্পগুলি বৈষ্ণব ধর্ম্মের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পরবর্ত্তী বৈষ্ণবেরা রচনা করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। 'গোবিন্দের কবিরাজ উপাধি প্রাপ্তি-সম্বন্ধেও অনেক গল্প আছে। তবে তাঁহার কবিত্ব শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া এই উপাধি তাঁহাকে দেওয়া হয় এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।' গোবিন্দ দাসের পদ অতি সুমধুর, অতি উচ্চভাবপূর্ণ এবং কবিত্ব হিসাবে বিদ্যাপতির প্রায় সমতুল্য। রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমুদ্রে লিখিয়াছেন, বিদ্যাপতির কোন কোন পদ গোবিন্দ দাস পূরণ করেন। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ এই দুই নামের ভনিতাযুক্ত পদগুলি গোবিন্দ কর্ত্তৃক সংশোধিত বা পূর্ণ হইয়াছে। তখন সকল পদই কীর্ত্ত-

নিয়ার মুখে মুখে চলিত, কদাচিৎ কোন হস্তলিখিত পুঁথি থাকিলেও অনেক সময় অনেক পদ কীর্ত্তনিয়ার বুঝিবার শক্তির অভাবে, স্মৃতি-শক্তির অল্পতায় বিকৃত বা অঙ্গহীন হইয়া পড়িত। গোবিন্দের মত একজন সমকক্ষ ভক্ত বৈষ্ণব কবির পক্ষে সেই সকল পদ সুন্দর সার্থক ভাবে পূরণ বা সংশোধন করা অতি স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। গোস্বামী প্রভুগণ গোবিন্দদাসের পদ বিদ্যাপতির পদের তুলনায় কোন অংশে নিকৃষ্ট মনে করিতেন না। পদাবলীর ব্রজবুলীর ভাষায় তিনি সু-পারদর্শী ছিলেন; আবার ভক্ত কবি ছিলেন, কাজেই তাঁহার পদাবলী ভক্ত বৈষ্ণবের এত প্রাণস্পর্শী আর সাধারণ পাঠকেরও এত পরম প্রিয়। তিনি এই পদরচনা ভিন্ন "সঙ্গীতমাধব" নামে একখানি কবিত্বপূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। গোবিন্দ দাসের ২।১টী পদ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।

(১) যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইও মঝু গাত॥
যো দরপণে পঁহু নিজ মুখ চাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতি হইও তছু মাহ॥
যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ।
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ॥
যোই বীজনে পঁহু বীজইত গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদু বাত॥
যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠাম॥
গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গৌরী।
সো মরকত তনু তোহে কি ছোড়ি॥

(২) রূপে ভরল দিঠি, সোঙরি পরশ মিঠি, পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে, শ্রুতি পরিপূরিত, না শুনে আন পরসঙ্গ ॥
সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর, তনু মন মাতল, না শুনে ধরম লব লেশ ॥

* * *

(৩) শুনইতে অনুক্ষণ, যছু নব গুণ গুণ, শ্রবণ নয়ন ভৈ গেলা।
দরশনে তাকর, এ হেন লোর ঝর, নয়ন শ্রবণ সম ভেলা ॥

* * *

হিয়া ঘনসার, হার নাহি পহিরিনু, যাক পরশ রস আশে।
তাক বিচ্ছেদে, জীউ নাহি নিকসয়ে, কঁহতহি গোবিন্দ দাসে ॥

এই তিনটী পদ জগতের প্রেম-গীতি সাহিত্যে অতুলনীয় এবং অতি অপূর্ব্ব এবং চির মনোরম। ইহার পদভাণ্ডারের সমস্ত রত্ন উপস্থিত করিতে অত্যন্ত লোভ হয়। যেমন কবিত্ব তেমনি ভাবোচ্ছ্বাসভরা। অনেক স্থলে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমকক্ষ হইয়াছেন।

(১) একলি যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদ চিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে ॥
প্রতি পদ চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাশা পরশিয়ে রহিনু দূরে ॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দ দাস ॥

(৩) শুন সজনি কি ফল বেশ বনানি।
কানু পরশ মণি, পরশ কারণ, আভরণ সৌতিনী মানি ॥

* * *

(৮) নব নব গুণ গণ, শ্রবণ রসায়ন, নয়ন রসায়ন অঙ্গ ।
রভস সম্ভাষণ, হৃদয় রসায়ন, পরশ রসায়ন সঙ্গ ॥

* * *

(৫) রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর ।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর ॥
জানলুঁরে সখি প্রেম অগেয়ান ।
নাগর কোরে নাগরী নাহি জান ॥

* * *

(৬) মনের মানসে, পরাণ উছলে, ঐ ছন হয় অকাজে ।
যদি শুনিতে না চাহ, কানুর বচন, কানে সে মুরলী বাজে ॥
যদি চলিতে না চাহ, কানুর পাশে, চরণ থির না বাঁধে ।
গোবিন্দ দাস কহ, কানুর লাগিয়া, ভাল সে পরাণ কাঁদে ॥

(৭) সিনান দুপুর সময় জানি ।
তপত পথে গিয়ে ঢালয়ে পানি ॥

* * *

আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে ।
ঘুরি ঘুরি অনু ভ্রমরা বুলে ॥

* * *

ভাব বিহ্বলতা ও প্রেমোচ্ছ্বাসের অপূর্ব্ব চিত্র সকল চিত্রিত হইয়াছে । এই সকল পদের সৌন্দর্য্য বাক্যে প্রকাশ করা যায় না । কতকগুলি পদে যেমন অনুপ্রাস তেমনি বর্ণনা চাতুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে

মুখরিত মুরলী, মিলিত মুখ মোদনে, মরকত মুকুর মৈলান ।
মানিনা মান, মথন মুচুকায়লি, মুনি মানস মুরছান ॥

"কুবলয় কন্দর কুসুম কলেবর" প্রভৃতি পদ ইহারই অনুরূপ পদ ।

আবার শ্যামসুন্দরের রূপবর্ণনায় গোবিন্দ দাসের অনুপ্রাসের নূতন ভঙ্গী দেখা যায়। দুই দুই লাইনে এক এক অক্ষরের অনুপ্রাস। পদ কল্পতরুর চতুর্থ শাখার নবম পল্লবে রাধার দ্বাদশ-মাসিক-বিরহবর্ণনার কয়েকটী পদ আছে। তন্মধ্যে গোবিন্দ দাসের ভনিতাযুক্ত একটী সুদীর্ঘ পদ আছে। এই পদে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনার সঙ্গে বিরহকাতরতা সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে!

"মনমনসিজ, মনহি দহই, দহই মারুত মন্দ।
তরল জলধর, বরিখে ঝর ঝর, হামারি লোচন ছন্দ॥"

গোবিন্দ দাসের ভনিতাযুক্ত আরও একটী এই জাতীয় পদ আছে। চতুর্থ শাখার একাদশ পল্লবে গোবিন্দ দাসের ভনিতাযুক্ত শ্রীরাধার তানব দশা বর্ণনের একটী, ব্যাধি দশা বর্ণনের তিনটী এবং উন্মাদ দশা বর্ণনের তিনটী অনুপ্রাস পূর্ণ পদ পাওয়া যায়। গোবিন্দ দাসের শব্দ যোজনা-প্রিয়তা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; পদাবলী-সাহিত্যে কিন্তু এই অনুপ্রাস প্রিয়তা তেমন পরিলক্ষিত হয় না। সপ্তবিংশ ও অষ্টাবিংশ পল্লবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা মূলক যে পদগুলি আছে তন্মধ্যে গোবিন্দ দাসের পদগুলি পদ লালিত্যে ও মাধুর্য্যে শীর্ষস্থানীয়।

"যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি, তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি" গোবিন্দদাসের এই পদ বিদ্যাপতির "যাহা যাহা পদযুগ ধরই তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই" পদের অনুকরণে লিখিত। অনেক স্থলে উভয়ের ভাব সাদৃশ্য দেখা যায়। গোবিন্দ দাসের সমুদায় পদের মধুরতা অনির্ব্বচনীয়। বিদ্যাপতি যেমন শব্দ-তুলিকা স্পর্শে অপূর্ব্ব অসাধারণ ও অননুকরণীয় সৌন্দর্য্যের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, গোবিন্দ দাস তেমনি শব্দ-বীণাঝঙ্কারে অপূর্ব্ব চির মনোরম মাধুর্য্যের সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছেন। সুদক্ষ বীণাবাদক যেমন হেলায় নানা সুরের সৃষ্টি করে, গোবিন্দ দাস

তেমনি হেলায় শব্দলীলায় অপূর্ব্ব সঙ্গীতলহরীর সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সকল পদই সুরের মাধুরী ভরা, এই সুর যেন পদের সৌন্দর্য্যকে মাদকতাময় করিয়া তুলিয়াছে।

গোবিন্দ দাস যেমন বিদ্যাপতির ধরণে পদ রচনা করিয়াছেন তেমনি জ্ঞান দাস ও বলরাম দাস উভয়েই চণ্ডীদাসের অনুকরণে পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। উভয়েই গোবিন্দ দাসের সমসাময়িক। নরোত্তম বিলাসে ইঁহাদের উল্লেখ দেখা যায়। জ্ঞান দাস সুপুরুষ ছিলেন। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বীরভূম জেলা, কাঁদড়া গ্রামে ইহার জন্ম। ইনি জাহ্নবী দেবীর মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং দার পরিগ্রহ করেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বলরাম দাস নামে ১৯ জন বৈষ্ণব ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ৪ জন কবি। কাজেই কাহারও জন্মপরিচয় বা জন্মকাল এখনও নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয় নাই। যাহা হউক পদকর্ত্তা বলরাম দাস বৈদ্য জাতীয় ছিলেন এবং শ্রীখণ্ডের কবিরাজ বংশীয় বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কর্ণানন্দ অনুসারে দীনেশ বাবু বলরামের জন্মস্থান বুধইপাড়া স্থির করিয়াছেন। প্রথমে জ্ঞান দাসের ২।১টী পদ উদ্ধার করিতেছি।

(১) মনের মরম কথা, তোমারে কহি যে এথা, শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে, শ্যামল বরণ দে, তাহা বিনু আর কার নই॥

* * *

মরমে পৈঠল লেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ, শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত, ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥
রূপে গুণে রস সিন্ধু, মুখছটা জিনি ইন্দু, মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দেয় ছলে, আমা কিন বিকাইনু বোলে॥

* * *

(২) শিশুকাল হৈতে, বন্ধুর সহিতে, পরাণে পরাণ লেহা।
না জানি কি লাগি, বো বিহি গঢ়ল, ভিন ভিন করি দেহা॥

সই কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া, নারে পাশরিতে, কি দিয়া সুধিব ধার॥
আমার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া, পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক, করের মুরলী, লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের, বরণ-সৌরভ, যখন যেদিকে পায়।
বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া, তখন সেদিকে ধায়॥

* * *

(৩) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

* * *

(৪) কি মোর ঘর দুয়ারের কাজ, লাজ করিবারে নারি।
তিলেক বিচ্ছেদে, লাখ পরমাদ, হিয়া বিদরিয়ে মরি॥

* * *

গুরু গরবিত, বলে অবিরত, সে মোর চন্দন চুয়া।
সে রাঙ্গা চরণে, আপনা বেচিলু, তিল তুলসী দিয়া॥

* * *

(৫) বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া, যেখানে পরাণ, সেখানে তোমারে থোব॥
ও চাঁদ বদন, সদা নিরখিব, সুখ না চাহিব আর।
তোমা হেন নিধি, মিলাওল বিধি, পূরিল মনের সাধ॥

* * *

চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে জ্ঞানদাসের অনেক পদের অতি নিকট সাদৃশ্য আছে।

আজ পরভাতে, কাক কলকলি, আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধুর আসিবার, নাম শুধাইতে, উড়িয়া বৈসয়ে তায়॥
সখি হে কুদিন সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব, মন্দিরে আওব, কপালে কহিয়া গেল॥

*　　　*　　　*

জ্ঞান দাসের এই পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের

সই জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে, তুরিতে আওব, কপাল কহিয়া গেল॥

*　　　*　　　*

প্রভাত সময়ে, কাক কোলাকুলি, আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার, নাম শুধাইতে, উড়িয়া বসিলা তায়॥

এই পদের কেবল ভাবে নয় ভাষারও ঐক্য আছে। অতি আশ্চর্য্য রকমের সাদৃশ্য যাহাতে কেবল ভাবের ঘরে চুরী নয় দিনে ডাকাতি বলিয়া ভ্রম হয়। কারণ চণ্ডীদাসের আর একটী পদ—

"কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন এ দুটী আঁখির তারা।"

কেবল ভনিতা ও কয়েকটী শব্দ বদলাইয়া জ্ঞান দাসের নামে প্রচলিত দেখা যায়। আবার চণ্ডীদাসের সেই বহুশ্রুত চিরপ্রসিদ্ধ অতুলনীয় পদটী "সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল" জ্ঞান দাসের ভনিতাযুক্ত পদরূপে দেখা যায়। সুতরাং চণ্ডীদাসের পদাবলীর ঘরে উঁকি ঝুঁকি মারার এবং সুবিধা মত আত্মসাৎ করার প্রমাণ ইঁহার পদাবলীতে পাওয়া যায়। জ্ঞান দাসের রচিত ষোড়শগোপালের রূপবর্ণনা অতি সুন্দর। গৌরচন্দ্রের কয়েকটী পদেও কবিত্ব ও ভাবের উচ্ছ্বাস আছে।

বলরাম দাস বহু সংখ্যক হওয়াতে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ

আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সরল মর্ম্মস্পর্শী পদগুলি চণ্ডী-দাসের পদের মত পরম সুন্দর। সতীশ বাবু বলেন "বলরামের রসোদ্গারের পদগুলি অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" বলরামের ২।১টী পদ উদ্ধার করিতেছি।

(১) তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কল্প যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
* * *
যতনে আনিয়া যদি ছানিয়ে বিজুরী।
অমিয়ার সাঁচে যদি গড়াই পুতলী॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান।
তবু ত না হয় তোমার নিছনি সমান॥
* * *

(২) কে মোরে মিলাঞা দেবে সো চাঁদ বয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥
* * *
ধন জন যৌবন দোসর বন্ধুগণ।
পিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন॥
কেহ ত না বলেরে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥
* * *

(৩) কিবা সে মোহন বেশ, ভুলালে সকল দেশ, না রহে সতীর সতীপনা।
ভরমে দেখিলে তারে, জনম ভরিয়া গো, ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা॥
সই হাম কি করিনু, কেনে বা সে বাড়াইনু, কি শেল হানিল মোর বুকে।
জাতি কুলশীলে সই, বজর পড়িল গো, কালারূপ দেখি চোখে চোখে॥

* * *

(৪) মোর কাছে কাছে থাকে, সদা চোখে চোখে রাখে, তবু মোরে পলকে হারায়।
এ বুক চিরিয়া, হিয়ার মাঝারে, যেন বা রাখিতে চায়॥
হার নহে পিয়া, গলায় পরিএ, চন্দন নহে মাখে গায়।
অনেক যতনে, রতন পাইয়া, সোয়াস্তি নাহিক পায়॥
সাজায়ে আমায়, বসন পরায়, আবেগে লইয়া কোরে।
দীপ লইয়া হাতে, মুখ নিরখিতে, তিতল নয়ন লোরে॥
চরণে ধরিয়া, যাবক রচই, আলাঞা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম চিতে, ভাবিতে ভাবিতে, পাঁজর হইল শেষ॥

এই সকল পদ ভিন্ন বলরামের অনেকগুলি গৌরচন্দ্রের সুন্দর পদ আছে। স্থানাভাবে নিম্নে একটী পদের কিয়দংশ উদ্ধার করিতেছি—

কুসুমে খচিত, রতনে রচিত, চিকণ চিকুর বন্ধ।
মধুতে মুগধ, সৌরভে লুবধ, ক্ষুবধ মধুপ বৃন্দ॥
ললাট ফলক, পীবর তিলক, ফুটিল অলকা সাজে।
তাণ্ডবে পণ্ডিত, পুলকে মণ্ডিত, গণ্ড-মণ্ডল রাজে॥

* * *

হিরণ হীর, বিজরী থির, শোহন মোহন দেহে।
অরুণ কিরণ হরণ বসন বরণে যুবতী মোহে॥

কাম চমক, ঠাম ঠমক, কুন্দন কনক গোরা।
করুণা সিন্ধুর, গমন মন্থর, হেরিয়া ভুবন ভোরা॥

* * *

অন্যান্য পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে অনেকের জীবনীর যৎকিঞ্চিৎ অংশ গৌরপদতরঙ্গিনীর ভূমিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দীনেশবাবু কিছু করিয়াছেন। এখনও এই সংগ্রহ বিশুদ্ধ হয় নাই এবং সম্পূর্ণও হয় নাই। যাহা হউক অন্যান্য প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের দুই একটী পদ পরে উদ্ধার করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের শত নাম, শ্রীচৈতন্যের শত নাম ও দ্বাদশ মাসিক বিরহের পদগুলির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ত্রিংশ পল্লবে শুকসারী বর্ণিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপগুণবর্ণনা-মূলক কয়েকটী পদ আছে। ইহার কয়েকটীতে মাধবের ভনিতা, একটীতে যদুনন্দনের ভনিতা দেখা যায়, অন্যগুলিতে কাহারও ভনিতা নাই। বর্ণনা-চাতুর্য্য ও উপমানৈপুণ্য সকলগুলিতেই পরিলক্ষিত হয়। পরবর্ত্তী যুগে এই সকল পদের অনুকরণে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরের গৌরব ও মহিমা-মূলক নানা রঙ্গরসপূর্ণ শুকসারীর পদাবলী রচিত হইয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে গীত হইয়াছে এবং এখনও অন্তঃপুরিকারা পরম কৌতূহল ও রহস্যপূর্ণ আনন্দের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন।

রজনীক আনন্দ কি কহব তোয়।
চির দিনে মাধব মিলল মোয়॥
হিয়ায় হইতে মোরে না করে বাহির
হেরইতে বদন নয়নে বহে নীর॥
দারিদ্র হেম জনু তিলেক না ছোড়।
ঐছন হাম রহলু পিয়া কোর॥
যতহুঁ বিপদ কছু না কহলু রোয়।
কহইতে কৈছে কি জানি কিয়ে হোয়॥
নাগর গর গর আরতি বিথার।
দাস অনন্ত কহ ইহ রস সার॥

অনন্তদাসের এই পদের প্রথম দুই লাইন বিদ্যাপতির "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর" এই পদের ছাঁচে ঢালা। আবার শেষের কয় লাইন চণ্ডীদাসের ছাঁচে ঢালা। তবে ইহাকে নিতান্ত অক্ষম অনুকরণ বলা যায় না।

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়া হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥

* * *

শেখরের এই পদে বিদ্যাপতির "মোর অঙ্গের আভরণ দিও পিয়া ঠাম। জনম অবধি মোর এই পরণাম।" এই পদের ছায়া থাকিলেও সৌন্দর্য্যে ও ভাবোচ্ছ্বাসে ইহা কোন ক্রমেই হীন নহে।

নিজ কর পল্লবে, অঙ্গ না পরশই, শঙ্কই পঙ্কজ ভানে।
মুকুর তলে নিজ, মুখহেরি সুন্দরী, শশী বলি হরই গেয়ানে॥

*　　　*　　　*

শেখরের এই পদেও বিরহকাতরতা সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। শেখর কবিশেখর রায়শেখর প্রভৃতি নানা ভনিতা পাওয়া যায়। ইহারা সকলে এক ব্যক্তি কিনা এখনও মীমাংসা হয় নাই।

কবি শেখরের "হেদেহে নিলাজ কানু না কর এতেক চাতুরালী। যে না জানে মানুষতা, তার আগে কহ কথা, মোর আগে বেকত সকলি।" এই পদে চণ্ডীদাসের "শুনহ নাগর কানু কে তোমা এ মাঠে দানী করিয়াছে ধরিয়া মোহন বেণু" এই পদের ছায়াই পড়িয়াছে।

গরজয়ে গগনে সঘনে ঘন ঘোর।
ঐছে সময়ে চলু নন্দ কিশোর॥
পন্থ বিপথ কিছু লখই না পারি।
দামিনী চমকে চলয়ে অনুসারি॥
পাওল সঙ্কেত কুঞ্জক মাঝ।
জানল রাই আয়ল যুবরাজ॥
কুঞ্জ মন্দিরে ধনি দেওল কপাট।
কানু না জানল ঐছন নাট॥

*　　　*　　　*

ঘনশ্যামের এই পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের "এঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইল বাটে" পদের তুলনা করিলে দেখা যাইবে ভাবোচ্ছ্বাসে ও সৌন্দর্য্যে চণ্ডীদাসের পদ হইতে কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। ঘনশ্যামের শেষ ৪ লাইনের সঙ্গে বিদ্যাপতির "হেরইত মাধব পড়ল হি ধন্দ।

পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়কদ্বন্দ্ব ।।” এই দুই লাইনের সঙ্গে বেশ তুলনা করা চলে এবং কিয়ৎপরিমাণে সাদৃশ্যও দেখা যায়।

“নয়ানক নীর থির নাহি বান্ধই ঘন ঘন মেটসি তাই। সচকিত লোচনে জলদ নেহারসি মানসি হাত বাড়াই ।।” ঘনশ্যামের এই পদে চণ্ডীদাসের “রাধার কিহল অন্তরে ব্যথা” প্রভৃতি পদের অতি নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়। এখানেও প্রতিচ্ছায়া তেমন উজ্জ্বল হয় নাই।

“সুচির বিরহে যব, ক্ষীণ কলেবর, বিগলিত ভূষণ বেশ।
আদরে তোহারি, পরশ রস লালসে, কেবল জীবন শেষ ॥

* * *

ঘনশ্যামের এই পদ অতি সুন্দর।

“ফুটল অশোক লাল রঙ্গন মালতী। পরিমলে তরল মাধবী রঙ্গবতী।” যদুনন্দনের এই পদে প্রাকৃতিক শোভা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পদটি চতুর্দ্দশপদী কবিতার (sonnet) মত।

কি পেখনু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো, বিকাইনু তার আঁখি ঠারে ॥

* * *

চিকণ কালার রূপে, আকুল করিল গো, ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিল গো, যদু কহে কত সুধা দিয়া ॥

যদুনন্দনের এই পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের পদের সাদৃশ্য আছে এবং তুলনায় হীনও নহে, তবে এই পদের শেষের ৮ লাইন বদলাইয়া—জ্ঞানদাস ও বংশীবদনের ভনিতাযুক্ত পদে দেখা যায়। সুতরাং মূলপদটীর রচয়িতা কে তাহা বলা যায় না।

না কান্দিহ আরে সখি কহিয়ে নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুঞি না রাখিব দেহে॥
উত্তর কালের এক করিহ সহায়।
এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥
তমালের কান্ধে মোর ভুজলতা দিয়া।
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিহ বান্ধিয়া॥
কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পূরিবেক আশ।
শুনিয়া কাতর যদুনন্দন দাস॥

যদুনন্দনের এই পদ "মরিব ম'রিব সখি নিচয় মরিব" এই পদের অতি অক্ষম অনুকরণ। সতীশবাবু বলেন এই পদটী শ্রীরূপগোস্বামী প্রণীত বিদগ্ধ মাধবের একটী শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ মাত্র।

কি কহব রে সখি আজুক ভাব।
অযতনে মোহে হোয়ল বহুলাভ॥
একলি আছিনু হাম বনাইতে বেশ।
মুকুরে নিরখি মুখ বান্ধলু কেশ॥
তৈখনে মিলল গোরা নটরাজ।
ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতি লাজ॥
দরশনে পুলকে পূরল তনু মোর।
বাসুদেব কহে গোরা নওল বিশোর॥

বাসু ঘোষের গৌরচন্দ্রিকার এই পদ বিদ্যাপতির রসোদ্গার ও সম্ভোগস্মৃতির পদের ছাঁচে ঢালা। বাসু ঘোষের অনেকগুলি সুমধুর গৌরচন্দ্রের পদ আছে।

দুহু মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোণা॥

নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলধর॥
কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল।
নবঘন মাঝে যেন বিজুরী পশিল॥
রাই কানু রূপের নাহিক উপাম।
কুবলয় চান্দ মিলল এক ঠাম॥
রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত পঁহু না পাওল ওর॥

নিধু বনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।
দুহুক রূপের, নাহিক উপমা, প্রেমের নাহিক ওর॥
হিরণ কিরণ, আধবরণ, আধ নীলমণি জ্যোতি।
আধ উরে বন মালা বিরাজিত আধ গলে গজমোতি॥

* * *

মন্দ পবন, মলয় শীতল, কুন্তল উড়য়ে বায়।
রসের পাথারে, না জানে সাঁতারে, ডুবল শেখর রায়॥

শেখর ও অনন্তদাসের এই দুইটী যুগলরূপ বর্ণনার পদ পরম সুন্দর।

সুমুখী চরণে, চিকনকালারে, বরণ কেন বা দেখি।
সখীর বচনে, ঈষৎ হাসিয়া, নেহারে কমলমুখী॥
কনক মুকুর, জিনিয়া চরণ, মুখানি রসের কূপ।
তাহার মাঝারে, পশিয়া পেখলু, পরাণ নাথের রূপ।

* * *

কহিতে কহিতে, রসের আবেশে, নাগরী নাগর ভেল।
বংশী কহয়ে, বুঝিয়া বিশাখা, নাগরী আনিয়া দেল॥

বংশীবদনের এই পদটিতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় তন্ময় হইয়া নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিতেছেন। বিদ্যাপতির "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই" পদেও এই ভাবের অবতারণা। এই প্রেমোন্মাদ বর্ণনা অতি সুন্দর। রায় বসন্তের দুইটী পদ উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে।

(১) এ সখি মোহন রসময় রঙ্গ।
পীতবসন তনু তরুণ ত্রিভঙ্গ॥
মণিময় আভরণ রঞ্জিত অঙ্গ।
কনক হার হিয়ে বিজুরীতরঙ্গ॥
* * *
চরণ কমল মণি নূপুর বিরাজে।
রায় বসন্ত মন নখমণি মাঝে॥

(২) ওহে নাথ কিছুই না জানি।
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি।
পরাণ পুতলী তুমি জীবনের সখি॥
অঙ্গ আভরণ তুমি শ্রবণ রঞ্জন।
বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন॥
নিমিষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।
রায় বসন্ত পহু প্রেম-পুঞ্জ-রাশি॥

রায় বসন্তের আরও কয়েকটী সুন্দর রূপবর্ণনার পদ আছে। শ্রীচৈতন্য-যুগের পদ-কর্ত্তাগণ বিশেষতঃ তৎপরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তাগণ, শ্রীচৈতন্যের ব্যাকুলতা আর্ত্তি প্রেমোন্মাদ ও রূপবর্ণনায় এত মগ্ন ছিলেন ও ইহা যেমন তাঁহাদিগের নিকট উজ্জ্বল ছিল, শ্রীরাধার আক্ষেপ অনুযোগ

বিরহ মিলন ও প্রেমোন্মাদ তাঁহাদের নিকট তেমন আকর্ষণের বস্তু ছিল না। তাঁহাদের ভক্ত-কবি-প্রাণকে তেমন ভাবে স্পর্শও করে নাই। তাই পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তাগণেব মধ্যে অনেকে গৌরচন্দ্রের অতি সুন্দর কবিত্ব-পূর্ণ পদরচনা করিয়াছিলেন। সেই জন্য বাসু ঘোষ ও নরহরির গৌরপদ সংখ্যায়ও বেশী, ভাববিচিত্রতায় ও কবিত্ব-সৌন্দর্য্যেও পরমোজ্জ্বল। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাববিচিত্রতা ও আর্ত্তি ব্যাকুলতা এবং তন্ময়তা বর্ণনা করিতে গিয়া গৌরচন্দ্রের অনেক পদ, পূর্ব্ববর্ত্তী পদ-কর্ত্তা-দিগের শ্রীরাধার ভাব-বিচিত্রতা, ব্যাকুলতা ও প্রেমোন্মাদের পদের ছাঁচে ঢালা এমন কি সেই সব পদের শব্দ ও ভাবের সামান্য রূপান্তর করিয়া গৌরপদ রচিত হইয়াছে। গৌরপদ তরঙ্গিনীতে ৮৮ জন পদকর্ত্তার গৌরপদ সংগৃহীত আছে। ইহার মধ্যে ১৮ জনের ১টী, ১৩ জনের ২টি, ১১জনের ৩টী, ১৭জনের ৪।৫টী করিয়া পদ পাওয়া গিয়াছে। আরও কত পদ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের ভাণ্ডার এখনও বাঙ্গালার জনসাধারণের নিকটে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। এখনও কত লুপ্ত-প্রায় পদরত্ন তুলট পুঁথিতে ও কীর্ত্তনিয়ার খাতায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যাহা পাইয়াছি, তাহারই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা উপভোগের সামগ্রী, স্বয়ং আস্বাদন করিবার বস্তু; ভাষায় প্রকাশ করিবার বিষয় নহে। বৈষ্ণবসাহিত্যের উপযুক্ত আলোচনার জন্য বহুসংখ্যক সাহিত্য-সেবীর শ্রমনিষ্ঠ সময়-সাপেক্ষ নিপুণ সমবেত গবেষণার প্রয়োজন। Shakespeare Societyএর মত যদি আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্য-পরিষদ্ রচনা করিয়া আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্য-সেবী মনীষী ব্যক্তিদিগকে একত্র করিতে পারিতাম এবং সাহিত্য-রস-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত যুবকদিগকে নানা বিভাগে নিযুক্ত করিয়া এই বৈষ্ণব-সাহিত্য সংগ্রহ, পদ-বিচার, পাঠ-নির্ণয়, প্রকাশ প্রভৃতি কার্য্যের ব্যবস্থা

করিতে পারিতাম, তবেই এই নিপুণ সেবার ভিত্তির উপরে অপূর্ব্ব পরম গৌরবের বৈষ্ণব সাহিত্যের সৌধমালা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি সুরক্ষিত হইতে পারিত। সুলভ বিশুদ্ধ সংস্করণ করিয়া দেশের জনসাধারণকে দিতে হইবে, আবার হিন্দিতে অনুবাদ করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। তারপর ইংরাজী অনুবাদ করিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের রাজদরবারে ইহাকে উপস্থিত করিয়া ইহার ন্যায্য প্রাপ্য বৈজয়ন্তীমালা লইয়া আসিতে হইবে। Golden Treasury Seriesএর মত কবে বাছা বাছা শ্রেষ্ঠ পদগুলি একত্রে প্রকাশিত করিয়া এই পদাবলী-সাহিত্যের সহজবোধ্য সুন্দর সংস্করণের সাহায্যে উপযুক্ত মর্য্যাদাদান সম্ভব হইবে, তাহা ভগবান জানেন। আশা আছে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে দেশের শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি এবিষয়ে নিশ্চয়ই অচিরে আকৃষ্ট হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বৈষ্ণব-কবিতা বাঙ্গালী শিক্ষিত সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। তৎপূর্ব্বে বিদ্যাসুন্দর, মুকুন্দরাম ও নিধুবাবুই বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত ছিল এবং ইংরাজী শিক্ষিত অনেক বাঙ্গালী প্রাচীন-সাহিত্য-সম্পদের কোন সংবাদই রাখিতেন না। সুতরাং এই অনাদৃত বৈষ্ণব-সাহিত্য যাঁহাদের চেষ্টায় ও একান্ত শ্রমসাধনার ফলে বাঙ্গালায় সুপরিচিত ও সমাদৃত হইয়াছে তাঁহারা আমাদিগের চিরস্মরণীয়। বটতলার নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য অপরিশোধ্য ঋণে চিরঋণী। সর্ব্বপ্রথমে জগবন্ধু ভদ্র ১৮৭২ সালে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী সংগ্রহ করিয়া শিক্ষিত লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ইহারই ফলস্বরূপে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ-দর্শনে বিদ্যাপতি-সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে নানা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৭৬ সালে

সারদাচরণ মিত্র বিদ্যাপতির পদাবলীর এক সংস্করণ প্রকাশ করেন ; ইহার পরে অক্ষয়কুমার সরকার প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব কবিতাকে শিক্ষিত সাধারণের সুগম্য ও সুখপাঠ্য করিয়া দেন। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার একত্রে বৈষ্ণব-কবিতা সংগ্রহের একটী অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করেন। জগবন্ধু ভদ্র গৌর-পদতরঙ্গিনী প্রকাশ করিয়া ভূমিকায় বহু বৈষ্ণব-কবিদিগের জীবনী বিবৃত করেন। রমণীমোহন মল্লিক, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, সতীশ-চন্দ্র রায় ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বৈষ্ণব-পদাবলীর বিবিধ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যকে জনসাধারণের সহজগম্য করিয়া দেন। আর এই সকল পদাবলী সংগ্রহ যখন নানাভাবে প্রকাশিত হইতেছিল, তখন নীরবে ত্রিপুরার অখ্যাত বিদ্যালয়ের শিক্ষক দীনেশচন্দ্র সেন একান্ত অক্লান্ত অধ্যবসায় ও শ্রমনিষ্ঠ সাধনা লইয়া প্রাচীন সাহিত্যের ও সেই সূত্রে বৈষ্ণব-সাহিত্যের সেবায় মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন, আর তাহারই ফলে বৈষ্ণব-সাহিত্যের মহিমা ও গৌরব পরে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

চরিতাখ্যান—গোবিন্দের কড়চা।

পদাবলী শাখা হইতে এখন জীবন-চরিতাখ্যান বিভাগের সাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বৈষ্ণব-সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যে এ বিষয়ে নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্যময় জীবন-কাহিনী লইয়া অনেক ভক্ত বৈষ্ণব-কবি জীবন-চরিতাখ্যান রচনা করিয়াছেন। তৎপরে অদ্বৈতাচার্য্য ও অন্যান্য বৈষ্ণব-ভক্তগণের জীবন-বৃত্তান্ত লইয়াও নানা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে আমরা শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিত কাহিনী মূলক গ্রন্থগুলির আলোচনা করিব। আমরা শ্রীচৈতন্যের স্বর্গীয় মহিমা মণ্ডিত পুণ্য জীবনকাহিনী এখানে বিবৃত করিবার অবকাশ ও সুযোগ পাইলাম না তবে চরিতাখ্যান আলোচনায় আংশিক ভাবে এই পুণ্যজীবন কথার প্রসঙ্গ উপস্থিত করিব।

শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী লইয়া বঙ্গ সাহিত্যে জীবনচরিত লেখার সূত্রপাত হয়। এত দিন মানুষের দৃষ্টি কেবল পৌরাণিক চরিত্রগুলির সৌন্দর্য্যের দিকে আকৃষ্ট ছিল; আদর্শ মানব জীবনকাহিনীর অভাবে, জনসাধারণ শ্রেষ্ঠ হৃদয়, মন ও চরিত্রের উৎকর্ষ, দেবত্বমূলক বা অতি-মানুষ সুলভ বলিয়া মনে করিতেছিল। শ্রীচৈতন্য দেবের ও তাঁহার ভক্ত পরিকরদিগের জীবন লীলার ভিতরে মানুষ ভক্তিবিনয় ও সরলতার উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ চিত্র দেখিয়া মনুষ্যসুলভ গুণের দিকে আকৃষ্ট হইল। যাহা

অলৌকিক বা দেব প্রভাব-সম্পন্নের স্বাভাবিক গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা মনুষ্যসুলভ ও মনুষ্য সাধ্য দেখিয়া, জনসাধারণ আশ্বস্ত হইল। আদর্শ জীবনের ন্যায় আদর্শ চরিতাখ্যানও জনসাধারণের চিন্তা আকাজ্ক্ষার উপরে বিশেষ ক্রিয়া করে। চৈতন্যজীবনী লইয়া ষোড়শ শতাব্দীতে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সেইগুলি বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী ও নানা সাধন-তত্ত্ব-মূলক বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় সমাদৃত ও গৌরবান্বিত হইল। বহু দিন পরে ভাষা ও সাহিত্য এক অপূর্ব্ব গৌরব শ্রীমণ্ডিত হইল, এক নূতন শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করিল। যে দিন বাঙ্গালা পদাবলীর সংস্কৃত টীকা রচিত হইল বাঙ্গালা সাহিত্যের সে এক চিরস্মরণীয় দিন; আবার বাঙ্গালায় রচিত চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত যে দিন আহ্নিক সহায় নিত্য-পাঠ্য ও শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় আদৃত হইল সে আর এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। ইহার প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন মর্য্যাদা বিস্তৃত অধিকার ও বিশিষ্ট প্রতিপত্তি সম্ভব হইল।

চৈতন্যজীবনীর মধ্যে গোবিন্দ দাসের কড়চা জয়নন্দের চৈতন্য-মঙ্গল, লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গল, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত এই কয়েকখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা, ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থেও মহাপ্রভুর জীবনচরিত ও লীলা বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন মুরারি গুপ্তের কড়চা. চৈতন্য চন্দ্রোদয়, গৌর চরিতচিন্তামণি প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। বর্ত্তমান যুগেও চৈতন্যজীবনী লইয়া কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্র গুপ্তের চৈতন্য লীলামৃত, চিরঞ্জীব শর্ম্মা বা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রণীত ভক্তি চৈতন্যচন্দ্রিকা, শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত অমিয় নিমাইচরিত, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিরচিত যুগাবতার, প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গচরিত, শশীভূষণ বসু প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বপ্রথমে গোবিন্দ দাসের কড়চার আলোচনা করা যাক্। বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চননগর গ্রামে এই গোবিন্দ দাসের বাস ছিল। ইনি জাতিতে কর্ম্মকার ছিলেন। কাঞ্চননগরের ছুরী কাঁচি এখনও বাজারে সুপ্রসিদ্ধ। স্ত্রীর লাঞ্ছনায় ইনি অভিমানে সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাপন্ন হন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সময়ে দুই বৎসর কাল সঙ্গে থাকিয়া যাহা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহাই কড়চায় লিপিবদ্ধ করেন। উজ্জয়িনীর এক ব্রাহ্মণ, স্ত্রীর লাঞ্ছনায় অভি-মানে গৃহত্যাগী হইয়া, ভারতীর চরণ সেবা করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াছিলেন, তেমনি এখানেও স্ত্রীর লাঞ্ছনায় এক কর্ম্মকার শ্রীচৈতন্য প্রভুর সেবা করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের অপূর্ব্ব সামগ্রী রচনা করিয়া গিয়াছেন। অস্ত্রহাতাবেড়িগড়া কর্ম্মকার নিজের পরিচয় দিতে কিছু-মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি স্ত্রী শশীমুখী নির্গুণ মূর্খ বলিয়া যে গালি দিয়াছিল তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দের কড়চা ঠিক খাঁটি জীবনচরিত নহে, তবে যেটুকু জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তাহা সরল অনুগত ভক্ত সেবকের অকপট বর্ণনা। ইহার মধ্যে কবিত্ব বা কল্পনার উচ্ছ্বাস নাই, তবে ভক্তির উচ্ছ্বাস যথেষ্ট আছে। গোবিন্দের কড়চায় যেমন কোথায়ও অতিরঞ্জন নাই, তেমনি সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির কোন প্রভাবও দেখা যায় না। গোবিন্দের বর্ণনা যেমন সরল, সুন্দর ও স্বাভাবিক তেমনি সম্পূর্ণ প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য। অন্য কোন জীবনচরিত লেখকের ভাগ্যে শ্রীচৈতন্য দর্শন বা শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কয়েক বৎসর ধরিয়া নিত্য সেবা ও সহবাসের পরম সৌভাগ্য ঘটে নাই। আর অল্প শিক্ষিত সরল ভক্ত যখন যাহা দেখিয়াছেন, বিনা দ্বিধায় সরল

প্রাণে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যখন যাহা বুঝিতে পারেন নাই তাহাও অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। মহাপ্রভুকে লইয়া ভক্তদিগের যে উল্লাস, নাম সঙ্কীর্ত্তনে মহাপ্রভুর যে অপূর্ব্ব ভাবাবেশ ও নামের প্রভাবে চারিদিকে যে ভাবোল্লাস উৎসারিত হইত, গোবিন্দ তাহা প্রাণের আবেগে উৎসাহের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া কোথায়ও অলৌকিকের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। সম্ভাষণ, স্পর্শ ও আলিঙ্গন-দানে বেশ্যা উদ্ধারের যে বর্ণনা আছে তাহা নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। কারণ শ্রীচৈতন্যের স্ত্রালোক-বিষয়ে অতি অসাধারণ সতর্কতা ছিল। 'প্রকৃতি সম্ভাষণ' অমার্জ্জনীয় অপরাধ মনে করিতেন। কড়চার স্থানে স্থানে এইরূপ অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা দোষ পরিলক্ষিত হয়। এইগুলি পরবর্ত্তী প্রক্ষেপ হওয়াই সম্ভব। পর্ব্বত-সমুদ্র বর্ণনায় এই সরল অল্প শিক্ষিত ভক্তের লেখনাতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মনোরমভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

পর্ব্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাই।
কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবারে পাই॥
হুঁ হুঁ শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর।
কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর॥
দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন।
সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে শুদ্ধ যার মন॥

কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরি রাজে।
ধ্যানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে॥
কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়।
আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়॥

বড় বড় বৃক্ষ তার শির আরোহিয়া।
চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া॥
ঝর ঝর শব্দে পড়ে ঝরণার জল।
তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল॥

এই কড়চা হইতে দেখা যায় গোবিন্দ যেমন বিনয়ী, প্রভুভক্ত, সত্যবাদী ও সরল, নিজের চরিত্রের ছোটখাটো সমুদায় দোষ ত্রুটী দূর করিবার জন্য তেমনি ব্যগ্র, আবার একেবারে সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বর ও অভিমান শূন্য। কড়চার নৈতিক বিশুদ্ধতা, অসাম্প্রদায়িকতা, সত্যপ্রিয়তা ও অতিরঞ্জনের অভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কড়চায় আমরা শ্রীচৈতন্যকে সকল দেবমন্দিরে, সকল তীর্থ স্থানে, ভাবে গদগদ, ধূলায় লুণ্ঠিত, অশ্রুসিক্ত দেখিতে পাই। সকল বিগ্রহ সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের প্রকাশ করিতেছে। সকল মন্দির তাঁহারই প্রকাশ মহিমা ঘোষণা করিতেছে। সেই চিরবাঞ্ছিত পরমানন্দের ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীচৈতন্য সকল দেবতার বিগ্রহের নিকট, সকল মন্দির দ্বারে, সকল তীর্থ স্থানে, ভক্তিবিহ্বল চিত্তে লুটাইয়া পড়িতেন। সরলভক্ত গোবিন্দ এই সব বর্ণনা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহা কড়চার বিশেষত্ব। "না করিবে অন্য দেবের ভজন পূজন" এই জাতীয় গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের নিকট কড়চার বিশেষ আদর নাই, তাঁহাদের গোঁড়ামির অনুকূল ও সমর্থক নহে বলিয়া কড়চার প্রতি তাঁহারা তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ নহেন। সাহিত্যসেবীর পক্ষে এই কড়চা অতি মূল্যবান্ সামগ্রী।

এই কড়চার মৌলিকতা-সম্বন্ধে সম্প্রতি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সাহিত্যিক ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকে বলিতেছেন এই গোবিন্দ দাসের কড়চা সম্পূর্ণ মেকি জিনিস। যাঁহারা মেকি বলিতেছেন তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রমাণ কড়চার ভাষার আধুনিকত্ব। ভাষা

যে তৎকালীন প্রচলিত ভাষার মত নহে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে অন্যান্য গ্রন্থে যেমন সংগ্রাহকের কৃপায় প্রক্ষেপ ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা। এই ভাষার স্বচ্ছতা ও স্বচ্ছন্দগতি প্রাচীনতার সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। বিরুদ্ধবাদীদিগের আর এক আপত্তি, প্রামাণ্য বৈষ্ণবগ্রন্থ বর্ণিত ঘটনার সহিত কড়চার বর্ণিত কোন কোন বিষয়ের মিল নাই বরং কোন কোন স্থলে বিরোধিতা দৃষ্ট হয়। এই শেষের আপত্তির সন্তোষজনক সমাধান বা চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে আংশিক পরিবর্ত্তন বা প্রক্ষেপের অপরাধে মৌলিকতা নষ্ট হইতে পারে না। প্রক্ষেপ পরিপূর্ণ বলিয়া প্রেমবিলাস পরিত্যক্ত হয় নাই। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাকে নানাভাবে আঘাত করে বলিয়াই কড়চার উপরে সকলে এত খড়্গহস্ত হইয়াছেন। এই খড়্গাঘাতে কড়চা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলে উপরোক্ত সমুদায় মন্তব্য পরিবর্ত্তন ও কোথায়ও বা প্রত্যাহার করিতে হইবে! সাহিত্য আলোচনার ফলে প্রামাণ্য আদি চৈতন্য চরিত হিসাবে কড়চার বর্ত্তমান স্থান নষ্ট হইলেও, বৈষ্ণবসাহিত্য হিসাবে ইহার বিশিষ্ট স্থান চিরকাল অটুট থাকিবে।

চৈতন্য-মঙ্গল

চৈতন্যমঙ্গল নামে দুই জনের দুইখানি গ্রন্থ আছে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ও লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতও চৈতন্যমঙ্গল নামেই রচিত হইয়াছিল, পরে বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ গ্রন্থের নাম চৈতন্য ভাগবত রাখেন। জয়ানন্দ বর্দ্ধমান

জেলায় আমাইপুর গ্রামে ১৫১১ হইতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব নীলাচল ফিরিয়া যাইবার সময় বর্দ্ধমান হইতে জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং জয়ানন্দের নাম রাখিয়া যান। এই সুবুদ্ধি মিশ্র বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। কড়চা ও চরিতামৃতে ইঁহার কথা আছে। জয়ানন্দের মন্ত্রগুরু অভিরাম গোস্বামী। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা অবসান হয় সুতরাং জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের কিয়ৎপরিমাণে সমসাময়িক এবং তাঁহার জীবন-কাহিনীর অনেক বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিবার কথা। তাঁহার গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য দেবের পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান, ভক্ত হরিদাসের বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রচলিত মত হইতে স্বতন্ত্র নূতন মতের অবতারণা করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের তিরোধান-সম্বন্ধে জয়ানন্দ নূতন তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। এ-বিষয়ে কত অলৌকিকের কুজ্ঝটিকা জালে সত্য ঘটনা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্য কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাব সমাধিতে মগ্ন হন এবং জনৈক পাষদের স্কন্ধে ভর দিয়া চলিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার চরণ কমলে ইষ্টক বিদ্ধ হয়। তখন কোন জ্ঞান ছিল না কিন্তু পরে ইহার যন্ত্রণায় অস্থির হন এবং জ্বরে আক্রান্ত হন। দুই দিন পরে এই জ্বরেই তিনি দেহরক্ষা করেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে হোসেন শাহের ব্রাহ্মণদিগের উপর অত্যাচারের বিবরণ ও পিরল্যা অপবাদগ্রস্ত ব্রাহ্মণদিগের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবময় অবস্থার কাহিনী আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সাহিত্য হিসাবে ইহার যে মূল্য, তদপেক্ষা তৎকালীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব বর্ণনায় ইহার মূল্য অনেক অধিক। জয়ানন্দের সময়ে চৈতন্যজীবনী-সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রচলিত আছে,

তাহার বিবরণ তাঁহার পুস্তকে পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের উল্লেখও দেখা যায়। গোবিন্দ কর্ম্মকারের কথাও তাঁহার পুস্তকে আছে। ভক্ত বৈষ্ণবেরা এই চৈতন্য মঙ্গলকে শ্রদ্ধাপূর্ণ গণনার মধ্যে আনেন না। গোবিন্দের কড়চা ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল একই কারণে বৈষ্ণব-সমাজে অনাদৃত ও অবহেলিত হইয়াছে।

লোচনদাস বর্দ্ধমান জেলায় কোগ্রামে বৈষ্ণববংশে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং জয়ানন্দের কিছু পরবর্ত্তী। চৈতন্য-মঙ্গলের ভূমিকায় তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার মাতৃপিতৃকুল ও জন্মস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি নরহরি সরকারের মন্ত্র শিষ্য। ইষ্ট দেবতার আদেশে লোচনদাস চৈতন্য-মঙ্গল রচনা করেন। জয়ানন্দ, লোচনদাস ও বৃন্দাবন দাস ইঁহারা তিন জনেই সমসাময়িক এবং গ্রন্থ রচনায়ও প্রায় সমসাময়িক। একের গ্রন্থে অন্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল শ্রীচৈতন্যকে বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণনা করিয়াছে এবং জন্ম হইতে আদ্যোপান্ত দেবলীলার অলৌকিক কাহিনীতে এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ। চৈতন্যের বাল্যলীলা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, সন্ন্যাসগ্রহণ প্রভৃতি সমুদায় ঘটনা কৃষ্ণলীলার অনুরূপ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অলৌকিকের কুজ্ঝটিকায় প্রকৃত সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়িয়াছে। মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব দেব-লীলায় প্রতিহত হইয়াছে।

বৈষ্ণবেরা এই গ্রন্থকে সমাদর করিলেও চৈতন্য ভাগবত বা চরিতামৃতের মত মনে করেন না। তবে লোচনের চৈতন্য-মঙ্গলে ঐতিহাসিক তত্ত্ব না থাকিলেও অনেক স্থলে কবিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানাস্থলে অলৌকিকের মেঘমালা ভিন্ন করিয়া মানবীয় ভাবের দিব্যালোক প্রকাশিত হইয়াছে। করুণ রসের বর্ণনায় কবির হস্তে

চিত্রকরের মোহন-তুলিকা প্রকাশিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বরাত্রে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল ও যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, লোচনদাসের সেই বর্ণনা পরম রমণীয়। যেন পদাবলী সাহিত্যের কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা রাধার চিত্র আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

চরণ কমল পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে, নেহারয়ে কাতর নয়নে।
হিয়ার উপরে থুইয়া, বাঁধে ভুজলতা দিয়া, প্রিয় প্রাণনাথের চরণে॥
দুনয়নে বহে নীর, ভিজিয়া হিয়ার চীর, বুক বাহিয়া পড়ে ধার।
চেতনা পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে, বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে আরবার॥

* * *

কি কহিব মুই ছার, আমি তোমার সংসার, সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লইয়া, মরি যাব বিষ খাইয়া, সুখে তুমি ব'স এই ঘরে॥

চৈতন্য-মঙ্গল ভিন্ন লোচনদাসের "দুর্ল্লভসার" প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। ইহা ভিন্ন লোচনদাসের অনেকগুলি সুমধুর পদ আছে। গৌরচন্দ্রিকার এক একটি পদ যেমন কবিত্বপূর্ণ, তেমনি সুমিষ্ট।

অমৃত মথিয়া কেবা, ননী তুলিল গো, তাহাতে গড়িল গোরাদেহ।
জগত ছানিয়া কেবা, রস নিঙ্গাড়িল গো, এক কৈল সুধই সুলেহ॥
অখণ্ড বিজুরী ধারা, কেবা আউটিল গোরা, সোনার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা, গাথানি মাজিল গো, হেন বা সে গোরা অঙ্গখানি॥

* * *

লোচনের এই পদে চণ্ডীদাসের "সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো, তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।" এই পদের অতি নিকট সাদৃশ্য আছে। আবার লোচনের "কালা বিলাসের হার, কালা গলার কাঁঠি, কালা সূতায় নিতি মালা গাঁথি" প্রভৃতি পদেও

চণ্ডীদাসের ছায়া আছে। লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর একটী বারমাস্যার পদ দেখা যায় এটীও বেশ সুন্দর; তবে জয়ানন্দের খাতায় পাওয়া গিয়াছে বলিয়া নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জয়ানন্দকে রচয়িতা সাব্যস্ত করিয়াছেন, যদিও রচনারীতি ও বর্ণনা-সৌন্দর্য্য এই মতের প্রতিপোষক নহে। আর একটি বিরহিণীর বার-মাস্যার পদ আছে সেটীতেও লোচনদাসের ভণিতা আছে। দুইটীতেই লোচনদাসের রচনা-সৌন্দর্য্য ও কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। লোচন-দাস শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণভাবেই দেখিয়াছিলেন বলিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী পদ-কর্ত্তাদিগের শ্রীকৃষ্ণভাবের সমুদায় শব্দ অলঙ্কার রস বর্ণনা শ্রীগৌরাঙ্গে আরোপ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের রূপবর্ণনার পদগুলি অতি সুন্দর ও সুমধুর। এই জাতীয় কোন কোন পদে পূর্ব্ববর্ত্তী পদকর্ত্তাদিগের ভাব ও ভাষার পুনরাবৃত্তি থাকিলেও সকল পদেই লোচনদাসের রচনার বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইয়াছে।

চৈতন্য-ভাগবত

চৈতন্য-ভাগবত বৈষ্ণবদিগের পরম আদরের বস্তু। বৈষ্ণব ভক্তেরা এই গ্রন্থ ভক্তি সহকারে নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। আবার সমসাময়িক যাবদীয় গ্রন্থে ইহার প্রশংসাপূর্ণ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। লোচনদাসের ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। চৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে দেখা যায়

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥

বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্য-মঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥
*   *   *
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন।
তার গর্ভে জন্মিলা শ্রী দাস বৃন্দাবন ॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত্র বর্ণন।
যাহার শ্রবণে হৈল শুদ্ধ ত্রিভুবন ॥

সমসাময়িক লেখকগণের এইরূপ শ্রদ্ধা প্রশংসাপূর্ণ উল্লেখ বিশেষ ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে। যাহাহউক চৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণনা হইতে বৃন্দাবন দাসের জন্মকাহিনীরও কিছু আভাস পাওয়া যায়। বৃন্দাবনকে দ্বিতীয় বেদব্যাস বা ব্যাস অবতার বলা হইয়াছে। চৈতন্য-ভাগবত বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় সমাদর, সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আবার জন্ম-বিষয়েও বৃন্দাবনের ব্যাসের মত অনন্য সাধারণত্ব দেখা যায়। সকল মঙ্গলাচরণের পদে গ্রন্থকর্ত্তাদিগের কুল-পরিচয় ও পিতামাতার পরিচয় থাকে, কিন্তু চৈতন্যভাগবতে মাতা নারায়ণীর কথা আছে, কিন্তু কোথায়ও পিতার কথা নাই। মাতা নারায়ণী শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী পরমভক্ত ও শ্রীচৈতন্যের "অবশেষ পাত্র" বলিয়া পরিচিতা ও সমাদৃতা ছিলেন।

বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলেন "বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কোন গ্রামে, কি অবস্থায় কোন শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানিনা এবং আমাদের জানিবারও উপায় নাই।" জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় গৌরপদ তরঙ্গিনীতে বৃন্দাবন দাসের জীবনকাহিনী যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আশীর্ব্বাদে ও শ্রীচৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া বিধবা নারায়ণীর গর্ভ হইয়াছিল এবং বৃন্দাবনের

জন্মের পরে নারায়ণী বাধ্য হইয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া মামগাছিতে গিয়া বাস করেন। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা বিংশ ভাগের প্রথম সংখ্যায় এবং আরও কোন কোন গ্রন্থে বিধবা নারায়ণীর গর্ব্ভে বৃন্দাবনের জন্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতের পরিশিষ্টে—"শ্রীমন্নারায়ণী দেবীর পবিত্র গর্ব্ভে" "তদীয় পবিত্র জননীর সঙ্গে" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপ "পবিত্র" শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার বরং প্রচলিত প্রবাদেরই পরোক্ষ সমর্থন করে। নারায়ণীর ব্যাস-জননীর মত যদি বৃন্দাবনের গর্ব্ভ-ধারিণী হইয়া থাকেন তাহাতে বৃন্দাবন বা নারায়ণী কাহারই—ভক্ত বৈষ্ণব মহিমা খর্ব্ব হয় না এবং হয়ও নাই। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রীমন্নারায়ণীর কোন সময়ে বিবাহ হয়, কাহার সহিত কোন গ্রামে বিবাহ হয় তাহা আমরা জানি না।" যাহাহউক এই সকল বিষয়ে এবং বৃন্দাবনের জন্মশক গ্রন্থরচনার কাল ও দেহরক্ষার সময়-সম্বন্ধে নানামত আছে, এখন পর্য্যন্ত কোন শেষ মীমাংসা হয় নাই। সাধারণতঃ ১৫০৭ খৃষ্টাব্দ তাঁহার জন্মসন বলিয়া অনুমিত হয়, আবার ক্ষীরোদবাবু ও দীনেশবাবু ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দ জন্মসন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। নারায়ণী মামগাছিতে নিরাশ্রয় অবস্থায় যখন বাস করিতেছিলেন তখন বাসুদেব দত্ত তাঁহাকে আশ্রয় দেন। বাসুদেব দত্ত বৃন্দাবনের সুশিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়া দেন। শ্রীবাস প্রভৃতির জীবদ্দশাতেই নারায়ণীর নিরাশ্রয় অবস্থায় শিশুপুত্র লইয়া মামগাছিতে বাস গৌরপদতরঙ্গিনীর বিবরণের সমর্থন করে। মামগাছিতে নারায়ণীর সেবাপাট এখনও বর্ত্তমান আছে। বৃন্দাবন পরে নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে দেনুড়ে গিয়া বাস করেন। এই সম্বন্ধে গৌরপদ-তরঙ্গিনীতে ভদ্র মহাশয় একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নিত্যানন্দের সহিত অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ নীলাচলে যাইতেছিলেন, বৃন্দাবনও সেই সঙ্গে ছিলেন। নবদ্বীপের সাত আট ক্রোশ পশ্চিমে বর্দ্ধমান জিলার দেন্নুড় গ্রামে আসিয়া যাত্রীগণ স্নান ভোজন করেন। নিত্যানন্দ মুখশুদ্ধি চাহিলে শিষ্য বৃন্দাবন অবিলম্বে পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত একটী হরীতকী প্রদান করেন। নিত্যানন্দ তাঁহার বিষয়ী সুলভ সঞ্চয় বুদ্ধি দেখিয়া বৃন্দাবনকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করেন এবং দেন্নুড়ে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ ও লীলা বর্ণনা করিতে আদেশ করেন। গুরুর আদেশে বৃন্দাবন সেখানে থাকিয়া বিগ্রহ সেবা নামসংকীর্ত্তন ও ভজনসাধন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। উপরোক্ত কাহিনী সত্য হইলে জন্মকাল-সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব পাওয়া যায়। তবে লীলাবর্ণনের সময় চৈতন্য-ভাগবতে তিনি নানাস্থানে আক্ষেপ করিয়াছেন "হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন"। এই আক্ষেপ পূর্ব্বোক্ত কাহিনীর তেমন সমর্থন করে না। দেন্নুড়ে বৃন্দাবনের সেবাপাট এখনও বর্ত্তমান আছে।

"ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥"

দেন্নুড়ে নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবন চৈতন্যমঙ্গল বা চৈতন্য ভাগবত রচনা করেন। "নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে। সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে॥" তিনি "বৈষ্ণব বন্দনা" "নিত্যানন্দ বংশাবলী বা নিত্যানন্দ বংশবিস্তার" প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত অনেক সুন্দর পদাবলী আছে। যাহাহউক দীর্ঘকাল ধরিয়া বৃন্দাবন দাস বৈষ্ণব-সমাজে ভক্ত বৈষ্ণব ভাবে পরম সমাদর ও বিশিষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নরোত্তম ঠাকুরের নিমন্ত্রণে খেতুরির

মহোৎসবে গিয়াছিলেন। কবে তিনি দেহরক্ষা করেন এখনও তাহা নির্ণীত হয় নাই তবে তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন তিনি ৮২ বৎসর জীবিত ছিলেন।

চৈতন্য-ভাগবত অতি সুবৃহৎ গ্রন্থ। আদিখণ্ডে দ্বাদশ, মধ্যখণ্ডে ষড়বিংশ ও অন্তখণ্ডে একাদশ অধ্যায় আছে। প্রথমে বৃন্দাবন তাঁহার পুস্তকের বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সূচী দিয়াছেন। পরে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বৈষ্ণব-ভক্তগণের আবির্ভাব ও যুগাবতারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে শতাধিক বৈষ্ণবভক্তের প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ ও তন্মধ্যে অনেকের সংক্ষেপ পরিচয় ও জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীচৈতন্যের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অতি সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে। শেষ খণ্ডে মহাপ্রভুর শেষ লীলা আদ্যোপান্ত বর্ণিত হয় নাই। চৈতন্যচরিতামৃত এই অভাব পূরণ করিয়াছে। এই গ্রন্থের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দীনেশবাবুর সমালোচনা উদ্ধার করিতেছি। "চৈতন্য প্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাস লেখনী দ্বারা ঘটনারাশি আয়ত্ত করিতে জানিতেন; তাঁহার বর্ণিত ঘটনার সুবিস্তার সমতটক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে অলৌকিক গল্পের উপলখণ্ড বাছিয়া ফেলিয়া পাঠক সত্যের পথ পরিষ্কার রাখিতে পারেন। কিন্তু লোচনদাসের পুস্তক অন্যরূপ, চৈতন্যপ্রভুসম্বন্ধে অলৌকিক গল্পগুলি তাঁহার কল্পনার চক্ষু হরিদ্বর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তিনি ঘটনা প্রকৃতবর্ণে ফলাইতে পারেন নাই, তাঁহার পুস্তক হইতে গল্পাংশ ছাঁকিয়া ফেলিয়া নির্ম্মল সত্যাংশ গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব। তাঁহার পুস্তক ইতিহাসের মলাট দেওয়া খাঁটি কল্পনার দ্রব্য। বৃন্দাবন দাস যুগাবতারের আবশ্যকতা কেমন সুন্দরভাবে দেখাইয়া চৈতন্যদেবের

আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু লোচন-দাস গোলোকধামে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত কথোপকথন অবলম্বন করিয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গলের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবল দেবলীলা ; মানুষী মহিমার শ্রেষ্ঠত্বই যে প্রকৃত দেবত্ব লোচনদাস তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।" "বৃন্দাবন দাস সততই চৈতন্যদেবকে ভাগবতের লীলা দ্বারা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ··· চৈতন্যলীলার সঙ্গে কৃষ্ণলীলার রেখায় রেখায় মিল রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।" এই রেখায় রেখায় মিল রাখিতে গিয়া চৈতন্যজীবনীর মানুষী মহিমা সম্পূর্ণ খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। অলৌকিকের আশ্রয়ে উজ্জ্বল করিতে গিয়া অনেকস্থলে লৌকিকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নিতান্ত ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ঘটনার ভিতরে বৃন্দাবন তাঁহার মনঃকল্পিত সূত্রের সার্থকতা সন্ধান করিয়াছেন। তাই শ্রীচৈতন্যের ষড়ভূজমূর্ত্তি প্রদর্শন, সুদর্শন চক্র স্মরণ ও নানা অবতার মূর্ত্তি প্রদর্শন প্রভৃতি বিশদ-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাই অনেক স্থলে শ্রীচৈতন্যের দেবোপম চরিত্র মহিমা ও ভক্তি ব্যাকুলতার উচ্ছ্বাস সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইবার সম্পূর্ণ অবকাশ পায় নাই।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অব্যবহিত পরে নিশ্চয়ই তাঁহার নিজের ও ভক্তপরিকরদিগের জীবনকাহিনী লইয়া নানা অলৌকিক গল্প রচিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাস সেইগুলি শুনিয়া তাঁহার গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন আবার নিজেও নিজের পূর্ব্ব কথিত সূত্র তাৎপর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া নিজের বিশ্বাস মতে নানা অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের যুগাবতার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদক শ্লোকগুলি সূত্র করিয়া শ্রীচৈতন্য ও তৎকালীন বৈষ্ণবভক্তদিগের

আবির্ভাব সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবের সঙ্গে যুগে যুগে ভক্তসাধকমণ্ডলী আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের নব প্রেরণাকে জীবন্ত ও সার্থক করিতেছেন এবং আপনাদের জীবনে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ আদর্শ গ্রহণ ও সাধন করিয়া মানবসমাজকে সেই আদর্শ অনুসরণে অনুপ্রেরিত করিতেছেন। আমরা এই সকল সাধক-দিগকে এবং মহাপুরুষদিগকে আমাদেরই মত মানুষ জানিতে পারিলে কত আশা হয়, কত উৎসাহ, সান্ত্বনা পাই। মহাপুরুষেরাও দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব আরোপে বিশেষ বিরক্তিই প্রকাশ করিয়া থাকেন। গোবিন্দের কড়চায় দেখা যায়, বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর জ্ঞানে স্তবস্তুতি করিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় তাঁহাকে ঈশ্বর বলাতে তিনি সামান্য সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া-ছিলেন আবার চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন এবং সার্ব্বভৌমের নিকট বলিতেছেন "কৃপাকর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি।" যাহা হউক চৈতন্যভাগবতে গ্রন্থকারের অলৌকিকত্বে ও অবতারবাদে অকপট প্রগাঢ় বিশ্বাস সকল অলৌকিক উপাখ্যানকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে।

অবতারের প্রয়োজনীয়তা, ভক্তিতত্ত্ব, ভক্তমাহাত্ম্য, তীর্থমাহাত্ম্য, নাম-মাহাত্ম্য, সাধু সঙ্গের প্রভাব, শ্রীকৃষ্ণ কৃপাব্যতীত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের দুর্জ্ঞেয়তা প্রভৃতি বৈষ্ণবসমাজের অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত যাবদীয় লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তদিগের সহিত মহাপ্রভু যে নানা কথোপকথন ও লীলা করিয়াছিলেন তাহার বিশদ বর্ণনা এই গ্রন্থকে উপাদেয় করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তৎকালীন বঙ্গসমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের নানা

উপকরণ এই গ্রন্থের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ভক্ত বৈষ্ণব যেমন শ্রীশ্রীচৈতন্য ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভাগবতী মহিমা ও ভক্তি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনামূলক বলিয়া চৈতন্যভাগবতকে সমাদর করেন তেমনি তত্ত্বান্বেষী সাহিত্যসেবীও এই গ্রন্থকে তৎকালীন বিবিধতত্ত্বের আধার বলিয়া সমাদর করিবেন।

এই গ্রন্থ প্রায় একই ছন্দে রচিত। ইহার ভাষা অত্যন্ত সাধারণ রকমের। আদিখণ্ড তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায় মধ্যখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায় প্রভৃতিতে স্থানে স্থানে রূপ বর্ণনায় যে একটু বর্ণনা-সৌন্দর্য্য আছে, তদ্ভিন্ন বিশেষ কোন কবিত্ব নাই। ভক্তবৈষ্ণবের সরল বিশ্বাসপূর্ণ বর্ণনা ইহাকে উজ্জ্বল করিয়াছে। কোথায়ও কোন প্রকারের কৃত্রিমতা বা আড়ষ্টভাব নাই। লেখকের প্রাণে যেটী যেমনভাবে উপস্থিত হইয়াছে, অকপটে তিনি তাহা সরল ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন।

দুইজনে পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যাহারে যে পায়, সেই তাহারে কিলায়॥
ক্ষণে দুইজনে গ্রাত, ক্ষণে পরে চুলে।
'চকার বকার' শব্দ উচ্চ করি বোলে॥
মধ্যখণ্ড ১৩ অধ্যায়।

খোলাবেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে।
দীর্ঘ করি হরি নাম বলিতে বলিতে॥
*　　*　　*
কোন পাপী বলে "হের দেখ ভাই সব।
খোলাবেচা মুনিসাও হইল বৈষ্ণব॥
পরিধান বস্ত্র নাহি পেটে নাই ভাত।
লোকেরে জানায় ভাব হইল আমাত॥"
মধ্যখণ্ড ২৩ অধ্যায়।

অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবদ্বেষীদিগের প্রতি বৃন্দাবন দাস তীব্র কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। অনেকস্থলে এই কটূক্তির অসংযত ভাষা বৈষ্ণব-জনোচিত বিনয় কেন সাধারণ ভদ্রতাকেও অতিক্রম করিয়াছে। তবে হয়ত তখনকার দিনে ক্রোধের ভাষা তখনকার ভদ্রলোকদের মুখেও ঐ আকারেই প্রকাশ পাইত। এখন ঐ ভাষায় ক্রোধ প্রকাশ গ্রাম্য স্ত্রীজনোচিত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। মাতা নারায়ণীর প্রতি শ্রীচৈতন্যের বিশেষ কৃপা হওয়ায় তিনি উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইয়া ছিলেন এবং অজ্ঞান বালিকা হইয়াও শ্রীচৈতন্যের কৃপায় কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া ছিলেন এবং গৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র বলিয়া বিদিত ছিলেন। এইসব কথায় যাহার প্রত্যয় না হয়, সদ্য সদ্য তাহার সুনিশ্চিত অধঃপাত হইবে একথা বিনয়ের লক্ষণ না হইলেও, পুত্রের মুখে মাতার বিষয়ের কথা বলিয়া উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু কথায় কথায় পাষণ্ডীদের অধঃপাত সর্ব্বনাশ হউক বলিলে নিতান্ত ক্রোধান্ধ স্ত্রীলোকের ভাষা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

তখনকার বৈষ্ণবদ্বেষীরা যেভাবে নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির সমালোচনা করিতেন তাহার বিবরণ মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় ও অষ্টম অধ্যায়ে দেখা যায়। আবার অবৈষ্ণব পণ্ডিতেরা কদর্থ করিয়া ভক্তি ধর্ম্মপ্রচারে যে ব্যাঘাত উপস্থিত করিতেন তাহা মধ্যখণ্ডের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা হইতে তীব্র কটূক্তি ও অসংযত ভাষা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হয় না। তথাপি কথায় কথায় সর্ব্বনাশ অধঃপাত ত আছেই—তার উপরে অনেকস্থলে

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে॥

এই অতি হীনজনোচিত ভাষার প্রয়োগ আছে।

তখনকার দিনে নূতন বৈষ্ণব সমাজের প্রতি যথাসম্ভব অত্যাচার হইয়াছিল এবং হয়ত বৈষ্ণবদিগের নানা লাঞ্ছনাও হইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া চৈতন্যভাগবতে তাহার ফলস্বরূপ ক্রোধান্ধ অসংযত ভাষার মসীচিত্র দেখিতে ইচ্ছা করে না। এই ভাগবতের নানা স্থলে পুণ্য কথা শুনিলে কৃষ্ণপাদপদ্মে বাস, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি, সংসার-বন্ধন, মুক্তি, প্রভৃতি ফল সম্ভাবনার নির্দ্দেশ করিয়া পদ রচনা আছে। এই প্রলোভন ও বিশ্বাস না করিলে সদ্য অধঃপাতে যাওয়ার তাড়না উভয়ই এক গোত্রের।

চৈতন্য-ভাগবতে চৈতন্য-লীলার শেষভাগ সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হয় নাই।

বিস্তার করিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্র ধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥
নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥ (চৈতন্য চরিতামৃত)

ভাগবতের অন্তখণ্ডে একাদশ অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমাবেশে কূপের মধ্যে পতন এবং কূপ হইতে উত্তোলনের বর্ণনা আছে। তারপরে আর বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না। এই বর্ণনা জয়ানন্দের বর্ণিত তিরোধান কাহিনীর কিয়ৎপরিমাণে সমর্থন করে।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, চৈতন্যভাগবতের কিয়দংশ লুপ্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় চৈতন্যভাগবতের পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রচলন ছিল। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ এই পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত শ্রবণ করিতেন। তদবধি চৈতন্যভাগবত সকল বৈষ্ণবের পরম প্রিয় ও শ্রদ্ধার সহিত নিত্যপাঠ্য-গ্রন্থ হইয়া রহিয়াছে।

চৈতন্য-চরিতামৃত

বৈষ্ণবচরিতসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। ইনি বৈদ্যবংশীয়; নৈহাটীর সন্নিকটে ঝামটপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার জন্মকাল এখনও সুনির্ণীত হয় নাই, কেহ বলেন ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ, কেহ তাহার কয়েক বৎসর পরে নির্দ্দেশ করেন। ইনি শৈশবকালে পিতৃমাতৃহীন হন। অনেক কষ্টে বিদ্যা উপার্জ্জন করেন। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে গমন করেন। ইনি কখন দার পরিগ্রহ করেন নাই। সেখানে জীব গোস্বামী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ছয়জন বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের নিকট ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। তিনি যে বহু শাস্ত্রবিৎ ও সুপণ্ডিত ছিলেন তাঁহার গ্রন্থেই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের অনুরোধে কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যদেবের শেষলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার ভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা। কিন্তু এই অনুরোধ দৈবাদেশের মত তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিল। চৈতন্যভাগবত, কড়চা, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বন করিয়া ও বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের নিকট মৌখিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া—অতিশয় শ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত এই চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। সাত বৎসরে (১৫৮২ খৃষ্টাব্দে) এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। তখন এই গ্রন্থ গৌড়ে প্রেরিত হয়। পথে বনবিষ্ণুপুরে এই গ্রন্থ ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ দস্যুগণ লুণ্ঠন করে। এই সংবাদ বৃন্দাবনে পৌছিলে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরম দুঃখিত হইলেন। আর যিনি বৃদ্ধ বয়সে ভগ্নদেহে প্রাণান্ত করিয়া

চরিতামৃত রচনা করিয়াছিলেন সেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—এই শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অনেকে পুত্র শোকেও প্রাণ ত্যাগ করে না, আর বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী শেষ জীবনের বহু প্রাণান্ত শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল বৈষ্ণবসেবায় উৎসর্গীকৃত চরিতামৃতগ্রন্থ অপহরণ সহ্য করিতে পারিলেন না। পরে এই গ্রন্থের উদ্ধার হয় এবং দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠাও লাভ করে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই পুস্তকের সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করেন। বৈষ্ণব সমাজে এখনও এই পুস্তক রীতিমত পূজিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় কবিরাজ গোস্বামী—তাহার গ্রন্থের এই অতুলনীয় সমাদর ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। গ্রন্থের নাম সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কবিরাজ গোস্বামী গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং কর্ণামৃতের টীকা ও রাগমালা, প্রেমরত্নাবলী, বৈষ্ণবাষ্টক প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

চৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণব সমাজের কেন বাঙ্গালী মাত্রেরই বড় আদরের সামগ্রী। কোন দেশের চরিতাখ্যান রচনায় এমন নিপুণতা, এমন সৌন্দর্য্য, এমন পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয় নাই। ইহা একদিকে শ্রীচৈতন্যের জীবন-কাহিনী—অন্যদিকে তেমনি শ্রীচৈতন্যের ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যা, আবার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তঃ প্রকৃতির বিশ্লেষণ ও সাধনভজনের নানা উপদেশ, আবার প্রেম ভক্তি বিনয়ের অপূর্ব্ব ছবি। চৈতন্য চরিতের যে যে অংশ কড়চায়, চৈতন্যমঙ্গলে, চৈতন্যভাগবতে পরিস্ফুট হয় নাই—সেই সেই অংশ বৃদ্ধ কবিরাজের নিপুণ তুলিকাস্পর্শে অপূর্ব্ব শোভা মণ্ডিত হইয়া চরিতামৃতে প্রতিভাসিত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলির দার্শনিক ভিত্তি তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট ছিল বলিয়া তিনি পরম গৌরবে

উজ্জ্বলভাবে দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। রামানন্দের সঙ্গে বিচারের বর্ণনায় কবিরাজের পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বজ্ঞান চমৎকার ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেম ভক্তির গভীর তত্ত্ব বিচারে কি নিপুণতা কি পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে। পদাবলীতে যাহার ঈঙ্গিত মাত্র ছিল, পূর্ব্ববর্ত্তীগণ যাহার মধুগন্ধেই লুব্ধ হইয়াছিলেন অথচ সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করিতে পারেন নাই, সেই অতি অপূর্ব্ব তত্ত্ব সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। ভক্তি ধর্ম্মের আর সব পর্য্যায় অতি বাহিরের জিনিস, শুধু রাধা প্রেমই সাধ্য শিরোমণি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ প্রেমে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয়কায় তার প্রেমই প্রেমসার —মহাভাবচিন্তামণি।

শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ বর্ণনার চিত্র সাহিত্যের ভাণ্ডারে অমূল্য সঞ্চয়। শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনে যে মহাভাব চিরস্থায়ী হইয়া তাঁহার জীবনকে অধিকার করিয়াছিল সেই ভাববিহ্বলতার ক্রমবিকাশ চরিতামৃতে অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের বর্ণনায় ভক্তকে যেন প্রত্যক্ষ করি—প্রেমোন্মত্ততা যেন সম্মুখে উপস্থিত হয়। ভক্তিধর্ম্মের যে সকল তত্ত্ব বাহিরে সূত্র রূপে পড়িয়াছিল শ্রীচৈতন্য সেই ভক্তিধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ লক্ষণ নিজের জীবনে ও ধর্ম্ম মতে জীবন্তভাবে প্রকাশিত করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী ভক্তি শাস্ত্র ও চৈতন্যজীবনকাহিনী মন্থন করিয়া সেই তত্ত্ব বস্তু জীবন্ত সত্য সুন্দর ও সহজলভ্য করিলেন। আমাদের চক্ষু কর্ণাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়, এই দেহ মন প্রাণ, তাঁহার অধিষ্ঠান ভূমি। আমাদের দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপারে ইন্দ্রিয়াদি যোগে সকল বিষয় গ্রহণের সঙ্গে তাঁহার প্রবর্ত্তনা ও বিদ্যমানতা অনুভব করি। আমার সকল ইন্দ্রিয়, সকল ভোগ, সকল বাহিরের বস্তু, সকল অন্তরের বস্তু সেই রসস্বরূপের সহিত নিত্য সংযোগের উপায় হইয়া রহিয়াছে।

রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারথি।
যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব রথী॥

কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবনে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন আবার তত্ত্ববস্তুর সহিতও সুপরিচিত ছিলেন, কাজেই তাঁহার গ্রন্থে বৈষ্ণব সাধনের তত্ত্ব নির্দ্দেশ স্বরূপ লক্ষণ বিচার এত সুন্দর রূপে প্রকটিত হইয়াছে। আদি-লীলার প্রথমেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে সেই সব অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
(মধ্য লীলা ২২শ অধ্যায়)

রামানন্দ রায়ের সহিত বিচারে বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আবার রূপ সনাতনের প্রতি উপদেশে তত্ত্বাঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভজন সাধনের নানা উপদেশ বিবৃত হইয়াছে। এইগুলি পূর্ব্ব অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইরূপ নানা স্থলে বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্ব চরিতামৃতে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মধ্য লীলার ১৬ অধ্যায়ে বৈষ্ণব লক্ষণ কি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

কৃষ্ণদাস এই গ্রন্থে বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

"চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করো মুঞি পানে॥

* * * *

শ্রোতা পদ রেণু করো মস্তক ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হয় শ্রম ॥”

চৈতন্য চরিতামৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম তত্ত্ব-পিপাসীর পক্ষে অমৃত স্বরূপ জগতের চরিত সাহিত্যে অতুলনীয়। এই গ্রন্থের আদি লীলায় ১৭ মধ্য লীলায় ২৫ ও অন্ত লীলায় ২০ পরিচ্ছেদ আছে। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পাঠকে অবলম্বন করিয়া যে সকল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে শ্লোক সংখ্যা ৬১৩৬ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে এই শ্লোক সংখ্যা নির্দ্দেশে কিছু বিশেষত্ব আছে। অনেক স্থলে পয়ারের ৪ লাইন একটী শ্লোক বলিয়া ধরা হইযাছে। যথা—আদি লীলা ১১।১৩।১৪ পরিচ্ছেদ মধ্য লীলা ১৩।১৯ পরিচ্ছেদ প্রভৃতি; আবার কোনও কোনও স্থলে ৮০ লাইনেও একটী শ্লোক বলিয়া ধরা হইয়াছে যথা—অন্ত লীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ প্রভৃতি। সুতরাং এগুলির নূতন করিয়া সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলে দীনেশ বাবুর কথিত ১২০৫১ শ্লোক সংখ্যা হইতে পারে। এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পুরাণ প্রভৃতি হইতে নানা ভাবোপযোগী শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। উদ্ধৃত শ্লোক হইতে কবিরাজ গোস্বামীর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে যে যে গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে ভদ্র মহাশয় একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই তালিকা হইতে দেখা যায় শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, বেদান্ত, দর্শন ও মনু সংহিতা এবং ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতি ১৮ খানি পুরাণ, তন্ত্র ও অন্য শাস্ত্রগ্রন্থ, অমরকোষ, রঘুবংশ, শকুন্তলা প্রভৃতি ১২ খানি প্রাচীন সাহিত্যের গ্রন্থ এবং তৎকাল প্রচলিত অন্যান্য ২৬ খানি বৈষ্ণব সাহিত্যের গ্রন্থ হইতে অতি নিপুণতার সহিত উপযোগিতানুযায়ী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কৃষ্ণদাসের নিজের রচিত অনেক সংস্কৃত শ্লোক সংযোজিত হইয়াছে।

স্বরূপ লক্ষণ, বিশেষ লক্ষণ, তটস্থ লক্ষণ, সামান্য লক্ষণ, অনুবাদ, বিধেয়, বিগ্রহ, বিভূতি, বিকার, পঞ্চতত্ত্ব, নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব, সবিশেষ, মায়াভাস, অঙ্গাভাস, গৌণ মুখ্য ও সামান্য কারণ, স্বরূপ শক্তি, তটস্থ শক্তি প্রভৃতি অনেক দার্শনিক শব্দ ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। হিন্দু দর্শনের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় না থাকিলে এই সকল বিষয় সাধারণ পাঠকের নিকট কিছু দুরধিগম্য। চরিতামৃতের ভাষা সর্ব্বত্র সরল সহজ বোধ্য নহে, তবে স্বচ্ছন্দগতি ও সুসংযত। সংস্কৃত বৃন্দাবনী, ব্রজবুলি, বাঙ্গালা এবং মুসলমানী শব্দের বিচিত্র সংমিশ্রণ এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভাষায় মিষ্টতার অভাব হইলেও ভাব প্রকাশের অক্ষমতা কোথায়ও নাই। মধ্যলীলার ২১ পরিচ্ছেদ অন্তলীলার ১৫ পরিচ্ছেদের স্থানে স্থানে সৌন্দর্য্য বর্ণনায় কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। দুই এক স্থানে অনুস্বার, বিসর্গ হীন সংস্কৃতপদসমষ্টি বাঙ্গালার স্থান অধিকার করিয়াছে; মধ্যলীলার ২২।২৩ পরিচ্ছেদে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এইরূপ নানা মিশ্রিত ভাষা ও জটিল তত্ত্বালোচনা পূর্ণ বলিয়া চরিতামৃত সাধারণ পাঠকের মনোরম ও সুখপাঠ্য নহে। সুনির্ম্মল শরচ্চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় এই ভাষার সামান্য ক্রটী চৈতন্য-চরিতামৃতের বিশ্বজনীন শ্রেষ্ঠতা ও উপাদেয়তা কিছুই ম্লান করিতে পারে নাই। দীনেশবাবুর সমালোচনা এখানে উদ্ধার করিয়া এই আলোচনা শেষ করিতেছি।

"চৈতন্য প্রভুর জীবনসম্বন্ধে গোবিন্দ দাসের কড়চার পরে চৈতন্য-চরিতামৃতই শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ কিন্তু গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রবীণতাগুণে এই পুস্তক পূর্ব্ববর্ত্তী সকল পুস্তক হইতে শ্রেষ্ঠ। চৈতন্যভাগবতের ন্যায় ইহাতে ঘটনার তত ঘন সন্নিবেশ নাই; বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে মধ্যে অবকাশ আছে, কিন্তু সেই অবকাশ ছবির অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের ন্যায়

মূল ঘটনার সৌন্দর্য্য গাঢ় ভাবে স্পষ্ট করে। বৈষ্ণবোচিত সুন্দর বিনয়, ভক্তির ব্যাখ্যা, স্বচ্ছন্দে সংযত লেখনী দ্বারা বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোড়ন ও প্রেমকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসম্বদ্ধ করার নৈপুণ্য—এই বহুগুণ সমন্বিত হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত এক উন্নত প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে ক্ষুদ্র লতাগুল্ম পুষ্প হইতে বৃহৎ বনস্পতির বিচিত্র সমাবেশ যুক্ত বৈভব প্রকটিত করিতেছে।”

অন্যান্য চরিতাখ্যান

চৈতন্যের পারিষদ ও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের জীবন-কাহিনী লইয়া অনেক গুলি চরিতাখ্যান রচিত হইয়া ছিল। সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

নিত্যানন্দ বংশমালা বা নিত্যানন্দ বংশাবলী বা নিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার—বৃন্দাবন দাস বিরচিত। নিত্যানন্দের বংশ পরিচয় ইহাতে আছে। প্রচলিত যাবদীয় বৈষ্ণব চরিতাখ্যানেই নিরভিমান অক্রোধ নিত্যানন্দের উল্লেখ ও পরিচয় আছে।

প্রেমানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ রায়!
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায়॥ (মধ্যলীলা ১২অধ্যায়)

শ্যামদাস প্রণীত অদ্বৈতমঙ্গল, ঈশান নাগর প্রণীত অদ্বৈত প্রকাশ, হরিচরণ দাস প্রণীত অদ্বৈত মঙ্গল, শ্যামানন্দ প্রণীত অদ্বৈত তত্ত্ব, নরহরি দাস প্রণীত অদ্বৈত বিলাস, লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত অদ্বৈতের বাল্য-

লীলা সূত্র প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থে অদ্বৈতাচার্য্যের জীবনচরিত লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ—তাঁহার সম সাময়িক এবং কেহ কেহ—বহু পরবর্ত্তী। এইসকল গ্রন্থের মধ্যে অনেক গুলিতে তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের ও বৈষ্ণব ভক্ত দিগের বিবরণ পাওয়া যায়। ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশের প্রথম অংশে অলৌকিকত্বের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

ভক্তি রত্নাকর—নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এইখানি চরিতাখ্যান না হইলেও ইহাতে বহু বৈষ্ণব ভক্তের পরিচয় আছে। এবং তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে এবং চৈতন্য-ভাগবত চৈতন্যচরিতামৃত হইতে নানা শ্লোক এবং পদকর্ত্তাদিগের নানা পদ প্রসঙ্গোপযোগী করিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ চৈতন্য-চরিতামৃতের ন্যায় নানা তত্ত্ব পরিপূর্ণ, আবার সামাজিক ইতিহাসেরও নানা উপকরণ ইহাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। চৈতন্য-ভাগবত চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতির পরেই এই গ্রন্থ বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীনিবাসচরিত ও নরোত্তম বিলাস—নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত। গৌর-চরিত চিন্তামণি—নরহরি প্রণীত। বৈষ্ণব বন্দনা—ইহা প্রকৃতপক্ষে চরিতাখ্যান না হইলেও মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বহু ভক্ত বৈষ্ণবের পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ দেবকী-নন্দন দাস বিরচিত, এই নামের আর একখানি গ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের রচিত।

প্রেমবিলাস—শ্রীনিবাস এবং শ্যামানন্দের জীবন-কাহিনী লইয়া নিত্যানন্দদাস কর্ত্তৃক বিরচিত।

কর্ণানন্দ—যদুনন্দন দাস বিরচিত। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাহার শিষ্যগণের জীবন কথা ইহার মূল আখ্যান বস্তু।

সীতাচরিত্র—অদ্বৈতের স্ত্রী সীতাদেবীর জীবনী, লোকনাথ দাস কর্ত্তৃক বিরচিত। রসিক মঙ্গল—গোপীবল্লভ দাস বিরচিত রসিকানন্দের জীবন চরিত।

বংশীশিক্ষা—পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের অনুচর ও সমসাময়িক বংশীদাসের জীবনী।

চৈতন্যগণোদ্দেশ বৈষ্ণবাচারদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থ এই বিভাগের অন্তর্গত। এই সকল গ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ ও সমালোচনার স্থান নাই সুতরাং নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল।

বিবিধ গ্রন্থ

বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যান্য বিবিধ গ্রন্থের সংক্ষেপ উল্লেখ করিয় আলোচনা শেষ করিব। সর্ব্বপ্রথমে ভক্তমালের উল্লেখ করিতেছি। এইখানি নাভাজী রচিত হিন্দী ভক্তমালের বঙ্গানুবাদ (free translation)। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস ভাল হিন্দী জানিতেন না; বিশেষ শ্রমস্বীকার করিয়া এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন এবং আরও বহুসংখ্যক বৈষ্ণবজীবনী সন্নিবেশ করিয়া ভক্তমাল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মূল হইতে অনুবাদ অনেক বৃহৎ এবং মূলাতিরিক্ত বহু ভক্তজীবনী ও নানাতত্ত্ব পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থে নানা সংস্কৃতগ্রন্থ হইতে শ্লোক ও নানা

পদকর্ত্তার পদ প্রসঙ্গ ক্রমে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ খানি সুবৃহৎ হইলেও সর্ব্ব সাধারণের সুখপাঠ্য। বহু ভক্ত জীবনকাহিনীর পুষ্পস্তবকে এই ভক্তমালা গ্রথিত হইয়া ভক্তজনের পরম প্রিয় ও সংসারীরও সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ মূলক সান্ত্বনার স্থল হইয়াছে। ভক্তমালের কৃষ্ণদাস শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ধর্ম্মতত্ত্ব-পারদর্শী ছিলেন। এই কৃষ্ণদাস কোন্ কৃষ্ণদাস তাহার শেষ মীমাংসা অদ্যাপি হয় নাই। এই গ্রন্থ ইংরাজী Lives of Saints প্রভৃতি গ্রন্থের তুলনায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে। ইহাতে ভক্ত-জীবনীর সঙ্গে ভক্তি ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, রাধা প্রেম ও রাধা ভাবের তত্ত্ব সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ইহার পরেই নরোত্তম দাসের "প্রার্থনা" "হাটপত্তন" "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" প্রভৃতি পুস্তক বৈষ্ণবদিগের পরম আদরের সামগ্রী। নরোত্তম দাস বৈষ্ণব জগতেও যেমন সুপ্রসিদ্ধ, বৈষ্ণব সাহিত্য-জগতেও তেমনি প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রার্থনা যেমন প্রাণস্পর্শী, তেমনি সরল, সুন্দর, ও মধুর। চৈতন্যের প্রেমের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরী করার প্রার্থনা করিয়া হাটপত্তনে নরোত্তম শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বৈষ্ণব ভক্তদিগের নিপুণ বর্ণনা করিয়াছেন। নরোত্তম লোকনাথ প্রভুর কুটীর দ্বারে সত্য সত্যই ঝাড়ুগিরি করিয়া তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। অনুরাগবল্লী ও প্রেম বিলাসে ইহার বর্ণনা আছে। নরোত্তম দাসের আরও অনেকগুলি গ্রন্থ আছে।

লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত—রত্নাবলীর বঙ্গানুবাদ। রত্নাবলী—বিষ্ণুপুরী ঠাকুর প্রণীত সংস্কৃত কাব্য। যদুনন্দনদাস প্রণীত—গোবিন্দ লীলামৃত বিদগ্ধমাধব কর্ণানন্দ কৃষ্ণকর্ণামৃত। বল্লভদাস প্রণীত—বংশীলীলা ও রসকদম্ব। রাজবল্লভ দাস প্রণীত—বংশী বিলাস। জগজ্জীবন মিশ্র প্রণীত—মনঃসন্তোষিনী। নিত্যানন্দ দাস প্রণীত—

রাগময়ী কণা। নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত—ব্রজপরিক্রমা। প্রেমদাস প্রণীত—বংশীশিক্ষা। দ্বিজহরি দাস প্রণীত অষ্টোত্তর শতনাম প্রভৃতি আর কত গ্রন্থের নাম করিব। বৈষ্ণব সাহিত্যের যে সব অমূল্য গ্রন্থরাজি বটতলার কৃপায় রক্ষিত হইয়াছে ও যে সকল গ্রন্থরত্নের অদ্যাবধি নানা সাহিত্যসেবীর শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টায় বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আদ্যোপান্ত নিপুণ ভাবে পাঠ করিবার অবসর ও সুযোগ সকলের ভাগ্যে মিলে না; আবার কত গ্রন্থ এখনও অনাবিষ্কৃত অপ্রকাশিত রহিয়াছে কে নির্ণয় করিবে। এই সকল বিবিধ গ্রন্থের সকল গুলিতেই রচনা-পারিপাট্য বর্ণনা-কৌশল বা কবিত্ব পরিস্ফুট না হইলেও সর্ব্বত্র গুরুবৈষ্ণববন্দনা বৈষ্ণবোচিতবিনয় অক্রোধ নিরভিমান ভক্তিলাভের ব্যাকুলতা অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। হেলা, উপেক্ষা ও উপযুক্তশ্রম যত্নাভাবে যে বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্য মহাকালের ধ্বংসকুক্ষিগত হইবার উপক্রম হইতেছে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলে, অজ্ঞাতবাস হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে, বাঙ্গালার মধ্য যুগের (ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর) ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগৃহীত হইত এবং ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাও অক্ষুণ্ণভাবে নিরূপিত হইত।

অন্যান্য কথা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার দুই প্রধান সহায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। ইঁহাদের তিনজনের জীবন-কাহিনী লইয়া নানা গ্রন্থ ও লীলা বর্ণনা করিয়া নানা সুমধুর পদ রচিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য ও গদাধরের ন্যায়, শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ বৈষ্ণব সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিলে যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বুঝায় তেমনি 'আচার্য্যরত্ন বলিলে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও 'ঠাকুর মহাশয়' বলিলে নরোত্তম ঠাকুরকেই বুঝায়। ইঁহারা ও নরহরি সরকার (সরকার ঠাকুর) বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যেমন বৈষ্ণব-সমাজে, তেমনি বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্থায়ী পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। রূপ, সনাতন, রঘুনাথদাস, রঘুনাথভট্ট, গোপাল ভট্ট এবং জীব গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্ম্ম তত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া নানা সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহাদের কতকগুলি গ্রন্থ পরে অন্য বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। এই সকল বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নিজের জীবনে বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধন ভজন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল করিয়াছেন, আবার নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া এই নূতনধর্ম্মতত্ত্বকে দার্শনিক ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের জীবন নিষ্ঠা, ভক্তি, সেবা, বিনয় ও বৈরাগ্যের আদর্শ লীলাক্ষেত্র ছিল।

অনিকেতন দুহে বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন ॥

বিপ্র গৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটি চানা চাবায় ভোগ পরিহরি ॥
করোয়া মাত্র হাতে কন্থা ছিঁড়ি বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ কথা নর্ত্তন উল্লাস।
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর কৃষ্ণ ভজন চারি দণ্ড শয়ন।
নাম সঙ্কীর্ত্তনে সেহো নহে কোন দিন ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত

জীব গোস্বামী প্রভৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত ছয়জন বৈষ্ণব গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের আদেশে ও অভিপ্রায় মতে বৃন্দাবনে বৈষ্ণবভক্তমণ্ডলী গঠন করেন। ইঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাতা ও বৈষ্ণবাচারবিধি প্রণেতা এবং প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের আধার ছিলেন। ইঁহাদের প্রভাবে বৃন্দাবনের লুপ্তপ্রায়মহিমা নূতন গৌরবে প্রকটিত হইল। তাই নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন বর্ণনা করিয়া নানা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। নবদ্বীপ, বৃন্দাবন ও নীলাচল এই তিন ধাম বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থল ছিল। এই বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের সেবা, বিনয়, বৈরাগ্য, ভক্তি যেমন বৈষ্ণব সমাজকে পরিপুষ্টি করিয়াছে তেমনি ইঁহাদের পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, কবিত্ব বৈষ্ণব-সাহিত্যকে শক্তিশালী করিয়াছে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যেমন বৈষ্ণব ধর্ম্মকে ইঁহারা সযত্নে রক্ষা করিরাছিলেন তেমনি বহুশ্রমে সযত্নে বৈষ্ণব গ্রন্থাদিও রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বৈষ্ণব ধর্ম্মসাধনা ও সাহিত্য-প্রতিভা বাঙ্গালার সমাজে ও সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাষা

বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সময়ে বঙ্গভাষার কি পরিবর্ত্তন ও প্রসারণ হইয়াছিল এবং বাঙ্গালা সাহিতের নানা ভাবে কি পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল তাহার দিকে দৃষ্টি করা যাক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাষায় বৃন্দাবনী, মুসলমানী, ব্রজবুলী সংস্কৃতের মিশ্রণ হইয়াছিল। প্রথমতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শাস্ত্রালোচনা করিয়া বাঙ্গালায় দর্শন ও ন্যায়ের তত্ত্বপ্রচার করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিরুদ্ধ দলের লোকেরা তন্ত্রাদি অনুবাদ করিয়া বিপরীত মত সমর্থন করিলেন। ইহার ফলে বঙ্গ ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রচার হইল। দার্শনিক শব্দগুলির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আবার নূতন ভাব প্রকাশক শব্দ সকল সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছিল। ব্যবহারের প্রণালী সংস্কৃতের অনুরূপ করিতে গিয়া শব্দের দুরুহত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। অজাগল স্তন ন্যায় (চৈতন্য চরিতামৃত) কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা (চৈচ) সিদ্ধবর্ণ সমাম্নায় (চৈ ভা) জীবন্যাস (চৈভা) স্বানুভাব (চৈভ) স্বানুভাবানন্দ (চৈচ) কায় ব্যূহ রূপ (চৈ-চ) প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস (চৈ-চ) স্বতঃ প্রামাণ্য হানি (চৈ-চ) সন্ধি শাবল্য (চৈ-চ) সংহতি (চৈ-ভা, চৈ-চ) চতুর্ব্ব্যূহ (চৈ-ভা) প্রভৃতি শব্দ সাধারণের

দুর্ব্বোধ্য। বৃন্দাবনী ও হিন্দি ভাষার প্রভাব বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৃন্দাবন প্রবাসী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ধর্ম্ম-মণ্ডলী গঠন করিয়া সমস্ত বৈষ্ণব সমাজের নেতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন কাজেই এই বৃন্দাবনী ও হিন্দি ভাষার এত প্রচলন হইয়া ছিল। ইহার সংমিশ্রণে বাঙ্গালা ভাষা নূতন আকার ধারণ করিল। তুহুঁ, কাঁহা, যাহা তাঁহা, বাত, যৈছে, তৈছে, ভৈগেল ভেল, গেঁলু, খাঁইলু অবহুঁ কবহুঁ প্রভৃতি শব্দ ইহার নিদর্শন। রামাহে বলিয়া অনেক পদ আরম্ভ হইয়াছে এই রামা হে বেহারী হিন্দির প্রতিচ্ছায়া। দারোয়ানদের গানে এই রামাহে এখনও খুব শোনা যায়।

ঙ, ঞ এবং চন্দ্র বিন্দুর উপদ্রব দেখিলে অবাক হইতে হয়। এই যুগের পদাবলী ও চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের সমুদয় অসমাপিকা ক্রিয়া ঞতে পরি সমাপ্তি, যাইঞা খাইঞা লঞা, হইঞা, মারিঞা প্রভৃতি। উত্তমপুরুষের ক্রিয়ার বিশিষ্টতা রক্ষার জন্য অনুনাসিকের বিশেষতঃ চন্দ্রবিন্দুর খুব প্রচলন ছিল। পণ্ডিত গ্রীয়ারসনের মত অনুসরণ করিয়া দীনেশবাবু ঞ ও চন্দ্রবিন্দুর যথেচ্ছ ব্যবহার হিন্দী প্রভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অসমাপিকা ক্রিয়ার শেষে ঞ ব্যবহার বীরভূম বাঁকুড়ার আমদানী বলিয়া মনে করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। কারণ এখনও সে অঞ্চলে কথা বার্ত্তার এই রকম ব্যবহার হয়। য়, ঞ এবং চন্দ্রবিন্দু তিনই বীরভূম বাঁকুড়ার আমদানী বলা যাইতে পারে। কারণ অধিকাংশ কীর্ত্তনিয়া ঐ অঞ্চলের লোক ছিলেন। রাঢ় দেশের কীর্ত্তন এখনও স্বনামপ্রসিদ্ধ। কীর্ত্তনিয়ার মুখে পদাবলীর ভাষার ভিতর দিয়া ভাষার এই রূপান্তর প্রচলিত হইতে পারে। ঐ অঞ্চলে এখনও খেঁয়ে, যেঁয়ে প্রকৃতি কথা (খেঞে, যেঞে সহজেই রূপান্তরিত হইতে পারে) প্রচলিত আছে এবং অনুনাসিকেরও যথেষ্ট প্রচলন

আছে। পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রবিন্দুর অভাব বলিয়া অনেকের ধারণা, ঢাকা বিভাগে তাহা সত্যও বটে, কিন্তু চট্টগ্রামে চন্দ্রবিন্দুর বেশ চলন দেখা যায়। সুতরাং চট্টগ্রাম, বীরভূম, বাঁকুড়ার বৈষ্ণবদিগের সম্মিলনে ও রাঢ়ের কীর্ত্তনিয়াদিগের সংস্রবে অনুনাসিকের প্রচলন হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

পদাবলীসাহিত্যে ব্রজবুলির সংমিশ্রণে বাঙ্গালা ভাষার যে অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক দিন ছিল। গোবিন্দ দাস ব্রজবুলির চরম উৎকর্ষ সাধন করেন। গোবিন্দ দাসের পদের মত এমন শ্রুতিমধুর পদ আর কেহ রচনা করিতে পারেন নাই। যো, সো, থির, তুহু, ইহ, প্রভৃতি শব্দ অনেক দিন রাজত্ব করিয়াছে। এই সময়কার বঙ্গ মৈথিল শব্দের অর্থ লইয়া সময়ে সময়ে সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে যে বিতর্ক বিপ্লব উপস্থিত হয় তাহা স্মরণ করিলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বহু বৎসর পূর্ব্বে 'সাধনা' পত্রে পঁহু ও নিছনি শব্দের ব্যাখ্যা লইয়া ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে লেখক-দিগের পাণ্ডিত্য ও গবেষণা যথেষ্ট থাকিলেও তাহা স্মরণ করিলে কোন ভীরু লোকের কোন শব্দের অর্থ লইয়া বিতর্ক করিতে সাহস হয় না। এই সময়ের কতকগুলি শব্দ পাঠ করিয়াই সহজে অর্থবোধ করা যায় অথবা মূল সংস্কৃত শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। আর কতকগুলি শব্দের অর্থনির্ণয় দুরূহ, কারণ সম্প্রতি হয় ত ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে অথবা ভাষায় আর ব্যবহার হয় না। এইরূপ অপ্রচলিত (obsolete) শব্দের উল্লেখ করিতেছি। যথা নির্ম্মঞ্চন— মুছিয়া ফেলা বা দেওয়া, সমাধিয়া—বিবেচনা করিয়া, উপস্কার—পরিষ্কার, ব্যবসায়—ব্যবহার, সানাসানি—ইঙ্গিত, পরিহার—প্রার্থনা, ওলাহন—ভৎর্সনা, লঘী—মূত্রত্যাগ, গুর্ব্বী—

মলত্যাগ প্রভৃতি। স্থানে স্থানে খাঁটী সংস্কৃত শব্দ চলিয়া গিয়াছে; বিশেষতঃ ক্রিয়াপদগুলি যথা, সিদতি, পিবন্তি, কহসি, বদসি, কুর্ব্বন্তি, গচ্ছতি প্রভৃতি। এই সময় পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিংঙ্গ বিশেষণ অথবা স্ত্রীলিংঙ্গ শব্দের পুলিংঙ্গ বিশেষণ যথেষ্ট দেখা যায়। কারকের বিভক্তির কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। "বৈকুণ্ঠকে গমন" "কাশীরে গমন" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ এখনও কোন কোন অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। "জলকে চল" প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিতার শব্দ এই ছাঁচে ঢালা। সম্বন্ধ কারক বুঝাইবার জন্য কোনও কোনও স্থলে বিশেষ্যের পরে একটি ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত সর্ব্বনাম ব্যবহার হইত। যথা—

সই জুড়াইল মোর হিয়া।

শ্যাম অঙ্গের শীতল পবন তাহার পরশ পাইয়া॥

এখানকার এই 'তাহার' ইংরেজি Pre-Elizabethan যুগের সম্বন্ধ কারকের বিভক্তির মত। অন্যান্য কারকের বিভক্তিতেও সর্ব্বনামের ব্যবহার হইত। কৈরাছি, কৈর‍্যা, দিমু, করিমু, করিবাম, যাইবাম, আছিল, আমাগো, তোমাগো প্রভৃতি অনেক শব্দ যাহা এখন পূর্ব্ববঙ্গের নিজস্ব হইয়াছে তাহার অবাধ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। সামাইল (প্রবেশ করিল) চোরাবলি (চুরি করিলে) প্রভৃতি শব্দের প্রতিরূপে সামানো, জোরাবলি প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত রহিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে যেমন প্রথম পুরুষের কর্ত্তায় উত্তম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়, যথা, রাম যাইব না, সে ভাত খাইব না; এইরূপ ক্রিয়ার অপব্যবহার তখনকার সাহিত্যেও দেখা যায়। ক্রিয়ার পুরুষ অনুসারে বিভক্তি তখন সুপ্রচলিত হয় নাই। ভাষার মধ্যে ভৌগলিক সীমারেখা তখন হয়ত সুস্পষ্ট নির্দ্ধারিত হয় নাই অথবা শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম হইতে বৈষ্ণবভক্তগণের সমাগমে ভাষার প্রাদেশিক কৌলিন্য বা বিশিষ্টতা রক্ষিত হয় নাই। মুসলমান রাজত্বের

পূর্ণ গৌরবের সময় বলিয়া মুসলমানী ভাষার বেশ প্রচলন ছিল। তখনকার মুসলমান প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা হিন্দুর ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও শাস্ত্রবিধি জানিবার জন্য কৌতূহলী ছিলেন এবং তাঁহাদের উৎসাহে আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় অনুবাদ গ্রন্থের সঙ্কলন প্রবর্ত্তন ওপ্রচার হয়। হিন্দু মুসলমানে তখন স্বাভাবিক ঐক্য ছিল কাজেই বৈষ্ণবের ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষায়ও স্বাভাবিকভাবে মুসলমানী শব্দের প্রচলন ছিল। যথা, জুদা, বহুত, জলদি, নানা, চাচা মামু প্রভৃতি। ইহার পরের যুগে আইন-আদালত আসবাব ইমারত প্রভৃতি সংক্রান্ত নানা মুসলমানী কথা অজস্র প্রচলিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী অধিকার লাভ করিল।

শ্রীশব্দের ব্যবহার খুব প্রচলন ছিল। শ্রীকর শ্রীহস্ত শ্রীমুখ শ্রীচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তিরত্নাকরে শ্রীপ্রসাদ পর্য্যন্ত প্রচলিত দেখা যায়। এখনকার শ্রীশ্রীচরণ কমলেযু প্রভৃতি শব্দ বৈষ্ণবযুগের অবতারণা বলিয়াই মনে হয়। এখনও কোন মহাপুরুষ বা বিখ্যাত স্থানের গৌরব বাড়াইবার জন্য শ্রী বা শ্রীশ্রী শব্দ যোগ করিয়া থাকি। নামের পূর্ব্বে শ্রীযোগ করিলেই যথেষ্ট সম্মান করা হইত। তাই এখনও ত্রিপুরার মহারাজার নামের পূর্ব্বে পঞ্চ শ্রীযুক্ত লেখা হয়। শ্রীর শ্রী ছিল, এখন কিন্তু বাবু শব্দ অম্লানবদনে হজম করিলেও শ্রী অনেকের নিকট বিশ্রী বোধ হইতেছে। তাই শ্রীহীন নাম লেখা সাধারণ রীতি হইয়া পড়িতেছে।

বিশেষ বিশেষ উপাধিযুক্ত নাম সেকালের পুস্তকে দেখা যায়; যথা, 'খোলাবেচা শ্রীধর' 'লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস' 'কালা কৃষ্ণদাস" প্রভৃতি। ব্যবসা বাচক আকৃতি বাচক জাতি বাচক বিশেষণের ব্যবহার এখনও কলিকাতা চব্বিশ পরগণা হুগলী নদীয়া প্রভৃতি জিলাতে আছে। বেণে-বৌ, গয়লার ঝি, বামুন দিদি, কায়েত পিসি প্রভৃতি জাতি বাচক বিশেষণ অসংকোচে ব্যবহৃত হয়। "কালো হরিদাস, বেঁটে বলাই, কানা

কার্ত্তিক প্রভৃতি আকৃতি বাচক বিশেষণও অনায়াসে বিশেষ্যের সাক্ষাতে বলা যায়। 'নদের নিতাই' 'কালনার হরিদাস' প্রভৃতিও চলিতেছে। বৈষ্ণবসাহিত্যের এইরূপ বিশেষণ নদীয়ার আমদানি এবং অদ্যাপি পশ্চিম বঙ্গের বহু স্থলে এই জাতীয় বিশেষণের প্রচলন আছে।

নানা ভাষার নানা শব্দ গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব যুগে বঙ্গভাষা বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। যে ভাষা যত গ্রহণ করিতে পারে, সে ভাষা তত পরিপুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন হয়। এই সময়কার ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনেক শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও অনেক সুললিত শব্দ ও ক্রিয়া পদের সম্প্রসারণমূলক শব্দ কবিতায় ব্যবহৃত হইতেছে। নূতন শব্দ সকল নূতন ভাব প্রকাশের সহায়তা করিয়াছে। অল্প বিস্তর মার্জ্জিত হইয়া ভাষার ভাণ্ডারে সেইগুলি স্থায়ী সঞ্চয় হইয়াছে। এই সময়ে ভাষার যে সম্প্রসারণ, নমনশীলতা, স্বচ্ছতা ও সজীবতা দৃষ্ট হয় তাহারই ফলে বঙ্গ ভাষার পরবর্ত্তী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভব হইয়াছে।

ছন্দ অলঙ্কার ও রস

বৈষ্ণব সাহিত্যের গদ্য গ্রন্থ অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সুপ্রচলিত নহে। পৃথিবীর সকল জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে গীতিকবিতা প্রথমস্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে; কবিতা যেন মানুষের ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশের স্বাভাবিক প্রণালী। তাই যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষা সকল প্রথম সাধনা এই কবিতার

সাহায্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষ্ণবযুগের অমৃতময়গীতি-কবিতা বঙ্গ সাহিত্যের পরম গৌরবের জিনিস। এই সময়ে সংস্কৃতের অনুকরণে নানা ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কবিতার ছন্দ এই সময় বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে। বৈষ্ণবকবিরা পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া একাবলী লঘুত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, ধামালীপদের ষোলমাত্রার ত্রিপদী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দ প্রচলন করেন। এই পদগুলি সর্ব্বদা গীত হইত বলিয়া অক্ষর মিলন অপেক্ষা মাত্রা মিলনের দিকে বেশী দৃষ্টি ছিল। শ্রুতিমধুরতা ও তান-লয়ের দিকে বেশী দৃষ্টি থাকাতে অক্ষর নিয়মের তত বাঁধাবাঁধি ছিল না। অনেক সময়ে বর্গের প্রথম বর্ণের সহিত দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ যে কোন বর্ণের সহিত মিল করা হইত। কোন কোন স্থানে গুরু লঘু উচ্চারণের মাত্রা অনুসারে পদবিন্যাস করা হইত। বৈষ্ণব-কবিরা এত বিচিত্র ও সুললিত ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন যে,পরবর্ত্তী যুগে কেবল ভারত-চন্দ্রই যৎকিঞ্চিৎ ছন্দ-বিচিত্রতার অবতারণা করিতে পারিয়াছিলেন। আর বর্ত্তমান যুগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ছন্দের ভাণ্ডারে কেহ নূতন সঞ্চয় করিতে পারেন নাই।

ছন্দের পরে উপমার ঐশ্বর্য্যের কথা ও শব্দ-লালিত্যের কথা বলিতে হয়। এমন মধুর শব্দযোজনা ও উপমা প্রয়োগ আর বেশী বড় দেখা যায় না। শব্দ ও উপমার সাহায্যে Keatsএর কবিতার মত একটি বাক্য-তুলিকা রচিত সৌন্দর্য্য-চিত্র জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যের রস অতি অপূর্ব্ব সামগ্রী। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা কাব্য রচনায় রস অলঙ্কারের যে বাঁধা-ধরা নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে বলিতেন, এখন আর কেহ সেই নিয়ম মানিয়া চলিতে রাজী হইবে না। কিন্তু রচনার মধ্যে কোন রসের উপযোগী ভাব-ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট করিতে পারিলে, বর্ণনা হিসাবে যেমন তাহার সফলতা হয়, তেমনি কাব্য

হিসাবেও তাহার সার্থকতা হয়। পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম মূল, অবলম্বন হইলেও, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি রসেরও অভাব নাই। অনেক স্থলে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রের অবকাশে মূল চিত্রটী অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আবার রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনায় পূর্ব্বরাগ, রূপাভিসার রসোদ্গার, বাসক সজ্জা, অভিসার, মান, মানান্তমিলন প্রভৃতি নানা শ্রেণী বিভাগ করিয়া উহার বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারি ভাব বর্ণনা করিয়া, বৈষ্ণবকবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলারস আস্বাদন সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক করিয়াছেন।

বৈষ্ণবকবিতার রস প্রকরণ বিস্তৃত বর্ণনা করিবার সুযোগ হইল না। রসগ্রাহী পাঠকগণ পদাবলীর রসবৈচিত্র্য ও অলঙ্কার বৈচিত্র্যের নিদর্শন বহু পদে প্রাপ্ত হইবেন এবং রস বর্ণনার নিপুণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন! এমন ভাব-সুপ্রকাশ (Expressiveness) এবং ভাব-ব্যঞ্জনার (Suggestiveness) অপূর্ব্ব সমাবেশ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

পদকল্প-তরু প্রভৃতি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে এক এক ভাবের যত পদ-কর্ত্তার পদ সেই ভাবের অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যেমন স্বয়ং দৌত্য অথবা প্রেমবৈচিত্র বা মান। অলঙ্কার শাস্ত্রের সূত্রানুযায়ী এক এক ভাবের পদসমষ্টি শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। সকল পদকর্ত্তার সব পদগুলিই ভাবে, সৌন্দর্য্যে, কবিত্বে পরমোজ্জ্বল নহে, কিন্তু সর্ব্বত্র লালিত্য ও শব্দ-বিন্যাসকৌশল দেখিতে পাওয়া যায় কোন কোন পদে পুনরাবৃত্তি দোষ দেখা যায়। কোথায়ও কোথায়ও অক্ষম অনুকরণও লক্ষিত হয়। কিন্তু আমার মনে হয় ভাবানুযায়ী পদ-সংগ্রহ করাতেই এই সকল ত্রুটী উজ্জ্বলভাবে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হয়। আবার অনেকস্থলে নানা পদ কর্ত্তার পদের দ্বারায় একটী সমগ্র ভাবের পরিপূর্ণ চিত্র প্রতি-

ভাসিত হইয়াছে ; অনেকস্থলে একের মধ্যে যাহা অব্যক্ত, যাহা অস্পষ্ট ছিল অন্যের পদে তাহা সুস্পষ্ট ও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং পদ-সংগ্রহের রসশাস্ত্র-বিধিসম্মত শ্রেণীবিভাগকে দোষণীয় বলা যায় না।

দেশের কথা

চৈতন্য যুগে দেশের অবস্থা সাধারণতঃ স্বচ্ছল ছিল বলিয়া মনে হয়। গৃহস্থ ভদ্র লোকেরা খাওয়া পরার কোন অভাব অনুভব করিতেন না। অতিথি সৎকার সর্ব্বদা সকলে সহজে করিতে পারিতেন। বাড়ীতে ঘি দুধেরও অভাব ছিল না। বাড়ীর তৈয়ারী জিনিসেই খাওয়া-দাওয়ার কাজ চলিত। চৈতন্য ভাগবতে দেখা যায়—ধান্য চাউল ঘৃত মুদ্গ দুগ্ধ মিশ্রের ঘরে সর্ব্বদাই মজুত রহিয়াছে। কড়চায় গোবিন্দ প্রতিদিনকার রন্ধনের যে বিবরণ দিয়াছেন সেটী বেশ রসাল ও রুচিকর। ফলমূল ছানা ননী সর ক্ষীরের সঙ্গে,—

শাক সূপ দধি দুগ্ধ মোদক পায়স।
বড়া লাড্ডু মিষ্টকাদি খাইতে সুরস॥

এত গুলি প্রতি দিন শচীমাতা রন্ধন করিতেন। আবার চৈতন্য ভাগবতে দেখা যায় সকল বাড়ীতেই খই কলা সন্দেশ দুগ্ধ সর্ব্বদা পাওয়া যাইত, আর শচীমাতা নিরবধি নানা উপচারে অতিথি সেবা করিতেন। সে সময়ে বড় বড় নিমন্ত্রণে দধি ক্ষীর পায়েস সন্দেশ এবং ঘরের তৈয়ারী বড়া পিষ্টকাদি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত।

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে দেখা যায়—

সাদ্রক বাস্তুক শাক বিবিধ প্রকার।
পটল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর ॥
রাই মরিচ সুক্তা দিয়া সব ফল মূলে।
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে ॥
কোমল নিম্ব পত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মান চাকী ॥
নারিকেল শস্য ছেনা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর ॥
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥
মুদ্গ বড়া মাসবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীর পুলী নারিকেল যত পিষ্ট ইষ্ট ॥

ইহা ভিন্ন সঘৃত-পায়স ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ চাপা কলা দধি সন্দেশ ত আছেই। মধ্যলীলা ১৫ পরিচ্ছেদের ভোজনের বর্ণনাও এই রকম।

দশ প্রকার শাক নিম্ব সুকতার ঝোল।
মরিচের ঝাল ছেনা বড়া বড়ি ঘোল ॥ ইত্যাদি

অন্ত্যলীলা দশম পরিচ্ছেদে নানাপ্রকার চিড়ে মুড়ি খই এর মোওয়া, ফুটকলাই ভাজা, ঘৃত চিনি দিয়ে ফুটকলাইএর লাড়ু ও ক্ষীরসার মণ্ডার সুরসাল বর্ণনা আছে!

পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখায় ত্রিংশ পল্লবে শ্রীরাধার রন্ধনলীলা বিষয়ক শেখরের একটী পদ আছে তাহাতে শাক পায়স পিষ্টকের ও সহস্র প্রকার ব্যঞ্জন ও আচারের বর্ণনা আছে। নারিকেল জল শীতল করে নূতন বাসনে পানা তৈয়ারী, কত প্রকার আমের আচার, কলা পানিফল

আদা ও নানা প্রকার খণ্ড মণ্ড প্রস্তুত করার কথা আছে। আর দধি দুগ্ধ গাভী-ঘৃত ছানার ত কথাই নাই।

কর্পূর মালতী, করল যুবতী, মনোলোভা মনোহরা।
কয়না কদম্বা রেউড়ী পদুমা, মতিচূর সুমধুরা॥
অমৃত কেলিকা, বিবিধ লাড্ডুকা, চাকি খণ্ড পদ্ম চিনি।
গুজা খাজা পেড়া, চানা চন্দ্রচূড়া, মিছরি মারিয়া ফেণি॥
লুচি পুরি করি, রস পাকে ভরি, সর ভাজা সরপুরি।
মাটিরি শাকরা, রস পুরী ঝরা, করল অমৃত কূপী॥

ইহা হইতে নদীয়ার সরভাজা সরপুরিয়ার প্রাচীন গৌরব কতক অনুমান করা যায় এবং সে গৌরব যে অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহা বৈষ্ণব কেন অতি পাপিষ্ঠও স্বীকার করিবে। তখনকার গৃহস্থ রমণীরা নানা প্রকারের মিষ্টান্ন ও আচার প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

বাঙ্গালীর ঘরে তখনও লক্ষ্মীশ্রী ছিল; এক মুঠো অন্নের জন্য তখনও হাহাকার পড়ে নাই। এক মুঠো অন্ন দিতে কেহ তখন কুণ্ঠিত হইত না। আবার লোককে নিজে যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া তখনকার লোকে পরম তৃপ্ত হইতেন। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান ও আত্মীয়-স্বজন প্রতিপালন গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য ছিল এবং সেইভাবেই অনুষ্ঠিত হইত। বর্ত্তমান কালের অভাব নিত্য বর্দ্ধনশীল হাহাকার ও সামাজিক অবস্থা আমাদিগকে এই গৌরবমণ্ডিত জাতীয় বিশিষ্টতা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে।

তখন পুরুষেও দীর্ঘ চুল রাখিত। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের সময় তাঁহার বেণী ছেদন যেন একটা দারুণ শোচনীয় ঘটনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নানা পদে শ্রীগৌরাঙ্গের চাঁচরচিকুর কেশের সুন্দর বর্ণনা আছে। পুরুষেরা সুবর্ণ বলয় ও কুণ্ডল ব্যবহার করিত এবং করে

অঙ্গুরীয়ক পরিত এবং বাহুতে নব রত্নহার বাঁধিত (চৈতন্য ভাগবত ও পদকল্পতরু)। স্ত্রীলেকেরা হাতে সোনার বাউটী, বলয়, চুড়ী, বাজু ও কাণে সোনার মদনকড়ি, কুণ্ডল, কণ্ঠে সোনার হাসলী হার ও কোমরে সোনা দিয়ে বাঁধান ব্যাঘ্র নখের কোমর পাটা, পায়ে মল পাশুলি (পাঁয় জোড়) ব্যবহার করিতেন। সোনার গয়নার সঙ্গে সঙ্গে রূপার গয়নারও খুব প্রচলন ছিল। সম্পন্ন-গৃহস্থবধূদিগের মধ্যে অনেক প্রকারের সোনার গয়নার প্রচলন ছিল। স্ত্রীলোকেরা সাড়ীর সঙ্গে কাঁচুলী ও ওড়না ব্যবহার করিতেন। আচার্য্যপত্নী সীতাদেবী শিশু গৌরাঙ্গকে যখন দেখিতে যান, তখন তিনি যে বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়াছিলেন চৈতন্য ভাগবতে ও চৈতন্য চরিতামৃতে তাহার বর্ণনা আছে; তাহা হইতে তৎকালীন ভদ্র সম্পন্ন গৃহস্থ রমণীদিগের বেশ ভূষার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তখন লৌকিকতা রক্ষার জন্য ভদ্ররমণীরা, কি ভাবে গতায়াত করিতেন তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

শ্রীবিষ্ণু প্রীতি কামনায় সালঙ্কারা কন্যাদান তখন হইতেই প্রচলিত ছিল (চৈ ভা); বিবাহ উৎসব আদিতে নানা বাদ্য ভাণ্ড হইত—

জয়ঢাক, বীর ঢাক, মৃদঙ্গ কাহাল।
পটহ, দগড়, শঙ্খ, বংশী করতাল॥
বরগোঁ শিঙ্গা, পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে যত।
কে লিখিবে বাদ্য ভাণ্ড বাজি যায় কত॥ (চৈতন্য ভাগবত)

শ্রীচৈতন্যের প্রথম বিবাহ পঞ্চ হরিতকী দিয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় বারের বিবাহের ঘটা বৃন্দাবন ও লোচন দাস উভয়েই খুব উৎসাহের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

বুদ্ধিমন্ত খাঁন বোলে শুন সর্ব্ব ভাই।
বামনিঞা মত এ বিবাহে কিছু নাই॥

এ বিবাহে পণ্ডিতের করাইব হেন।

রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন ॥ চৈতন্য ভাগবত

ঘোর ঘটা করিয়া বুদ্ধিমন্ত খাঁর ব্যয়ে রাজকুমারের মত বিবাহ হইলেও সে বিবাহে যে ব্যয় হইয়াছিল তাহা আদর্শ থাকিলে অনেক স্নেহলতার প্রাণ বাঁচিত এবং অনেক কন্যার পিতা উদ্বাস্তু হইতেন না। লক্ষেশ্বরের মত বিবাহের অধিবাসে—

সবারে তাম্বুল মালা দেহ তিনবার।

চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার ॥ (চৈতন্য ভাগবত)

সুগন্ধি চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।

ঘন ঘন তাম্বুল দানে বড় তুষ্ট কৈল ॥ (চৈতন্য মঙ্গল)

ইহাতেই নদীয়ায় ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

লক্ষেশ্বরো দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।

হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে ॥

এমত চন্দন মালা দিব্য গুয়া পান।

অকাতরে কেহো কারে নাহি করে দান। (চৈতন্য ভাগবত)

শ্রীচৈতন্যের দুই বিবাহের এক বিবাহেও পাকস্পর্শ বা বৌভাতের বা বিবাহের রাত্রে ভোজনের কথা দেখা যায় না। কন্যার ১০০ ভরি সোনা ২০০ ভরি রূপা ও এক কাঁসারির দোকান ভরা বাসন ও ঘর ভরা আসবাবের পরিবর্ত্তে ফুলের মালা, চন্দন, পট্ট বস্ত্রের জোড় পাটের সাড়ী ও শাঁখাই যথেষ্ট ছিল। স্ত্রী আচার প্রভৃতি এখনকার মতই ছিল।

এই সময়ে নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষার প্রচলন ছিল। বৈদ্য, কায়স্থ, সদ্গোপ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবেরা ঠাকুর পদ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে পর্য্যন্ত

মন্ত্রশিষ্য করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবোচিত বিনয় বশতঃ দাস উপাধি ধারণ করিলেন। যবন হরিদাস অদ্বৈতের পিতৃশ্রাদ্ধে মহা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইলেন। স্ত্রী, শূদ্রের বেদে অধিকার ছিল না, ব্রাহ্মণেতর জাতির শাস্ত্রে অধিকার ছিল না, বিধি নিষেধের নানা বন্ধন ছিল। সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশ্বপ্রেমের যে পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদ করিলেন, তাহাতে বহু দিনের আচার বিধি শাপ-গ্রস্ত সমাজের পাষাণ প্রাণে নব জীবনের সঞ্চার হইল।

বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার দ্রোহ করে।
পূজাও নিস্ফল হয় আরো দুঃখে মরে॥
সর্ব্ব ভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু না জানিয়া।
বিষ্ণু পূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া॥ (চৈতন্য ভাগবত)

সর্ব্ব ভূতে নারায়ণ আর চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হারভক্ত পরায়ণঃ এই স্বর্গের সুসমাচার প্রকাশিত হইয়া সমস্ত হিন্দু সমাজে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। একদিকে বৈষ্ণব সমাজের বিনয়, বৈরাগ্য, নামে রুচি, জীবে দয়া, অন্য দিকে প্রাচীন সমাজের তান্ত্রিক পূজা, অর্চ্চনা, মদ্য মাংস ও প্রচলিত ধর্ম্ম নিষ্ঠা। বাশুলী পূজা ও পঞ্চ মকারের মহোৎসব চলিতে ছিল। চৈতন্য ভাগবতে জগাই মাধাই এর যে বর্ণনা আছে তাহাতে দেখা যায় তাঁহারা উত্তম বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া মদ্য, গো-মাংস ভক্ষণ করিত (চৈতন্য ভাগবত মধ্য ১৩ অধ্যায়) অথচ সমাজেও অচল ছিল না। গোমাংস বৃন্দাবন দাস রাগ করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন কিনা বলা যায় না, কারণ নবদ্বীপে মাতাল দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক সে সময়ে মদ্য মাংসের খুব প্রচলন ছিল এবং তখনকার সমাজে অনেক জগাই মাধাই ছিল, তাহা ভক্তিরত্নাকর ও

নরোত্তম বিলাস হইতে বেশ বোঝা যায়। লোকে ভূত, প্রেত ও ডাইনিতে বিশ্বাস করিত। অনেক স্নায়বিক পীড়াকে অপদেবতার কার্য্য মনে করিত।

শ্রীচৈতন্যের যুগে মুসলমান রাজ্য ও শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও শাসিত হিন্দুর প্রতি শাসক মুসলমানের তেমন হৃদয়হীন ব্যবহার ছিল না। তাহার তিন শতাব্দী পরে কোন কুহকমন্ত্রে, কোন দেবতার অভিশাপে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া সকল আশা সকল আকাঙ্ক্ষা ভস্ম করিয়া দিতেছে, আর তখন নবদ্বীপের কাজি প্রথমে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও পরে উদ্দাম নগরসঙ্কীর্ত্তনে কিছু মাত্র বাধা দিতেছেন না। কাজি ও মুলুকপতি শ্রীচৈতন্য ও হরিদাসের সঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা করিতেছেন। রাজশক্তিশালী হইয়াও মুসলমান তখন শান্তিতে হিন্দুর সঙ্গে বাস করিবার জন্যই লালায়িত ছিলেন।

তখনকার বৈষ্ণব সমাজে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল। শিখিমাহিতীর ভগিনী মাধবী অতি সুপণ্ডিতা ও কবি-প্রতিভাশালিনী ছিলেন। তিনি উড়িয়া ও বাঙ্গালাতে অনেক সুমধুর পদ রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রামী ধোপানীরও সুন্দর পদ পাওয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন দাসের জননী নারায়ণী পরম ভক্তিমতী ও ধর্ম্ম-তত্ত্ব পারদর্শিনী ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা দেবী সুশিক্ষিতা ছিলেন। তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। তাঁহারই আদেশে যদুনন্দন দাস "কর্ণানন্দ" রচনা করেন। পদ কর্ত্তাদিগের মধ্যে ৩।৪ জন মহিলা পদকর্ত্তার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবী দেবীর নাম সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী সীতা দেবী বৈষ্ণব সমাজে জ্ঞান ও ভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক ভক্ত বৈষ্ণব সীতাঠাকুরাণীর

নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহিণী মালিনী, রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী দময়ন্তী, শ্রীনিবাসাচার্য্যের পত্নী গৌরাঙ্গপ্রিয়া প্রভৃতি মহিলাগণ পরম ভক্ত ও ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ নারী বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিতা ও সমাদৃতা ছিলেন। তান্ত্রিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপকরণ, ইন্দ্রিয় বিলাসের অবলম্বন, শাস্ত্র জ্ঞানের অনধিকারী রমণী এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে জ্ঞানে, পুণ্যে, প্রেমে, ভক্তিতে মণ্ডিত হইয়া যখন চিরঅত্যাচারী পুরুষের মন্ত্রদাতা গুরু হইয়া তাহার মস্তকে চরণ রাখিলেন, তখন সমাজের মধ্যে এক নূতন পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রথম অভ্যুত্থানে বিজ্ঞেরা হয় ত শিরঃসঞ্চালন করিয়া ও সাধারণে অলস কৌতূহলী হইয়া এই বিরাট ধর্ম্মান্দোলন লক্ষ্য করিতেছিলেন কিন্তু ইহার অখণ্ড প্রভাব অচিরে সমাজদেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইল।

উপসংহার

পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে সাহিত্যের বিভাগ অনুযায়ী প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা হইয়াছে, সময়ের ধারাবাহিকতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয় নাই। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত সাহিত্যের কথা আছে। ইহার ব্যবধানে মনসামঙ্গল ধর্ম্ম মঙ্গল রামায়ণ মহাভারত চণ্ডী প্রভৃতির নানা সংস্করণ নানা অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিবার অবকাশ পাই নাই। বৈষ্ণব যুগের পরে অনুবাদ গ্রন্থাদিতে বৈষ্ণব প্রভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের অমর কাব্য সকল রচিত

হয়। পরে কিছুকাল সাহিত্যের জীবন্ত প্রকাশের অভাব হয়। কবি-ওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা ও যাত্রাওয়ালারা তখন বাণী মন্দিরে শব্দযোজনা-পটুতামূলক যাত্রা পাঁচালী গানের ক্ষীণ-তৈলদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখিয়া-ছিলেন।

এই যাত্রাগানের প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত যাত্রা রচয়িতা কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কথা আলোচনা করিতেছি। ইনি ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নদীয়া ভাজন ঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে চুচূড়ার নিকটে দেহ রক্ষা করেন। তিনি ২৫ বৎসর বয়সে দার পরিগ্রহ করিয়া ঢাকায় আসিয়া বাস করেন। ঢাকায় আসিয়া তিনি 'স্বপ্ন বিলাস' 'রাই-উন্মাদিনী' 'বিচিত্র বিলাস' প্রভৃতি পালা রচনা করেন। অতি সত্বরে এই সকল পালা জনসাধারণের প্রিয় হইল এবং দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। পূর্ব্ববঙ্গে কৃষ্ণকমলের নাম ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল। অনেকে তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গের কবি বলিয়াই জানিতেন। পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী পালাই বিশেষ প্রসিদ্ধ; এতদ্ভিন্ন 'ভরতমিলন' 'গন্ধর্ব্বমিলন' প্রভৃতি আরও কয়েকটী পালা রচনা করেন। অনেকগুলি সংকীর্ত্তনের গানও রচনা করেন; এইগুলিও সুমধুর ও ভাবপূর্ণ। ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্বপ্ন বিলাস, রাই উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস অবলম্বন করিয়া লণ্ডন হইতে "Popular Dramas of Bengal" নামে এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক ইংলণ্ডে সমাদৃত হয় ও পরে জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদিত হয়।

কৃষ্ণকমল ভাবুক ভক্ত ও পরম বৈষ্ণব এবং সুকবি হইলেও সেই সময়কার অনুপ্রাস প্রিয়তা ও অনর্থক বাক্যযোজনার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। শব্দের মিলের জন্য অনর্থক শব্দযোজনা তখনকার দিনে একটা রোগ ছিল। ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ

করিয়া পরে কবিওয়ালাদের গান ও পাঁচালীতে ইহার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়।

ওরে সুবল রে ওকি বলিস বাছা।
সে বাছা কি ভুলবার বাছা, বাছা আমার জগৎ বাছা।
তা বিনে যে প্রাণে বাঁচা, সে বাঁচা কি বাঁচার বাঁচা।
বলি বলি তবে যে বাঁচা কেবল মরণ হয় না বলে বাঁচা।
(স্বপ্নবিলাস)

* *

বল কে কে যাবে, চল গো যে যাবে, শশীমুখে বাঁশী কতই বাজাবে।
গেলে কুল যাবে, ব'লে যে না যাবে, যাবে না যাবে আমার কি যাবে?
কে যাবে না যাবে, কবে সময় যাবে, বিলম্ব দেখিয়ে সে রসময় যাবে।
(রাইউন্মাদিনী)

এইরূপ কোন কোন স্থলে কেবল কথার ছড়ায় পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য জায়গায়—কৃষ্ণকমলের স্বাভাবিক কবিপ্রতিভা ও ভক্ত জনোচিত ভাবোচ্ছ্বাস শব্দহারকে পরম রমণীয় পুষ্পহারে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র এই শব্দের মিলের ছড়াছড়ি অনুপ্রাসের বাড়াবাড়ি ভাব প্রকাশকে কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

দিব্যোন্মাদের অন্য নাম রাইউন্মাদিনী। রাইউন্মাদিনী ও স্বপ্ন-বিলাস কৃষ্ণকমলের দুইখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক বৈষ্ণব পদকর্ত্তার পদের ছায়া পড়িয়াছে। অনেক স্থলে কোন কোন পদের ভাব ও ভাষার অনুকরণ দেখা যায়, তবে অনেক স্থলে অনুকরণ পরবর্ত্তী পদযোজনার দ্বারা উজ্জল হইয়াছে। "নাপুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাইও জলে। মরিলে রাখিও বাঁধি তমালের ডালে॥ কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে। পরাণ পায়ব হাম পিয়া

দরশনে ॥" বিদ্যাপতির এই পদ রাধামোহনঠাকুর, যদুনন্দন দাস ও ঘনশ্যাম নির্লজ্জভাবে অনুকরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণকমলও স্বপ্নবিলাসে এই পদের অনুকরণ করিয়াছেন। "দেহ দাহন করো না দহনদাহে। ভাসাওনা কেহ যমুনা প্রবাহে। আমার শ্রীকৃষ্ণ বিলাসের দেহ সব সহচরী বাহু দুটী ধরি বাঁধিও তমাল ডালে।" এই পদের শেষে কৃষ্ণকমল যোগ করিয়াছেন—

মরি আর এক দুখ দেখি মরমে জাগিল সখি গো
(কথা স্মরণ যে হ'ল গো, বড় দুখের কথা)
মৃততনু দেখিলে নয়নে আমার প্রাণবল্লভ গো
পাছে সতীপতি শিবের মত, হয়ে বঁধু উনমত,
বহিয়ে ভার ফিরে বনে বনে।
সখি, যে অঙ্গে চন্দনার্পণে কত ভয় বাসি মনে গো
(অঙ্গে বাজবে বলে গো—বঁধূর কোমল অঙ্গে)
সেই অঙ্গে ভার সইবে কেমনে ॥

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥
মাধব তুয়া অভিসারকি লাগি।
দূরতর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি ॥
কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির পয়ানক আশে।
মণিকঙ্কণ পণ ফণীমুখ বন্ধন শিখই ভুজগ গুরু পাশে ॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই গোবিন্দ দাস পরমান ॥

গোবিন্দদাসের এই পদ কৃষ্ণকমল রাইউন্মাদিনীতে নিম্নলিখিত ভাবে অনুকরণ করিয়াছেন—

যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,
বিচারিলাম আগে পাছের কাজে ;
(যা যা করতে হবে গো—সখি আমার বঁধুর লাগি)
জানি প্রেম করে রাখালের সনে, ফিরতে হবে বনে বনে,
ভুজঙ্গ কণ্টক-পঙ্কজ মাঝে।
(সখি আমার—যেতে যে হবে গো—রাই বলে বাজলে বাঁশী)
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল করিয়ে অতি পিছল
চলাচল তাহাতে করিতাম ;
(সখি আমার চলতে হবে গো—বঁধুর লাগি পিছল পথে)
হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি
গতাগতি করিয়ে শিখিতাম।
(সদাই আমার—ফিরতে হবে গো—কত কণ্টককানন মাঝে)

* * *

এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী পদকর্ত্তাদিগের পদানুসরণ ও পদের অবিকল অনুকরণের নিদর্শন অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণকমলের প্রেমোন্মাদ বর্ণনা একেবারে প্রাণের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে।

(১) বঁধুর সরস পরশ লালসে (যখন) যাইতাম নিকুঞ্জ নিবাসে।
(তখন) চরণে বেড়িত, বিষধর কত, হইত নূপুর জ্ঞান গো।
সে দুখ জানি নাই বধুর সুখে, সদা ভাসতাম সুখে সখি নিশিদিন,
গেছে সেই একদিন আর এই একদিন অভাগিনী রাধার,
(এখন) বিনে সে ত্রিভঙ্গ শ্রীঅঙ্গ সঙ্গ ভূষণ ভুজঙ্গ মানে গো।

(২) বঁধু চরণ দুখানি, পসারি সজনি, এইখানে বসিত গো।
কত আদরে বিনোদ নাগর আমারে উরুপরে ক'রে বসাইত ;
করে করি করি-দশন-চিরুনী আচরি চিকুর বানাইত বেণী
সে বেণী সম্বরি বাঁধিত কবরী, আবার মালতীর মালে বেড়াইত গো।

* * *

(৩) ওহে তিলেক দাঁড়াও দাঁড়াও হে অমন করে যাওয়া উচিত নয়।
যে যার স্মরণ লয় নিষ্ঠুর বঁধু বল তারে কি বধিতে হয়।

* * *

তুমি যেয়ো যথা সুখ পাও, অভাগিনীর দুটো মুখের কথা শুনে যাও।
বঁধু মোরা মরে যাই তায় ক্ষতি নাই প্রেমে কলঙ্ক হবে
বলি শুনহে কেশব, বল্‌বে লোকে সব, প্রেমকরে মল গোপিকা সবে।

* * *

(৪) স্ফূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে
তখন ভাবেন কৃষ্ণ এল বৃন্দাবনে।
অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছে মধুপুরী।

(৫) আমার হৃদকমলে রাখিয়ে শ্রীপদ
তিল আধ বস বস হে শ্রীপদ।

* * *

কোটী শশী-সুশীতল হ'তে সুশীতল, তোমার পদতল
একবার পরশেই শীতল হইবে এখন।

কৃষ্ণকমলের এই সকল সুমধুর প্রাণস্পর্শী সংগীতগুলি কেবল পাঠ করিয়া সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। এইগুলি যখন গীত হয় তখন পাষাণ প্রাণও বিগলিত হয়। বিষয়ীর কঠোর প্রাণ; শোকার্ত্তের ব্যথিত প্রাণ সকলকে সমানভাবে বিগলিত করে। রাধার

প্রেমোন্মাদ বৈষ্ণব ভক্তের ব্যাকুলতা আর্ত্তি প্রকাশ করে। উন্মাদিনী রাইর দশা শুনিতে শুনিতে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের প্রেমোন্মাদের কথাই মনে পড়ে। কৃষ্ণকমলের রাধাপ্রেমে কোন আবিলতা নাই কোন স্বার্থগন্ধ নাই; সে প্রেম তীব্র আবেগভরা সুনির্ম্মল ও আত্ম বিসর্জ্জনপূর্ণ, মধুর ও আত্মবিহ্বল। এই সুনির্ম্মল ও তীব্র আবেগময় একান্ত আত্ম বিসর্জ্জনপূর্ণ প্রেমই—শ্রীচৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদর্শ ও সাধ্য শিরোমণি।

কৃষ্ণকমলের ন্যায় পদাবলীর ছায়া অবলম্বনে মধুসূদন কান ঢপের কীর্ত্তন রচনা করেন। মধুসূদন নূতন কীর্ত্তনের সুর ও সুমধুর কীর্ত্তনের পদ ও পালা রচনা করেন। এক সময়ে মধুকানের ঢপের কীর্ত্তন উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে খুব প্রচলিত ছিল। তাঁহার কীর্ত্তনের পালায় কৃষ্ণ-কমলের পদের ছায়া দেখা যায়। কৃষ্ণকমলের পদই সুপ্রসিদ্ধ নীলকণ্ঠের যাত্রাগানের পদাবলীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। কৃষ্ণকমলের ভাব লইয়া নীলকণ্ঠ আধুনিক শ্রোতার মনোরঞ্জনযোগ্য ছন্দে ও মধুর সুরে যাত্রার পালা রচনা করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ নিজে ভক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার যাত্রাগানের পদগুলিতে যেমন মাধুর্য্য তেমনি ভক্তির সুধাধারা ক্ষরিত হইয়াছে।

পণ্ডিত এণ্ডার্‌সন্‌ দীনেশ বাবুর Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন "The teaching of Chaitanya has inspired all Bengali literature since his day. Its traces may be detected in the religious writings of Bankim Chandra Chatterjee the novelist and in exquisite mystical verses of Sir Robindra Nath Tagore.', "শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্মশিক্ষার প্রভাব তাঁহার

সময় হইতে এযাবৎ সমুদয় বঙ্গ সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধে ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবোদ্দীপক সুমিষ্ট কবিতায়—ইহারই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।"

এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব বাঙ্গালার সাহিত্যে বাঙ্গালীর সমাজে সংসারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে জীবে দয়া সেবা বিনয় ভক্তি ব্যাকুলতা ও নাম সাধন সমাজের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়াছে। ধর্ম্মসাধনের ধারা এক অপূর্ব্ব নূতন শক্তি লাভ করিয়া জনসাধারণের প্রাণ মন স্পর্শ করিয়াছে এবং সকল সাধন ধারা, এই ভক্তি বিনয় ব্যাকুলতার প্রভাবে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। এই বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে সেই ধর্ম্মতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎও আভাস দিতে পারিলাম কিনা ভগবান জানেন। এই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য কিয়ৎ পরিমাণেও এই আলোচনায় প্রতিভাসিত হইল কিনা সহিষ্ণু পাঠকগণ বলিতে পারেন। তবে প্রিয়তমের কথা বারবার বলিয়াও যেমন মানুষ ক্লান্ত হয় না, তেমনি এই বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা বারবার বলিয়াও বলার আশা মিটে না। যাহা বলিতে চাই, আমার ভাবের রিক্ততায় প্রকাশের অক্ষমতায় ভাষার দৈন্যে তাহা বলাও হয় না। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতরে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ভাবৈশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যেমন উৎসারিত হইয়াছে, তেমনি ভক্তিধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরম অভিব্যক্তি নানা-ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। যাহার ভাণ্ডারদ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত সেই পরম পুরুষার্থ প্রেমের সদাব্রতে বিশ্বের চির কাঙ্গালের নিমন্ত্রণ বলিলেও ঠিক স্বরূপ প্রকাশ হইল না—এযে আমার মত কাঙ্গালের নাম ধরে ডাকা—আমার জন্য পথ চাওয়া। আমার বুকভরা ধন প্রাণজুড়ানো ধন—তৃষাহারী আনন্দের অমৃতের থালি লইয়া আমার

জন্য পথপানে চাহিয়া—আমার সাড়া পাওয়ার আশায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

ইহা পরিত্রাণ নহে উদ্ধারও নহে। দেওয়া-নেওয়া আনন্দ। মানুষের আত্ম-সম্মানকে কি জাগ্রত করিয়া দিল কি উজ্জ্বল করিয়া দিল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম তত্ত্ব এই মায়াময় সংসারকে, কর্ম্মক্ষেত্র পরীক্ষার স্থল সংসারকে শ্রীক্ষেত্রে পরিণত করিল। সংসার যাত্রা জগবন্ধুর রথ-যাত্রায় পরিণত হইল। আমি এই তত্ত্বকে প্রকাশ কবিতে গিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বজন-বিদিত সাধারণ তত্ত্বকে উপস্থিত করি নাই। নামে মুক্তি ভক্তি বিনয় দীনতা আর্ত্তি সেবা এ সকলকেও আমি প্রকৃত তত্ত্ববস্তুর নিকট বাহিরের জিনিস বলিয়া মনে করিয়াছি। দীনজন শরণ পতিতপাবন হরি—যে ডাকে সেই পায়—ভক্ত চণ্ডাল দ্বিজ হইতে শ্রেষ্ঠ—ভক্তিধর্ম্মের এই সকল সরল সূত্র—যাহা জগতের সকল ভক্তিধর্ম্মের সাধারণ সামগ্রী যাহা বহুযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং বাঙ্গালার তৎকালীন সমাজ এবং পরবর্ত্তী যুগে সমুদয় ভারতবর্ষে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সেই সকল বিষয়ের কোন বিশদ আলোচনা আমি করি নাই কারণ সেগুলিও বৈষ্ণবধর্ম্মের বহিরঙ্গ বিষয়। বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্মবাণী যেদিন সত্যরূপে জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হইবে সেই দিন পদদলিত লাঞ্ছিত মানুষ আত্মসম্মানবোধে গৌরবান্বিত হয়ে আপন কর্ম্মের হীনতা ভুলে যাবে, বাহিরের অবস্থাকে তুচ্ছ মনে করবে, সংসারযাত্রার পথ আর পথের বাধা কিছুই চোখে পড়বে না, দিক আর মনে থাকবে না, শুধু প্রিয়তমের নাম ধরে ডাকাই কাণে বাজবে। সেদিন আশ্বস্ত হয়ে বলবে—

বঁধু এস এস, আধ আঁচরে বস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

বাহিরের নানা বৈষম্য মানুষকে যেমন পীড়ন করিতেছিল, সাধন পথের দুর্গমতা তেমনি পতিত দীনহীনকে অমৃত আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম পতিতকে তুলিয়া ধরিল দুর্ব্বলকে আশ্বাস দিল। একজনের বাদ পড়িলেও তাঁহার বিশ্বপ্রেমের লীলা অপূর্ণ থেকে যায়—তাই তিনি আকুল হয়ে পথ চেয়ে আছেন—এই আশ্বাস লাঞ্ছিতকে আত্মসম্মানে গৌরবান্বিত করিল। টলষ্টয়ের অপেক্ষাকৃত শুষ্কমত পাশ্চাত্য জগতে কত আদৃত হইয়াছে কি আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকৃত ভাবে প্রচারিত হইলে বৈষম্য-পীড়িত নিরাশাক্ষুব্ধ পাশ্চাত্য জগতে কি আনন্দ আশার সমাচারই ঘোষণা করিবে। এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া গীতাঞ্জলি রচিত হইয়াছিল তাই এই তত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ আভাসের আকর্ষণে ইউরোপীয় সাহিত্য জগতে গীতাঞ্জলির অনুবাদ এত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষের বেদান্তধর্ম্ম পাশ্চাত্য জগতের উচ্চ চিন্তাকে বিশেষভাবে আন্দোলিত ও আকৃষ্ট করিয়াছে কিন্তু জন-সাধারণকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব সাহিত্যের ভিতর দিয়া জগতের নরনারীর নিকট উপস্থিত হইলে সকলকে আশ্বস্ত, আশান্বিত ও আনন্দিত করিবে।

"আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে তোমার আমার মেলা।
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে তোমার আমার খেলা।
তোমার আমার গুঞ্জরণে বাতাস মাতে কুঞ্জ বনে
তোমার আমার যাওয়া আসায় কাটে সকল বেলা।"

দুহুঁজন নিতি নিতি নব অনুরাগ
দুহুরূপ নিতি দুহু হিয়ে জাগ॥

দুহু মুখ চুম্বই দুহু করু কোর।
দুহু পরি রম্ভনে দুহু ভেল ভোর॥
দুহু দুহুঁ যৈছন দারিদ্র হেম।
নিতি নব আরতি নিতি নবপ্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দ দাস॥

জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম